বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ড

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ
গল্পসমগ্র

সূচিপত্র

১. ঠেলাগাড়ী
২. খুকির কান্ড
৩. মরিচীকা
৪. ভন্ডুলমামার বাড়ী
৫. সার্থকতা
৬. বাইশ বছর
৭. ডানপিটে
৮. জন্ম ও মৃত্যু
৯. রামশরণ দারোগার গল্প
১০. খুড়ীমা
১১. বায়ুরোগ
১২. অভিশপ্ত
১৩. বউ চন্ডীর মাঠ
১৪. আরক
১৫. হাসি
১৬. খুঁটি দেবতা
১৭. পেয়ালা
১৮. অভিশাপ
১৯. বৈদ্যনাথ
২০. লেখক
২১. পাঁচুমামার বিয়ে
২২. ঠাকুরদার গল্প
২৩. একটি ভ্রমণকাহিনী
২৪. বাক্স বদল

২৫. অরন্ধণের নিমন্ত্রণ
২৬. বড়বাবুর বাহাদুরি
২৭. অন্নপ্রাশণ
২৮. ডাকগাড়ী
২৯. মণি ডাক্তার
৩০. পুরানো কথা
৩১. খোশ গল্প
৩২. একটি দিনের কথা
৩৩. বাটি চচ্চড়ি
৩৪. বিধু মাষ্টার
৩৫. বুধির বাড়ি ফেরা
৩৬. প্রত্যাবর্তন
৩৭. দ্রবময়ীর কাশীবাস
৩৮. নুটিমন্তর
৩৯. থনটন কাকা
৪০. বর্শেলের বিড়ম্বনা
৪১. শিকারী
৪২. বিরজা হোম ও তার বাধা
৪৩. জলসত্র
৪৪. মাষ্টারমহাশয়
৪৫. তিরোলের বালা
৪৬. প্রাবল্য
৪৭. বাঁশি
৪৮. শান্তিরাম
৪৯. ফিরিওয়ালা
৫০. ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল
৫১. পারমিট
৫২. মুক্তি

৫৩. শাবলতলার মাঠ
৫৪. দুর্মতি
৫৫. ফকির
৫৬. মেঘমল্লার
৫৭. নাস্তিক
৫৮. নব বৃন্দাবন
৫৯. প্রত্নতত্ত্ব

For Download More Bangla E-Books
Please Visit-
www.banglabookpdf.blogspot.com

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, রোদ তখনও ভালোরকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখীতে কিচ্ কিচ্ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে ঝুলন্ত শিকায় বড় জামবাটিতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিনরিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ—ও টুনি...

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখী হয়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি, অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার ক'রে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়ঘড় ক'রে বেড়াতে দিচ্ছ, ওর পরকালটা যে ঝর্‌ঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, চুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা...

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কি দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনিদা?...আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি-স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিগ্-নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝট্ করে খিড়কি দোরটা খুলে বার হয়ে এলুম। সকালের পদ্মের মত নির্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনিদা?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না!

নরু চোখের ইশারায় দেখিয়ে বললে—কোথায়?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই...

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনেপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হ'ল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনিদা—আমি চাল্‌তেতলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়বি তো টুনিদা?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুলতলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোন ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসিমুখে বললে—আর পটুদা, নিতাইদা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ্ ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়...গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী

যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে...বললে রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হ'ত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি! সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইস্টিমার যারা চালায়, তাদের কি বলে—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক, বলতাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হবো। মহকুমার হাকিম হবো।...

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল, এখন তুমি...

খোকা বলে—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনিদা—কোথাও তো যাইনি মা! সত্যি...

কি জানি কেন ওকে বড় ভালবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্তত ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক-একদিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে বললুম, চড় গাড়ীতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি...তা কিছুতে চড়লো না, বললে, মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনিদা?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা?

—আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা দুষ্টু। আসবি টুনিদা?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হ'ত না কোনমতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত...সূর্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচি মুখ রাঙিয়ে দিতেন, ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলী ধরনের ছিল ব'লে পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না...সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হ'ত। দুর্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্বিবাদে জারি করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে—

ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলাগাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বস্‌বে রে টুনিদা?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব, টানবে কে?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি টানতে পারিস? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে...

—বসো না? টানতে কেমন পারিনে!

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় একটু এইবার টান।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে, এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম, আর আমার বেলায় বুঝি কেউ...

আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে গাড়িতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইঁট নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বসল।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্ মচ্ ক্‌রে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেঙ্গে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইল আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধল। ভাবল এই রকম যে, তুইও টুনিদা এর মধ্যে?

কিন্তু সে কোন কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়েচেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সারানো যায়। পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলো থোলো বাকস্ ফুল দুলছিল—তারই পাশে গাব্ ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হ'ল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব ক'রে ফেলতুম তো বেশ হ'ত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাখানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে গেলুম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিংকাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি?...আমি কোন কথা বলার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ী বেড়াতে? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে রে! বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে? ওই পেকে পেকে থাকে, কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে ব'সে!

শরতের অপরাহ্ণ। নির্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি পাখী উড়ে চলেছে। কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক... উঠানের ছায়াস্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর!...

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখলুম—কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয়নি।

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সেই ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্জন দুপুর ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায়... আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে আসছে...নারিকেলতলা বেয়ে—পটুদের বড় দো-ফলা আমগাছটার তলা বেয়ে...যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্তি মাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।...

বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৫

খুকীর কাণ্ড

হরি মুখুয্যের মেয়ে উমা কিছু খায় না! না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া পড়িয়াছে বড়।

উমার বয়স এই মোটে চার। কিন্তু অমন দুষ্টু মেয়ে পাড়া খুঁজিয়া আর একটি বাহির ক'রো তো দেখি...তাহার মা সকালে দুধ খাওয়াইতে বসিয়া কত ভুলায়, কত গল্প করে, সব মিথ্যা হয়। দুধের বাটিকে সে বাঘের মত ভয় করে—মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখিলেই সোজা একদিকে টান্ দিয়া দৌড়।

মা বলে—রও দুষ্টু মেয়ে, তোমার দুষ্টুমি আমি...দুধ খাবেন না, সুজি খাবেন না, খাবেন যে কি দুনিয়ায় তাও তো জানি নে—চ'লে আয় ইদিকে—

খুকী নিরুপায় দেখিয়া কান্না শুরু করে। তাহার মা ধরিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দুধ খাওয়ায়। কিন্তু জোরজবরদস্তিতে অর্ধেকের উপর ছড়াইয়া গড়াইয়া অপচয় হয়, বাকি অর্ধেকটুকু কায়ক্লেশে খুকীর পেটে যায় কি না যায়!

সময়ে সময়ে সে আবার মায়ের সঙ্গে লড়াই করে। চার বছর বয়স বটে, না খাইয়া খাইয়া কাটি কাটি হাত পাও বটে, কিন্তু তাহাকে কায়দায় ফেলিতে তাহার মায়ের এক-একদিন গলদঘর্ম। রাগ করিয়া মা বলে—থাক্ আপদ বালাই কোথাকার, না খাস তো বয়ে গেল আমার—সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠবে, আবার ওই দস্যি মেয়ের সঙ্গে দিনে পাঁচবার কুস্তি ক'রে দুধ খাওয়াবার শক্তি আমার নেই—মর্ শুকিয়ে।

খুকী বাঁচিয়া যায়, ছুটিয়া এক দৌড়ে বাড়ির সামনের আমতলায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া সমবয়সী সঙ্গিনীকে ডাকে—ও নেনু উ-উ...

তাহার বাবা একদিন বাড়ীতে বলিল—দেখ, খুকীটাকে আজ দিন পনেরো ভাল ক'রে দেখিনি—আসবার সময় দেখি পথের ওপর খেলা ক'চ্ছে, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছে যেন চেনা যায় না, পিঠটা সরু, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, অসুখ-বিসুখ নেই, দিন দিন ওরকম রোগা হয়ে পড়ছে কেন বলো তো?

খুকীর মা বলে—পড়বে না আর রোগা হয়ে? সারা দিনরাতে ক'ঝিনুক দুধ পেটে যায়? মরে মরুক, আমি আর পারিনে লড়াই করতে...কে এখন এই দস্যি মেয়েকে রোজ রোজ যায় দুধ খাওয়াতে? যাই ওর কপালে থাকে তাই হোক গে...

তাই হয়! দস্যি মেয়ে শুকাইতে থাকে!

ভাদ্র মাস, হঠাৎ বর্ষা বন্ধ হইয়া রৌদ্র বড় চড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামের ডোবা পুকুরে সারা গাঁয়ের পাটক্ষেতের পাটের আঁটি ভিজানো। নদীর ধারে কাশের ফুল ফুটিয়াছে!

গ্রামের হীরু চক্রবর্তীর আড়তে এই সময় কাজকর্মের বড় ভিড়। নানা দেশের ধানের ও পাটের নৌকো সব গঙ্গার ঘাটে জড়ো হইয়াছে। হরিশ যুগী আড়তের কয়াল—কাঁটার ফের্তায় এক মণ ধানে, আরও সের দশেক ঢুকাইয়া লওয়া—তাহার কাছে ছেলেখেলা মাত্র। হাঙ্গরের মুখখোদাই বড় একখানা মহাজনী নৌকো হইতে ধানের বস্তা নামিতেছে, পট্‌পটি গাছের ছায়ায় উঁচু করা ধানের স্তূপ হইতে হরিশ সুর-সংযোগে কাঁটায় করিয়া ধান মাপিতেছে—রাম—রাম—রাম হে রাম—রাম হে দুই—দুই দুই—দুই হে তিন—তিন তিন...

গফুর মাঝি ডাবা হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছে—তা নেন্ গো কয়াল মশাই, একটু হাত চালিয়ে নেন্ দিকি, মোরা একবার দেখি? ইদিকি নোনা গাঙের গোন্ নামলি কি আর নৌকা বাইতি দেবানে?

হরি মুখুয্যে মহাশয়কে একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে আসিতে দেখিয়া হীরু চক্রবর্তী বলিলেন—আরে এস হরি, কি মনে ক'রে? এসো তামাক খাও...

—না থাক—তামাক—ইয়ে আমার মেয়েটাকে ইদিকে দেখেছ হীরু? না?...বড় মুস্কিলে ফেলেছে বাঁদর মেয়ে...বারোটা বাজে, সেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছে সকাল ন'টার সময়...একটু দেখি ভাই খুঁজে, এত জ্বালাতনও ক'রে তুলেছে মেয়েটা, সে আর তোমাকে কি বলব...

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে রায়বাড়ীর পথে উমাকে ধুলোর উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি একটা হাতে লইয়া চুষিতে ও আপন মনে বকিতে দেখা গেল।

—ওরে দুষ্টু মেয়ে...

হরি মুখুয্যে গিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইলেন! বাবার কোলে উঠিতে পাইয়া উমা খুব খুশি হইল, হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বাবা, ও বাবা...ওই ওদের নাদু ভারি দুষ্টু...এই, এই দুধ এই খায় না...আমি দুধ খাই, না বাবা?

—বেশ মেয়ে, দুধ খেতে হয়। ওটা কি খাচ্ছিস, হাতে কি?

—নেবেঞ্চুস, ওই পুঁটির মামা এসেছে, তাই দিয়েছে।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমার শাস্তি শুরু হয়। বাটিভরা দুধ, ঝিনুক, টানাটানি ইত্যাদি। তাহার কান্না, কাকুতি-মিনতি পাষাণী মা শোনে না...জোর করিয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দিয়া ঢোঁকে ঢোঁকে দুধ খাওয়ায়...শেষের দিকটায় সে পা ছুড়িতে গিয়া খানিকটা দুধসুদ্ধ বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

দুম্ দুম্ দুই নির্ঘাত কিল পিঠে। পিঠ প্রায় বাঁকিয়া যায়।

—হতভাগা দস্যি আপদ কোথাকার...ছ'সের ক'রে দুধ টাকায়, ভাত জোটে না, দুধের খরচ যোগাতে যোগাতে প্রাণ গেল...দস্যি মেয়ের ন্যাকরা দেখ—আদ্ধেকটা দুধ কিনা ঠ্যাং ছুঁড়ে মাটিতে দিলে ফেলে!...

খুকী দম সাম্‌লাইয়া লইবার পরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল।

বেলা পড়িয়া আসে! ওদের উঠানে পূর্বপুরুষের আমলের বীজু-আমগাছের ছায়ায় অপরাহ্নের রোদকে আট্‌কাইয়া রাখে। খুকী বসিয়া বসিয়া ভাবে অপরের বাড়ীতে ভাল খাবার খাইতে পাওয়া যায়—মিষ্টি—তাহাদের বাড়ীতে শুধু দুধ আর দুধ!

তাহার মা বলিল—টিপ পরবি ও দস্যি?

খুকী ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিল।

—বলে নয়ন-তারা টিপ, দুটো ক'রে এক পয়সায়, বেশ টিপগুলো—স'রে এসে বোস দিকি।

টিপ পরিয়া খুকী আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়। বাঁশবনের তলা দিয়া গুটি গুটি হাঁটে। পুনরায় সে লোভে লোভে রায়বাড়ী যায়, পরের বাড়ীতেই যত ভাল খাবার। বিস্কুট, নেবেঞ্চুস, কত কি।

নানুদের উঠানে পেঁপে গাছের মাথার দিকে তাহার চোখ পড়িতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া গেল—সঙ্গিনীকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিল—ও নানু, ঐ পিঁপে।

পেঁপে তাহার মা কাটিয়া খাইতে দেয়, বেশ খাইতে লাগে, কিন্তু তাহা গাছের আগ্‌ডালে কি অমনভাবে দোলে! চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

পূজার কিছু পূর্বে খুকীর আপন মামা কলিকাতা হইতে আসিল। এত ধরণের খাবার কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। কিশমিশ দেওয়া মেঠাই, বড় বড় অমৃতি, জিলিপি. গজা, কমলালেবু আরও কত কি।

পাশের গ্রামে মামার এক বন্ধুর বাড়ী। মামা পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাকে সাজাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

পথে কে একজন সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছে, খুকী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মামাকে বলিল—ও কে গেল মামা?

—ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন লোক...

উমা বলিল—ফরসা মুখ, ফরসা জামা গায়, না মামা?...চমৎকার!...

তাহার মামা হাসিয়া বলিল—'চমৎকার' কথাটা তুই শিখলি কি ক'রে?...আচ্ছা খুকু. তুই ওকে বিয়ে করবি?

উমা সপ্রতিভ মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভাদ্রের শেষ, ম্যালেরিয়ার সময়, তবে এখনও খুব বেশী আরম্ভ হয় নাই, বাড়ীবাড়ী কাঁথামুড়ি দেওয়া শুরু হইতে এখনও দেরি আছে। উমার হাঁটুনির বেগ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সে মাঝে মাঝে পথের ধারে বসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল। তাহার মামা বলিল—কি হয়েছে খুকু, রোদ্দুর বড্ড বেশী রে, আর বেশী নেই, চল...

বন্ধুর বাড়ী পেঁছিবার পূর্বেই উমা বলিল—মামা, আমার শীত লাগছে...

—শীত কি রে? ভাদ্র মাসে এই গরমে শীত? ও কিছু না, চল...

খুকী আর কিছু না বলিয়া বেশ চলিল বটে, কিন্তু খানিক দূর গিয়া তাহার মনে হইল শীত একটু বেশী করিতেছে। শুধু শীত নয়, তৃষ্ণাও পাইয়াছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—মামা, আমি জল খাব।

—বড় বিপদ দেখছি তো, আচ্ছা, আগে চল গিয়ে পেঁছুই—খেও এখন জল···

গন্তব্যস্থানে পেঁছিয়া উমার মামা তাহার কথা ভুলিয়াই গেল। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় মশগুল হইয়া উমার সুখ-দুঃখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল না। উমা দু-একবার কি বলিল, আলাপের গোলমালে সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা ফিরিয়া দেখিল, সে গুটিসুটি হইয়া রৌদ্রে বসিয়া আছে, মামার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জল খাবো, মামা, জল-তেষ্টা পেয়েছে···

—দেখি? তাই তো রে, গা যে বড় গরম—উঃ, খুব জ্বর হয়েছে—যে ম্যালেরিয়ার জায়গা! আয়, চল, ওদের ঘরে শুইয়ে রাখিগে, ওঠ্···

খুকীকে জল খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মামা পুনরায় পাড়ার দিকে বাহির হইল। স্নানাহার বন্ধুদের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইল; ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, মুখুয্যে পাড়ার হাফ-আখড়াই-এর ঘরে গ্রামের নিষ্কর্মা ছোকরার দল একে একে আসিয়া পেঁছিল, প্রকাণ্ড কেটলিতে চায়ের জল চড়িল, গল্পে গল্পে বেলা একেবারেই গেল পড়িয়া।

এতক্ষণে হঠাৎ খুকীর কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার মামার। সে বলিল—ওই যাঃ, তোমরা বোসো ভাই, খুকীটার অসুখ হয়েছে ব'লে ভোম্বলদের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি অনেকক্ষণ, দেখে আসি দাঁড়াও···

ভোম্বলদের বাড়ীর বাইরের উঠানে গোয়ালের কাছে আসিতে ভোম্বলের বড় ছেলে টোনা বলিল—খুকু কোথায় কাকা?

খুকীর মামা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন, সে তোদের বাইরের ঘরে শুয়ে নেই?

—না কাকা, সে তো অনেকক্ষণ আপনার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছে, তখন খুব রোদ্দুর, উঠে কাঁদতে লাগল, বললে, মামার কাছে যাবো—শুনলে না, তখুনি রোদ্দুরে আপনাকে খুঁজতে বেরুলো···

—সে কি রে! আমি কোথায় আছি তা সে জানবে কেমন ক'রে? আর তোরা বা ছেলেমানুষকে ছেড়ে দিলি কি ব'লে? বেশ লোক তো! আর এ মেয়ে নিয়েও হয়েছে—

মামা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে পুনরায় পাড়ার দিকে ফিরিল। পরিচিত স্থানগুলিতে খোঁজা শেষ হইল, কোথাও সে নাই, কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়া গিয়াছিল কাহারও চোখে পড়ে নাই, কেবল মতি মুখুয্যের ছেলে বলিল, অনেকক্ষণ আগে একটি অপরিচিত ছোট খুকীকে চড়চড়ে রৌদ্রে টলিতে টলিতে ভোম্বলদের বাড়ীর উঠানের আগল পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল বটে, খুকীকে সে চেনে না, ভাবিয়াছিল ভোম্বলদের বাড়ীতে কোন কুটুম্ব হয়ত আসিয়া থাকিবে, তাহাদের মেয়ে।

অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল গ্রামের বাহিরের পথে। মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিরুপায় অবস্থায় পথের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিল, বৃদ্ধ হারাণ সরকার দেখিতে পাইয়া লইয়া আসেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সারাদিন কিছু খায় নাই—খাইবার মধ্যে দুপুরবেলা ভোম্বলদের বাড়ীর কোন্ ছেলে এক টুক্‌রা আমসত্ত্ব হাতে দিয়াছিল, জ্বরের ঘোরে সেটুকু শুধু চুষিয়াছে শুইয়া শুইয়া। তাহার মামাকে সকলে বকিতে লাগিল। সরকার মশায় বলিলেন—তোমারও বাপু আক্কেলটা কি—ছোট মেয়েটাকে নিয়ে দুপুর রোদে এক কোশ হাঁটিয়ে আনলে, পথে এল তার জ্বর, দেখলেও না, শুনলেও না, ওদের চণ্ডীমণ্ডপে কাৎ ক'রে ফেলে রেখে তুমি বেরুলে আড্ডা দিতে—না একটু দুধ, না কিছু—

তাহার মামা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা আমি কি আনতে গেছলাম, আমি বেরুবার সময় ছাড়ে না কোন রকমেই—তোমার সঙ্গে যাব মামা, তোমার সঙ্গে যাব মামা— আমি কি করব?

—বেশ, খুব আদর করেছ ভাগ্নীকে—এখন চল আমার বাড়ী, ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি, কচি মেয়েটাকে সারাদিন—ছিঃ—

খুকীর মামা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিবার সময় খুকীকে বলিল—কিন্তু বাড়ী গিয়ে কিছু বোল না যেন খুকু! মার কাছে যেন বোল না যে জ্বর হয়েছিল, কি হারিয়ে গিয়েছিলে, কেমন তো? লক্ষ্মী মেয়ে, বললে আমি কলকাতা যাবো পরশু, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব না...

—আমি কলকাতা যাব মামা...

—যদি আজ কিছু না বলো, পরশু ঠিক নিয়ে যাব...বলবি নে তো?

কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া খুকী বুদ্ধির দোষে সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও চেহারায় তাহার মা ঠাওরাইয়া লইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি খেলি রে খুকী সেখানে?

খাওয়ার কথা মামা কিছু শিখাইয়া দেয় নাই, সুতরাং খুকী বলিল—আমসত্ত্ব খুব ভাল—এত বড় আমসত্ত্ব...

—আমসত্ত্ব? আর কিছু খাসনি সেখানে সারাদিনে? হ্যাঁ রে ও যতীশ, খুকী সেখানে কিছু খায়নি?

—খেয়েছে বৈকি, খেয়েছে বৈকি—তা, হ্যাঁ—জানোই তো ওকে, কিছু খাওয়ানোই দায়...

মা একটু আড়ালে গেলে খুকী মুখ নীচু করিয়া হাসিমুখে মামার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—মাকে কিছু বলিনি মামা—কাল আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবে তো?

—ছাই যাবো, না-খাওয়ার কথা বললি কেন?—বাঁদর মেয়ে কোথাকার...

—মামার রাগের কারণ খুকী কিছু বুঝিতে পারিল না।

খাওয়ার কথা সম্বন্ধে মামা তো কিছু বলিয়া দেয় নাই, তবে সে কথা যদি বলিয়া থাকে তাহার দোষ কি?

তাহার মামা একথা বুঝিল না। রাগিয়া বলিল—তোমার জন্যে যদি আর কখনো কিছু কিনে আনি খুকী, তবে দেখো ব'লে দিলাম—কখনো আনব না, কলকাতাতেও নিয়ে যাব না।

তাহার প্রতি এই অবিচারে খুকীর কান্না আসিল। বা রে, তাহাকে যে কথা বলিয়া দেয় নাই, তাহা বলাতেও দোষ? সে কি করিয়া অতশত বুঝিবে?

খুকী খুব অভিমানী, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে বসিল না, এক কোণে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে তাহার মামা কলিকাতায় রওনা হইল—যাইবার সময় তাহার সহিত কথাটিও কহিল না।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষা শেষ হইয়া গেল, শরৎ পড়িল—ক্রমে শরৎও শেষ হয়। পূজা এবার দেরিতে, কার্তিক মাসের প্রথমে, কিন্তু বাড়ী-বাড়ী সবাই জ্বরে পড়িয়া, পূজায় এবার আনন্দ নাই। প্রবীণ লোকেও বলিতে লাগিলেন, এরকম দুর্বৎসর তাঁহারা অনেকদিন দেখেন নাই।

উমা সারা আশ্বিন ধরিয়া ভুগিয়া সারা হইয়াছে। একে কিছু না খাওয়ার দরুণ

সব ধরনের বাংলা বই/ম্যাগাজিন সম্পূর্ন ফ্রী ডাউনলোড করতে

ভিজিট করুন-

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফেসবুকে আমাদের সাথে যোগ দিতে লাইক করুন

www.facebook.com/banglabookpdf

রোগা, তাহার উপর জ্বরে ভুগিয়া রোগা—তাহার শরীরে বিশেষ কিছু নাই। তবুও জ্বরটা একটু ছাড়িলেই কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে,...কারুর কথা শোনে না—তারপর গয়লা-পাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, কোথায় নবীন ধোপার তেঁতুলতলা—এই করিয়া বেড়ায়। বাড়ী ফিরিলেই দুম্ দুম্ কিল পড়ে পিঠে। মা বলে—দস্যি মেয়ে, মরেও না যে আপদ চুকে যায়, কবে যাবে ষষ্ঠীর মাঠে। কবে তোমায় রেখে খুকী-খুকী ব'লে কাঁদতে কাঁদতে আসব...

ওঘর হইতে বড়-জা বলিয়া ওঠে—আচ্ছা, ওসব কি কথা সকালবেলা ছোট বৌ... বলি মেয়েটার ষষ্ঠীর মাঠে যাবার আর তো দেরী নেই, ওর শরীর আর আছে কি...তার ওপর রোগা মেয়েটাকে ওইরকম ক'রে মার?...ছি ছি, একটা পেটে ধ'রেই এত ব্যাজার, তবুও যদি আর দু'একটা হ'ত। এস উমা, আমার দাওয়ায় এসো তো মাণিক! এসো এদিকে।

তাহার মা পাল্টা জবাব দিয়া বলে—বেশ করেছি, আমি আমার মেয়েকে বলব তাতে পরের গা জ্বলে কেন? যাসনে ওখানে, যেতে হবে না। শোখীন কথা সকলে বলতে পারে—যখন জ্বর হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তখন যত্ন করতে তো কাউকে এগুতে দেখিনে—তখন তো রাত জাগতেও আমি, ডাক্তার ডাকতেও আমি, ওষুধ খাওয়াতেও আমি—মুখের ভালোবাসা অমন সবাই বাসে...

দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া বাধিবার কথা বটে এ অবস্থায়, কিন্তু বড়-জা হরমোহিনী বড় ভাল মনুষ। সাতেপাঁচে থাকিতে ভালবাসে না, খুকীর ওপর একটা স্নেহও আছে, সে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

পূজার সময় খুকীর মামা আবার আসিল। তাহারও বয়স এই কুড়ি-একুশের বেশী নয়, এই দিদিটি ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। এতদিন কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টায় ছিল, পূজার কিছুদিন মাত্র পূর্বে কোন্ ছাপাখানায় মাসিক আঠারো টাকা বেতনে লিনোটাইপের শিক্ষানবিশী করিতে ঢুকিয়াছে।

অনেক খাবারদাবার, খুকীর জন্যে ভাল ভাল দু'তিনটা রঙিন জামা, ছোট ডুরে শাড়ী ও জাপানী রবারের জুতা আনিয়াছে। তাহার দিদি বকে—এসব বাপু কেন আনতে যাওয়া, সবে তো চাকরি হয়েছে, নিজের এখন কত খরচ রয়েছে, দু' পয়সা হাতে জমাও, ভাল খাও-দাও—শরীর তো এবার দেখছি বড্ডই খারাপ—অসুখ-বিসুখ হয় নাকি?

ছেলেটি হাসিয়া বলে—না দিদি, অসুখ-বিসুখ তো নয়, বড্ড খাটুনি, সকাল ন'টা থেকে সারাদিন, বিকেল ছটা অবধি—এক-একদিন আবার রাত আটটাও বাজে—এক-একদিন আবার রবিবারেও বেরুতে হয়, তবে তাতে ওভার-টাইম পাওয়া যায় বারো আনা ক'রে—এবার গুড় উঠলে এক কলসী গুড় নিয়ে যাবই এখান থেকে, ভিজে ছোলা আর গুড় সকালে উঠে বেশ জলখাবার হবে।

তারপর সে চীনামাটির খেলনা বাহির করিয়া খুকীকে ডাকে—ও উমা, দেখে যা কেমন কাঁচের ঘোড়-সেপাই, এদিকে আয়...

খুকী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, মামা আসাতে খুকীর খুব আহ্লাদ হইয়াছে, এসব ধরনের খাবার মামা না আসিলে তো পাওয়া যায় না!...পূজার কয়দিন খুকী মামার কাছেই সর্বদা থাকিল। সকাল হইতে না হইতে খুকী চোখ মুছিয়া আসিয়া মামার মাছে বসে, মাঝে মাঝে বলে, এবার কলকাতায় নিয়ে যাবে না মামা?

পূজা ফুরাইয়া গেলে খুকীর মামা দিদির কাছে প্রস্তাবটা উঠায়, দিদি সহোদর বোন নয়, বৈমাত্রেয়, তবুও তাহাকে বেশ ভালবাসে, যত্ন করে। সেও ছুটি-ছাটা পাইলে এখানে আসে। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দিন-দশেকের জন্য আপাততঃ খুকীকে

কলিকাতা ঘুরাইয়া আনিবার সম্মতি দিল।

খুকীর মামা খুশী হইয়া বলে—আমি ওকে লেখাপড়া শেখাব, সেখানে গিয়ে মহাকালী পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেব—দেখতে পাই কেমন গাড়ী আসে, বাড়ী থেকে ছেলেমেয়েদের তুলে নিয়ে যায়—গাড়ীর গয়ে নাম লেখা আছে 'মহাকালী পাঠশালা'।

ভগ্নীপতি হরি মুখুয্যে বলেন—পাগল আর কি! অতটুকু মেয়ে স্কুলে ভর্তি আবার কি হবে?...হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছে—ছেলেমানুষ, ও কি আর গিয়ে টিকতে পারে? যাও নিয়ে দু'দিন—এখানে তো ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় হাড় সার ক'রে তুলেছে—যদি দু'দিন হাওয়া বদলাতে পারলে সেরে যায়...

ট্রেনে কলিকাতা আসিবার পথে উমা খুব খুশি। প্রথমটা তার ভয় হইয়াছিল, রেল-গাড়ীর জানালার ধারে মামা বসাইয়া দিয়াছে, গাড়ীটা চলিতেই খুকীর মনে হইল তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া যাইতেছে, ভয়ে তাহার চোখ বড় বড় হইল—আতঙ্কে মামাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেই তাহার মামা হাসিয়া বলিল—ভয় কি, ভয় কি খুকু? এ যে রেলের গাড়ী—দেখ আরও কত জোরে যাবে এখন...

রেলগাড়ী চড়িবার আনন্দকে যে বয়সে বুদ্ধি দিয়া উপভোগ করা যায়, উমার সে বয়স হয় নাই। সে শুধু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহার মামা উৎসাহের সুরে বলে—কেমন রে খুকী, সব কেমন বল্ তো? কেমন লাগছে রেলগাড়ী?

খুকী বলে—খুব ভাল...

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করে যে খুকী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাড়ী কলিকাতায় পৌঁছিলে একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহার মামা তাহাকে বাসায় আনিল। অখিল মিস্ত্রীর লেনে একটা ছোট মেসে বাসা, অফিসের বাবুদের মেস. সকলেই বয়সে প্রবীণ, সে-ই কেবল অল্পবয়স্ক। খুকীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই আনন্দ হইল। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাস-মাহিনার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িবার দরুণ মাসে একবার কি দুইবার ভিন্ন বাড়ী যাওয়া ঘটে না, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুকীকে পাইয়া একটা অভাব দূর হইল। চার-পাঁচ বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে, চাঁদের মত মুখখানি, কোঁকড়া কালো চুল, কালো চোখের তারা,—আপিসের ছুটির পর তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এ ডাকে উহার ঘরে, ও ডাকে তাহার ঘরে।

কিন্তু তাহার মামার বড় দুঃখ, খুকীর বেশভূষা একেবারে খাঁটি পাড়াগেঁয়ে। মাথায় বিনুনী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, অতটুকু মেয়ের পায়ে আবার আল্তা, ছোট চুনুরী শাড়ী পরনে, ওসব সেকেলে কাণ্ড আজকাল শহর-বাজারে কি চলে? দিদি পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকে, শহরের রীতিনীতি বেশভূষার কি ধার ধারিবে? এখানকার ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়েদের কেমন সুন্দর চুলের বিন্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন. ফিটফাট সাজানো, দেখিতে যেন কাঁচের পুতুল। খুকীকে ঐ রকম সাজানো যায় না?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে খুকীকে সঙ্গে করিয়া ট্রামে ধর্মতলার এক চুল ছাঁটাই দোকানে লইয়া গেল। নাপিতকে বলিল—ঠিক সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের মত যদি চুল কাটতে পার তবে কাঁচি ধরো, নইলে অমন ঘন কালো চুল নষ্ট কোর না যেন।

মেস হইতে সে খুকীর মাথার বিনুনী খুলিয়া আনিয়াছিল।

চুল ছাঁটিতে উমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। সামনে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, চার-

পাঁচটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, নাপিত মাঝে মাঝে আবার ময়দার মত কি একটা গুঁড়া তাহার ঘাড়ের চুলে মাখাইতেছিল···এমন সুড়সুড়ি লাগে।···

তাহাকে সাজাইতে খুকীর মামা পাঁচ-ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। মেসের নিয়োগী মশায় একে একে কয়েকটি পুত্র-কন্যাকে উপরি উপরি চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে হারাইয়াছেন, উমাকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিলেন না। সন্ধ্যার পর রঙিন ফ্রক পরা, বব্‌ড চুল, মুখে পাউডার, পায়ে জরির জুতা, আর এক উমা যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া তো নিয়োগী মশায় বিষম খাইবার উপক্রম করিলেন।

তাহার মামা হাসিয়া বলে—গেলই না হয় কিছু খরচ হয়ে, এমন সুন্দর মেয়ে কি ক'রে ভূত সাজিয়ে রেখেছিল বলুন দিকি?···ও কুণ্ডুমশায়, চেয়ে দেখুন পছন্দ হয়?

কি করিয়া খুকীর শীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিল। গলির মোড়ের একজন ডাক্তার কড্‌লিভার অয়েল ও কেপ্‌লারের মল্ট এক্সট্রাক্টের ব্যবস্থা দিলেন, তাহা ছাড়া বলিলেন—খাওয়া চাই, না খেয়ে খেয়ে এমন হয়েছে—পুষ্টির অভাব, এ বয়সে এদের খুব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়ানো চাই কিনা। সকালে কোয়েকার ওট্‌স্ খাওয়াবেন দিন পনেরো, দেখুন কেমন থাকে।

কিন্তু চতুর্থ দিনে খুকীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। খুকীর মামার লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিন খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্য দিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না।··· সন্ধ্যার পূর্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া এক টুকরা মিছরি চুষিতে লাগিল। আপিসফেরতা ফণীবাবু একটা বেদানা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোট্যাতিনেক কমলালেবু, আরও দু'তিন জনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন।···সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল। মামা বিস্মিত হইয়া বলিল —কি রে খুকী? কি হয়েছে?

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ী যাব মামা···মার কাছে যাব···

—আচ্ছা কেঁদো না খুকু—জ্বর সারুক, নিয়ে যাব এখন।

দু'তিন দিন কেটে গেল। জ্বর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্য কাঁদিয়া ওঠে।···ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন হগ সাহেবের বাজারে খেলনার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা-পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার এক মাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্য একটা পতুল পছন্দ করো খুকু, ওটা ভাল না। কেমন ছোট ছোট এইসব কুকুর, হাতী কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্ব হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল—বাবু, খুকীর মনে কষ্ট হয়েছে, আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্ছি···

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু তুমি বড়ো খোকা-পুতুলটাই নাও—কুকুরের দরকার নেই—ধরো বেশ ক'রে, যেন ভাঙে না দেখো···

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টায় যাওয়া, ততক্ষণ অন্যান্য দিনের মত নিয়োগী মহাশয়ের

তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা।...খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জন শুরু হইল। মেসে কোন ঘরে কেহ নাই, উমার ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুইজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মমা কোথায় গেল? মামা আসে না কেন?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল—ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু?

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে—নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় জ্যাতাবাবু?

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ আচ্ছা আচ্ছা।...

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন দেশের বাটিতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকিদার লাঠি ঘাড়ে রোঁদে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল সে নামিয়া নীচে আসিল। ঝি-চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই রাস্তাটা পার হইলেই তাহার মামার কাছে পেঁছানো যাইবে, এই পথের যেখানটাতে শেষ, সেখান হইতেই পরিচিত গণ্ডীর আরম্ভ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, গলি পার হইয়া আর একটা বড় গলি, তাহার পর একটা লোহার বেড়া-ঘেরা মাঠ মত, সেটার পাশ কাটাইয়া আর একটা গলি। ক্রমে খুকীর সব গোলমাল হইয়া গেল, এ পর্যন্ত সে একবারও পিছনের দিকে চাহে নাই, একবার পিছনের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে দিকটাও সে চেনে না।... সামনের পিছনের দুই জগৎই তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও একটা এমন জিনিস নাই যাহা সে পূর্বে কখনো দেখিয়াছে।...

সে ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক দুপুর বেলা, পথে লোকজনও কম, বিশেষতঃ এই সব গলির মধ্যে। আরও খানিকদূর গিয়া একটা লাল রঙের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে খুকী, কাঁদছ কেন?...তোমাদের কোন্ বাড়ীটা, এইটে?

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি মামার কাছে যাব...

—তোমাদের ঘর কোথা গো?

খুকী আঙুল তুলিয়া একটা দিক দেখাইয়া বলিল—ওই দিকে।

—তোমার বাপের নাম কি?

বাপের নাম...কই তাহা তো সে জানে না! বাপের নাম 'বাবা'—তা ছাড়া আবার কি? সে চোখ তুলিয়া ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল।

স্ত্রীলোকটি একবার গলির দুই দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল—আচ্ছা এস, এস খুকী আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এস...

এ-গলি, ও-গলি ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা ছোট্ট খোলার বাড়ী। ঝি কাহাকে ডাকিয়া কি একটা কথা নীচুস্বরে বলিল, তারপর দুইজনেই খানিকক্ষণ কি বলাবলি করিল, নবাগতা স্ত্রীলোকটি হাত দিয়া কি একটা দেখাইল, খুকী সে সব বুঝিতে

পারিল না। পরে তাহারা খুকীকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ছোট ঘুল-ঘুলির কাছে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা ও তাহার চারিপাশে একরাশ অন্ধকার। খুকীর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল—যক্ষিবুড়ী যে জালাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকাইয়া পুরিয়া রাখিবার গল্প শুনিয়াছে, যেন সেই ধরণের জালা। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—আমার মামা কোথায়?

নবাগত স্ত্রীলোকটি বলিল—কেউ দেখেনি তো আনবার সময়ে? আমার বাপু ভয় করে। এই সেদিন সৈরভীর বাড়ীতে পুলিশ এসে কি তম্বি, আমি থালা ফেরৎ দিতে গেনু তাই···

খুকীদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে যে স্ত্রীলোকটি সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—নেকু। যাও, সামনের দরজাটা খুলে ঢাক করে রেখে এলে কেন?···নেকু, জানে না যেন কিছু!

সে খুকীকে চৌকির উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদরের কথা বলিল, তাহাকে একটা রসগোল্লা খাইতে দিল। পরে খুকীর হাতের সোনার বালা দু'গাছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—এখন তুলে রেখে দি খুকী?···বেশ লক্ষ্মী মেয়ে—দেখি···

খুকী ভয়ে ভয়ে বলিল—বালা খুলো না···আমার মামাকে ডেকে দাও···

কিন্তু ততক্ষণে ঝি তাহার হাত হইতে বালা দু'গাছা অনেকটা খুলিয়াছে, দেখিয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার বালা নিও না, মামাকে বলে দেব—আমার বালা খুলো না···

মতি-ঝিয়ের ইঙ্গিতে নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনেই বড় ভুল করিয়াছিল, উমার কাটি কাটি হাত-পা দেখিয়া তাহার লড়াই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের হয়তো সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর অসত্য তাহা গত মাসে দুগ্ধপানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উমার মা ভালরূপেই জানিত। ইহারা সেসব খবর জানিবে কোথা হইতে? বেচারীদের ভুল ভাঙ্গিতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না, ধস্তাধস্তিতে বিছানা ওলটপালট হইয়া গেল, উমার আঁচড়-কামড়ে মতি-ঝি তো বিব্রত হইয়া উঠিল। গোলমালে একগাছা বালা হাত হইতে খুলিয়া কোথায় চৌকির নীচের দিকে গড়াইয়া গেল। পিছন হইতে তাহার হাত-মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্যগাছা নবাগতা স্ত্রীলোকটি ছিনাইয়া খুলিয়া লইল।

মতি-ঝি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—হাঁপিয়ে মরে যাবে—দেখি ও আপদ রাস্তার ওপরে রেখে আসি—বাপ্‌রে, কি দস্যি!···

—এখন কোথায় রাখতে যাবি লো? খ্যান্তমণিকে একটা খবর দিবি নে?

—না বাপু, তাতে আর দরকার নেই, ওকে রেখে আসি—কেউ টের পাবে না, দেখ্ না ব'সে ব'সে···

তুমুল গোলমাল, খোঁজাখুঁজি, হৈচৈ-এর পরে সন্ধ্যার সময় উমাকে পাওয়া গেল নেবুতলার সেণ্টজেমস্ পার্কের কোণে। কেবিন-ছাঁটাই বব্‌ড চুল ছেঁড়াখোঁড়া, কপালে ও গালে আঁচড়ের দাগ; হাত শুধু, ফ্রকের কোমর-বন্ধ ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে···'মামা,' 'মামা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, অনেক লোকে চারিধারে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, একজন গিয়া একটা পাহারাওয়ালাও ডাকিয়া আনিয়াছে—ঠিক সেই সময়ে নিয়োগী-মশায়, কুণ্ডু-মশায়, সতীশবাবু, অখিলবাবু, খুকীর মামা সবাই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কেনো খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভৎ'সনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন ইত্যাদি। সবাই বলিল—যাও ওকে কলই বাড়ী রেখে এস, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো ...মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দু'গাছা পালিস-করা বিলিতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়ীতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু বলো না?...কেমন তো?...কক্ষনো বলো না যেন?...হ্যাঁ, লক্ষ্মী মেয়ে—তাহলে আর কলকাতায় নিয়ে আসব না...

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজি হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা...আর একটা মেম পুতুল...

কাল রাত্রে গ্রামের লোকের ঘুম হয় নাই ভাল।

আজ চাটুয্যে-গিন্নীর নাৎনীকে দেখিতে আসিবার দিন। গ্রামসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ সেখানে আজ নিমন্ত্রিত।

কিন্তু শুধু নিমন্ত্রণের আনন্দই যে এদের ঘুম না-হইবার একমাত্র কারণ তাহা নয়। ছোট্ট গাঁ, সবসুদ্ধ ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। কেহ বিদেশে যায় না, চাকুরি করে না, করিবার দরকারও নাই। সামান্য জমিজমাটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেকে একরকম দিনপাত করে! কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগৎটা আছে, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেও না, জানিবার জন্য মাথাও ঘামায় না। তাই কাল যখন জানা গেল, চাটুয্যে-বাড়িতে মেয়ে দেখিতে যে আসিতেছে, সে কলিকাতার ছেলে ও কলেজে শিক্ষিত, তখন এই অদৃষ্ট-পূর্ব জীবটিকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার আনন্দটা, খাওয়ার আনন্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। তাছাড়া যে বর, সে-ই স্বয়ং আসিতেছে নিজের চোখে পাত্রী দেখিতে—আজকালকার ছেলের তাই ধরন। রেলের স্টেশনে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি গিয়াছে। বেলা দশটার মধ্যে এখানে পেঁছাইয়া যাইবে। রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে একদিকে ভূষির বস্তা ও বিচালীর স্তূপ সরাইয়া নূতন মাদুর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, কারণ চাটুয্যে-বাড়িতে বাহিরের বসিবার ঘর নাই। পাত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের শখের যাত্রাদলের ছেলেরা কয়দিন হইতে গান-বাজনার তালিম দিয়াছে; একটি ছোকরা মামারবাড়ি বেড়াইতে গিয়া কলের গানে রিজিয়া ও বক্তিয়ারের অভিনয় শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিল—গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বহুবার শুনাইয়াছে—আজ সেও একবার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অধীর হইয়া আছে।

সকাল হইতেই চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের জটলা। তাহারা ঘন ঘন তামাক খাইতেছে ও নানাবিষয়ে গল্পগুজব করিতেছে। বিশ্বাস-মহাশয়ের এক দূর-সম্পর্কের ভাই কলিকাতার কোন্ গদীতে বিল-সরকারের চাকুরী করিত—কলিকাতার গল্প বিশ্বাস-মহাশয় তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন—সম্প্রতি তিনি তাহাই মুগ্ধ ও কৌতূহলী শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বলিতেছিলেন।

পাঠশালার গুরু নিতাই সামন্ত আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গরুর গাড়ি ফিরেছে—বাঁশ-ঝাড়ের আগালে পড়ে' জুলির পথটা বুজে গিয়েছে কিনা, তাই ঘুরে আসছে বোধ হয়।

সকলেই গরুর গাড়িটা দেখিল, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিল না যে, পাত্র আসিতেছে। গরুরগাড়িটা ঘুরিয়া পিছনের পথ দিয়া আসিতেছিল, কেহই দেখিতে পাইল না ছই'-

এর মধ্যে লোক বসিয়া আছে কিনা।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে। কলেজের ছেলেটি আসিয়া মাদুরে বসিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশ কি এক-আধবছর বেশী, রং ফরসা, গায়ে মট্‌কার পাঞ্জাবি ও চাদর, চোখে চশমা। সে বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে প্রথম ট্রেনটা ফেল হওয়ার গল্প করিতেছিল। সবাই হাঁ করিয়া শুনিতেছিল।

প্রথমে যদু ভড়ের কীর্তনগান শুরু হইল। তারপরে দুলাল মুখুয্যে শ্যামাবিষয়ে গাহিলেন। একজন বেহালা বাজাইল। তারপর রিজিয়া ও বক্তিয়ার।

গ্রামের সাতকড়ি মুখুয্যে এইবার তার ছেলে তিনটিকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলেন। সাতকড়ি লেখাপড়া আদৌ জানেন না, গোলার ধানে সম্বৎসর চলিয়া যায়—সুতরাং চাকুরির ধারও ধারেন না, কিন্তু তার ঝোঁক গান বাজনার দিকে। পাঁচটি ছেলের একটিকেও লেখাপড়া শেখান নাই, গান-বাজনা শিখাইয়াছেন এবং যে-সব গ্রাম্যমজলিসে অন্য সব গ্রাম হইতে দু'পাঁচজন বাহিরের লোক আমদানী হয়, সে-সব স্থানে ছেলে কয়েকটিকে সঙ্গে লইয়া একখানা কম দামী বেহালা হাতে সাতকড়ি গিয়া হাজির হন।

ইনি আসন গ্রহণ করিয়াই সেজ ছেলে বসন্তকে বলিলেন—বাবা, রজনের থলিটা আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে—একবার দৌড়ে যাও তো বাড়ি—চালির মুড়োয় তোলা আছে।

বসন্ত অপ্রসন্ন মুখে পৈঠা দিয়া নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে সে বাবাকে দু'কথা শুনাইত—কিন্তু নবাগত শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহার সাহসে কুলাইল না।

—গেনু (বসন্তের ডাক নাম) আজকাল যা কীর্তন গায়, চমৎকার। রাসু অধিকারীর গাওনা তো শুনেছি ঘেঁট্‌গাছির বারোয়ারীতে—তার চেয়ে কম নয়। আমার ছেলে বলে' বলছি নে পদ্ম খুড়ো, তা নয়। রজন্‌টা ফেলে এসে মুশকিল হোল কিনা!...শোনাচ্ছি একখানা, আসুক।

পদ্মলোচন চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত—তিনি গান-বাজনা বিশেষ বোঝেন না, তবুও সাতকড়িকে খুশি করবার জন্য বলিলেন—আহা হীরের টুকরো ছেলে তোমার বসন্ত। ওর গলা আর শুনিনি আমি? কোজাগরী পুজোর দিনে মহিমদা'র বাড়িতে গাইলে—আহা, যেমনি গলা তেমনি তাল-বোধ।

সাতকড়ি ছেলে তিনটিকে চারিদিকে বসাইয়া নিজে মধ্যে বসিলেন। ইতিমধ্যে রজন আসিয়াছিল, গান শুরু হইল।

—আর একটু ঠায়ে ধর বাবা...

বলিয়া সাতকড়ি গর্বিত হাসিমুখে ও প্রশংসমান-দৃষ্টিতে কীর্তনগানরত পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া আবার চারিধার চাহিতে লাগিলেন। গান একে একে অনেকগুলি হইল। সাতকড়ি বড় ছেলেকে একবার ফরমায়েস করিয়া বলেন—মানু, গা তো সেই "ওগো শ্যাম গুণমণি?"...বড় ছেলের শেষ হইলে আবার সেই সেজ ছেলেকে ফরমায়েশ করিতেছিলেন—ধর দিকি বাবা "মম মানস শুক পাখি?" অনেকদিন শুনিনি তোর মুখে। কৈলাস খুড়ো' একটু ঠেকা দিয়ে যাও না, ভাল গানখানা...

সাতকড়ি ছেলেদের লইয়া আসিবার পর আসরে আর কেহ আমল পান নাই। সাতকড়ি নিজের ছেলেদের নিজে বাহবা দিয়া, হাসিয়া, চোখ বুজাইয়া, ঘাড় দোলাইয়া, ফরমায়েশ করিয়া এমন জমাইয়া তুলিলেন যে আর কাহারও আমল পাইবার যো ছিল না।

খানিকটা পরে আগন্তুক শহুরে-ছেলেটি কি কথায় কলেজের গল্প তুলিল। সে নূতন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী। এ ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ের লোকজনের মাঝে কথা বলিয়াও সুখ আছে। তাহার ইংরাজী বুক্‌নি-মিশানো কথা-

বার্তায় সাতকড়ি ভয় খাইয়া গেলেন! ছেলেটি বলিতেছিল—এ সব পাড়াগাঁয়ে সে-সব কেই বা বোঝে...এডুকেশন না থাকলে কি একটা জাত কখনো উঠতে পারে?...কলেজে আজকাল মেয়েরা পড়চে—এম.-এ বি.-এ. পর্যন্ত পাস করছে—সে সব দিন কি আর আছে? দেখে আসুন একবার কলকাতায় গিয়ে।

মেয়েদের এত লেখাপড়ার কথা এ-গ্রামে কেহ শোনে নাই। কৈলাস ভট্‌চার্য বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—মেয়েরা এম্-এ বি-এ পাস দিচ্ছে? বলো কি বাবাজী! কই এ-কথা শুনিনি তো?

এ পাড়াগাঁয়ে বসে' শুনবেন কোথা থেকে? ছেলেরা যেখানে কখনো স্কুলের মুখ দেখেনি, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা তো ভাবতেই পারবেন না।

ও-দিকে সাতকড়ি মুখুয্যে একটু অপ্রতিভ হইলেন। শুধু অপ্রতিভ নয়, কোথায় যেন তিনি নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন। পাঁচ পাঁচটি ছেলের কোনোটিকেই লেখাপড়া শেখানোর কোনো চেষ্টা করেন নাই—গান-বাজনা শিখিলে ভদ্রসমাজে, মজলিসে সর্বত্র সম্মান ও গৌরবলাভ করা যাইবে—এতদিন তিনি ইহাই জানিয়া আসিয়াছেন, ছেলেগুলিকে সেই অনুসারেই মানুষ করিয়াছেন। কুলবেড়ের বাহিরে বড় জগৎটাতে যে অন্য ধরনের হিসাব-নিকাশ প্রচলিত, তাহাদের খোঁজও তিনি জানিতেন না।

তিনি নিঃশব্দে তাঁর বেহালাখানা খেরোর খাপের মধ্যে পুরিলেন, রজনের থলিটা সবার অলক্ষ্যে বড় ছেলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

একটু পরে জলযোগের ডাক পড়িল।

ইহাও কেবল মাত্র ভাবী পাত্রের জন্য নহে, গ্রামস্থ সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের জন্য। ছেলেটি এই প্রথম পাত্রীর বাড়ি দেখিল। দেখিয়া একটু নিরাশ হইল। চার পাঁচখানি খড়ের বড় বড় ঘর, সামনের উঠানে বড় বড় গোটাকতক গোলা, দক্ষিণে একটা পুকুর, একটা বাতাবীলেবুর গাছ ও গোটাকতক নারিকেল গাছ। পাত্রীর দিদিমা বাড়ির কর্ত্রী; তিনিই গ্রামসুদ্ধ সলককে আদর করিয়া বসাইলেন, জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

ক্রমে বেলা চড়িয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজন মিটিতে দুইটা বাজিল। ছেলেটি একটু অবাক হইল, ইহাদের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া। একটি পনেরো বছরের বালকও যাহা খাইল, তাহা তার নিজের তিন বেলার খোরাক।

বেলা যখন পাঁচটা, তখন কৈলাস ভট্‌চায আসিয়া বলিলেন—বাবাজী, ওঠো একবার মেয়েটিকে দ্যাখো। বাবাজীই বলি, তোমার সঙ্গে তো সম্পর্কই বাধলো, মেয়ে দেখে অপছন্দ হবে না। তবে এ তো শহর বাজার নয়, একটু আধটু যা ত্রুটি, তা তোমাকে শুধরে নিতে হবে বৈকি। এসো বাবাজী।

আবার চাটুয্যে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। গতিক দেখিয়া মনে হয়, অদ্যকার মত একটা উৎসবের ব্যাপার ইহাদের গ্রামে অনেককাল ঘটে নাই। অন্ততঃ আগন্তুক ছেলেটির তাহাই মনে হইল: নতুবা গৃহস্থ-বাটীতে মেয়ে-দেখানো-রূপ সামান্য ব্যাপারে গ্রামসুদ্ধ লোকের এত উৎসাহ কেন?

মেয়ে দেখিয়া ছেলেটি সন্তুষ্ট হইল। বেশ স্বাস্থ্যবতী, রং খুব ফরসা না হইলেও মানান্‌সই—মুখশ্রী সুন্দর, বড় বড় চোখ। কেবল ইহাদের চুল বাঁধিবার ধরন সে পছন্দ করিল না। পাতা-কাটা খোঁপা শহর হইতে কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে, আর ইহারা সেটাকে এখনও ফ্যাশন বিবেচনা করে! তা ছাড়া অত গহনা কেন গায়ে? গহনার ভারে মেয়েটি যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

দিদিমা সজল চোখে বলিলেন—ওকে নাও গিয়ে দাদাভাই। ও আমার যেমন মেয়ে, তেমন মেয়ে এদিকে নেই, এ আমি বড় গলা করে' বলতে পারি। ওর মা আমাকে ফাঁসি

দিয়ে চলে' গেল, মেয়ে তখন তিন-মাসের—সেই থেকে আমার কাছে মানুষ। আমারও তো ও-ছাড়া আর কেউ নেই, ওর বাবা কোনো খোঁজ নেয় না ; সে আবার বিয়ে করেছে ছেলেপুলেও হয়েছে, সে এ-দিক মাড়ায় না। তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই—তারপর যা রইলো সবই তোমাদের। কর্ত্তারা যা করে রেখে গিয়েছেন, তাতে চাকরি করে' খেতে হবে না, আমাদের বাড়িতে চাকরি কখনো কেউ করে নি।

কৈলাস ভট্‌চায বলিলেন—এ-গাঁয়ে কখনও কেউ চাকরি করেছে বউ-ঠাকরুণ? আপনাদের কর্তাদের কথা তো বাদই দিন, তাঁরা তো ছিলেন গাঁয়ের মালিক, মাথার মণি—আমাদের কর্তারা, কি আমরা কখনো গাঁয়ের বাইরে অন্নের চেষ্টায় পা বাড়িয়েছি? রামোঃ। এই যে দেখছো বাবাজী উত্তরে মাঠ এ সব লাখ্‌রাজ, একেবারে সেই রতনপুরের নীলকুঠি পর্যন্ত। তবে এদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই, একা বউ-ঠাকরুণ আছেন, মেয়েমানুষ, তাই চাষ বাস হয় না। নইলে ষাট সত্তর বিঘে খাসে আমন ধানের জমি রয়েছে, দুটো বড় পুকুর রয়েছে—চাষ করলে ভাবনা কিসের? এই দেখছো বটে খড়ের ঘর, এ গাঁয়ে সকলেই এঁদের প্রজা।

ছেলেটির নাম সুরেন। আহারাদির পরে সে বাড়ির চারিধারে ঘুরিয়া দেখিল। কলিকাতায় থাকিবার আজকাল বড় কষ্ট, পড়াশুনা শেষ করিয়া চাকুরির বাজারও সুবিধা নহে—যদি এখানে বিবাহ করিয়া সম্পত্তি পাইয়া বাস করা যায়, এ পল্লীগ্রামের শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে শহরের উগ্র জীবন-সংগ্রাম হইতে বেশ দূরে, নিশ্চিন্তভাবে চমৎকার জীবন কাটিবে এখন।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ জমিটা পড়ে আছে কেন ভট্‌চায্যি মশায়।

—ওই যে তোমাদের বল্‌লাম বাবাজী, এদের বাড়িতে চাষ করবার মানুষ কই? বুড়ী একা তো সব দিক্ দেখতে পারে না। তোমার সঙ্গে যদি বিধাতা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তবে তুমিই এসে সব নিজের হাতে নাও না? তোমায় তা হোলে কি কারুর চাকরি করতে হবে। পায়ের ওপর পা দিয়ে চাটুয্যেদের সাত পুরুষ এই ভিটেতে দুধ-ঘি খেয়ে কাটিয়ে গিয়েছে, তোমারও কাট্‌বে।

সুরেন নিজের মেসের কথা ভাবিতেছিল। জানালাহীন ছোট্ট ঘরটার কথা ভাবিল—হাওয়া কোনো কালে খেলে না, গরমে অর্ধেক দিন রাত্রে ঘুম হয় না। এতটুকু এক টুকরা মাছ, বিস্বাদ ডাল, ততোধিক বিস্বাদ তরকারী—একদল লোক খাইয়া উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভাল করিয়া না ধুইয়াই তাহার উপর আর একদল লোক খাইতে বসিয়া যায়, দেওয়ালের গায়ে আরসুলা চলাচল করে—সব কথা ভাবিয়া দেখিল।

এখানে এই মুক্ত মাঠের ধারে স্বাধীন জীবন—নিজের লোকজন, নিজের হুকুমমত সকলকে খাটানো। সে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এ-সব তো তাহার কাছে স্বর্গের মতই নাগালের বাহিরের জিনিস। মন্দ কি? আইন পাস করিয়া কি হইবে? এই তো বেশ।

মহা উৎসাহে সে ভট্‌চায্যি-মশায়কে বিষয়-আশয় সংক্রান্ত আরও প্রশ্ন করিতে লাগিল। কলমের বাগানগুলো কোন্ দিকে? প্রত্যেকটাতে কতগুলো করিয়া গাছ? পুকুরগুলো কি মাছ ছাড়িবার উপযুক্ত আছে?

বেলা খুব পড়িয়া আসিয়াছিল। নিকটের বিলের ধার হইতে চরিয়া গরুর দল কর্দমাক্ত গায়ে বাড়ি ফিরিতেছিল। সান্ধ্য হাওয়ায় তালগাছে বাবুই পাখীর বাসা দুলিতেছে ও শুক্‌না তালপাতার খড়্‌-মড়্‌ শব্দ হইতেছে!

সুরেন একা একটু বেড়াইবার জন্য দক্ষিণের মাঠের রাস্তাটা ধরিল। কৈলাস ভট্‌চায এবার সঙ্গে সঙ্গে আসেন এটা সে চায় না ; কিন্তু ভট্টাচার্য মশায় খোশগল্পের

শ্রোতাকে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

—শুভ রত্নপুরের খড়ের মাঠটার শালিয়ানা তিনশো টাকা আয় ছিল বাবাজী। বাঁড়ুয্যেগিন্নী তো বোঝেন না, ওঁকে ঠকিয়ে সেটা বারো ভূতে খাচ্ছে। তুমি দেখে শুনে খাসে আদায় করবে, শিখিয়ে দিলাম তোমায়!

সন্ধ্যার পরে আবার অনেকে চণ্ডীমণ্ডপে জড় হইল।

সুরেন এবার যেন এখানকার এই সকল আনন্দস্রোতে নিজেও ভাসিয়া গেল। সাতকড়ির বেহালা দু'তিনবার ফরমাইশ করিয়া শুনিল, তাঁর ছেলের কীর্তনের তারিফ্ করিল।

সাতকড়ি বলিল—গাঁয়ের সব ছেলেরা আমায় ধরেছে, তোমায় বলতে সাহস করে না, বাবাজী, এবার ওরা একটা শখের দল খুলেছে, তোমায় কিছু চাঁদা দিতে হবে।

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি লোক হাসিমুখে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া হাত তুলিয়া সকলকে নমস্কার করিল।

সাতকড়ি বলিলেন—এসো মাস্টার বসো। স্কুল ছেড়ে দিয়ে এলে? সুরেন বাবাজী, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, ইনি পাশের গাঁয়ে স্কুল খুলেছেন; খুব ভালো মাস্টার, নিভাননীকে ইনি একবেলা ইংরাজী পড়ান।

মাস্টার সুরেনের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরেনের মনে বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইল না। এমন তেল মাখিয়াছে যে কানের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ পানে লাল, বোকার মত হাসিটা। হাঁ, ইংরাজীর অধ্যাপক বটে! ভাবী পত্নীর ইংরাজী শিক্ষাটা হইতেছে ভালোই। মাস্টার জুটিয়াছে যখন এমন!

মাস্টার বসিয়া বক্‌বক্ করিতেছিল। নিজের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ কে ছাড়ে? কি করিয়া নিভাননীকে অক্ষর চিনাইল কি করিয়া এ-বি-সি লিখিতে শিখাইল সেই সব বলিল। মাস্টারের কথা শুনিয়া সুরেনের মনে হইল—ফার্স্টবুকের ঘোড়ার গল্প তার ইংরেজী-ভাষাজ্ঞান-রূপ সৌধের সর্বোচ্চ সীমা। অতএব ছাত্রীর বিদ্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কি করিবে সে! এই দূর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েকেই জীবনসঙ্গিনী করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেসের দেনা মিটাইতে না পারিলে আগামী মাসে ছাড়িতে হইবে—চারিধারে বন্ধুবান্ধব মহলে দেনা, দেনা। কলিকাতায় আর কতদিন টিকিয়া থাকা চলিবে?

ভাগ্যে, সে এই মেয়েটির বাপের এক বন্ধুর নিকট হইতে মেয়ের সন্ধান পাইয়াছিল। তিনিও তাহার মেসেই থাকেন। তাঁহার চিঠি লইয়াই সে এখানে আসিয়াছে মেয়ে দেখিতে। পাল্‌টি ঘর, দেখিতে সুশ্রী, কলেজে পড়াশুনা করিতেছে—ইহাদেরও আপত্তি হইবার কথা নয়।

কিন্তু একটা গোলমাল আছে।

সে-কথা এখনও পর্যন্ত সে কাহাকেও বলে নাই, কারণ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। সে অতি দরিদ্র, তাহার নিজেদের ঘর বাড়ি পর্যন্ত নাই, তাহার বাবা চিরকাল শ্বশুরালয়ে বাস করেন, সেকালের ঘর জামাই। ইঁহাদের কথাবার্তায় সে বুঝিতেছে, যে শিক্ষিত ও শহুরে পাত্রের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ে শহর-বাজারে বাসায় থাকিবে, গাড়ি-ঘোড়া চড়িবে, গহনা-গাঁটি পরিবে—ইহা মেয়ের দিদিমার একটা সাধ এবং সম্ভবতঃ মেয়েরও।

কিন্তু তাহার দ্বারা কোনো সাধই যে পূর্ণ হইবার নহে, সেই কথা খুলিয়া বলা হয় নাই। সে বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে কাপড়-জামা, চশমা ধার করিয়া আনিয়াছে বলিয়া

ও চেহারাটা সুশ্রী বলিয়া উহাদের পক্ষে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে সে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। ইহারা সন্ধান করিয়াও আসল ব্যাপার বাহির করতে পারিত না; কারণ তাহার মামারা সত্যই অবস্থাপন্ন। তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনের সে-বাড়িতে স্থান যে বাড়ির চাকর-বাকরের চেয়েও নিচু, তাহা ইহারা বাহির হইতে বুঝিতে পারিবে কি—বিশেষতঃ, এই ধরনের সরল প্রকৃতির লোক এরা!

নানা দিক ভাবিয়া সে এখানে আসিয়াছিল। মেসের ভদ্রলোকটির মুখে সে সবই শুনিয়াছে। মেয়ে-জামাই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দাঁড়াইবে, সত্য বটে। সে এখন নয়, বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে যদিও—তবুও সারাজীবনের অন্ন-সমস্যার মীমাংসা বিবাহের সঙ্গেই হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে যদি অবস্থা গোপন করিয়া বিষয়ের লোভে এখানে বিবাহ করে, যদি সে কাহাকেও কিছু না ভাঙে, হয়তো ইহারা কোনো অনুসন্ধান করিবে না তাহার বিষয়, হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কাজের পরিণাম ভালো নয়। ইহার পর স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল। নবীন পল্লীপ্রকৃতি একটি রহস্যাবৃত সৌন্দর্যের কুয়াশায় নিজেকে আবৃত করিয়াছে। সারা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না।

অত্যন্ত সহজেই এ বাড়ি এ গ্রামের মাঠ, বন তাহার আপনার হইতে পারে।

কি করিবে সে?...

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেদিন সকালে কৈলাস ভট্‌চায তাহাকে নিজের বাড়িতে যাইতে বলিয়াছিলেন—সুরেনের আপত্তি তিনি শুনিলেন না। বলিলেন—বাবাজী, ভারী তো খাওয়াবো, দুটো মাছের ঝোল ভাত—তার জন্যে কি তোমার ট্রেন ফেল্ করাবো আমি! সব সকাল সকাল হয়ে যাবে এখন। গাড়ি ধরিয়ে দেবার ভার আমার ওপর! তুমি এখন থেকে আপনার জন হতে চললে, দুটো না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?

খাওয়ার আয়োজন সকাল সকালই হইল। দুধ মাছ, দই সব চাটুয্যে-বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদেরই পুকুরে শেষরাত্রে মাছের জন্য জাল ফেলা হইয়াছিল। চাটুয্যে-গিন্নীও উপস্থিত ছিলেন, কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। ছেলেটিকে সত্যই তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। দেখিতে সুশ্রী, বুদ্ধিমান, অমায়িক—লেখাপড়া জানা তো বটেই। নিভাননীর অদৃষ্টে এখন এমন বর জুটিলে তো! তেমন কপাল কি সে করিয়াছে!

গরুর গাড়িতে উঠিবার সময়ে তিনি পথে খাইবার জন্য গাড়িতে ডাব, পেঁপে ও আম তুলিয়া দিলেন। বাড়ির একজন চাকর সুরেনকে জিনিসপত্র সমেত ট্রেনে তুলিয়া দিতে যাইবে, ঠিক হইল।

চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের হাতদুটি ধরিয়া বলিলেন—দাদাভাই, এ কাজ যাতে বোশেখ মাসের মধ্যে হয় তা তোমাকে করতেই হবে। নিভাননীকে তোমায় নিতেই হবে। দেখে শুনে তো সবই গেলে, তোমার বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিও, এসে মেয়ে আশীর্বাদ যেন করে যান। আমায় কথা দিয়ে যাও, যে এতে তোমার অমত নেই। গিয়েই পত্তর দিও দাদা...

সুরেন চলিয়া গেলে দিন কতক গ্রামে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিল, এক সাতকড়ি ছাড়া অন্য সবাই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করিয়াছে। কৈলাস ভট্‌চায তো সকলের কাছে তাহার শতমুখে প্রশংসা করিয়া বেড়াইলেন।

এক একদিন করিয়া সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল। সুরেনের কোনো পত্র বা সংবাদ কিছুই আসিল না। চাটুয্যে-গিন্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দিন বারো কাটিল। কোনো খবর নাই। চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের ঠিকানায় কৈলাস ভট্‌চাযকে দিয়া লিখাইয়া রেজেস্ট্রী পত্র দিলেন।

আরও দিন কাটিল, সে-পত্রের কোনো জবাব আসিল না।

চাটুয্যে-গিন্নী কৈলাস ভট্‌চাযের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। কৈলাসের নিজের বড় ছেলে রাম, পাশের গ্রামের নবীন কাপালির সঙ্গে দিনকতক ভাগে কাঁঠালের ব্যবসা করিয়াছিল ; রাম তিনেক কাঁঠালের চালান লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল ; সুতরাং তাহাকেই সুরেনের বাসার ঠিকানা দিয়া কলিকাতা পাঠান হইল।

তিন দিন পরে রাম ফিরিল। কলিকাতার মেসের সেই বাবুটি একখানা পত্র দিয়াছেন সেখানা সে বাবার হাতে দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কৈলাস পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন। সুরেন বাঁচিয়া নাই। এখান হইতে ফিরিয়া দিনকতক পরে সে নিজের দেশে অর্থাৎ মামার বাড়িতে যায় পিতার সঙ্গে সব কথা খুলিয়া বলিতে, সেখানে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছে।

সময় কহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। পরের শ্রাবণেই নিভাননীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পাড়ার বড় চণ্ডীমণ্ডপটাতে আবার বিস্তৃত বরাসন পাতা হইয়াছে। দুপুরের পর হইতে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা জড় হইয়া ভিড় করিতেছে। গ্রামসুদ্ধ সবারই আজ চাটুয্যে-বাড়ি নিমন্ত্রণ—সুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাড়াটুকু যে তাহা নয় ; শূদ্রভদ্র সবারই। কৈলাস ভট্‌চায ব্যস্ত আছেন ; কারণ চাটুয্যেদের পুকুরে সব ছোট মাছ বলিয়া মহিমপুরের নিকারীদের মাছের বায়না দেওয়া হইয়াছে, মাছ এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বৈকালে বরের দল আসিল। বরের বাড়ি এদিকেই, গোটাদুই স্টেশন পরেই। ইহাদের আনিতে বরের পাল্কী বাদে খান পাঁচছয় গরুর গাড়িও স্টেশনে গিয়াছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে বৃদ্ধের দলই বেশী, দুই একটি বালকও আছে।

মেয়েরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের ধারে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেটে হাঁড়ির ভিতর দৃষ্টি-প্রদীপ লইয়া কৈলাস ভট্‌চাযের স্ত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নী একটু পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বরের পাল্কী পাকুড়তলায় নামাইল।

বর পাল্কী হইতে বাহির হইল। বরকে এ-পর্যন্ত এখানকার কেহ দেখে নাই, বরের জ্যাঠামশাই আসিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া গিয়াছিলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, দোজপক্ষে বিবাহ করিতেছে, এবং খুব ফরসা না হইলেও কালো নয়, বেশ স্বাস্থ্য, মাথার সামনের দিকে একটা ছোট টাক।...

চাটুয্যে-গিন্নী অনেকক্ষণ হইতে একদৃষ্টে পাল্কীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। ঝি-বউরা উলু দিয়া কলরব করিয়া উঠিলে তাঁহার যেন চমক ভাঙিল। তিনি তো জানিতেন সুরেন আসিতেছে না, আসিতে পারে না—তবুও পাল্কী হইতে সুরেনের পরিবর্তে ইহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন কেন—কে জানে!

ভণ্ডুলমামার বাড়ি

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোল আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁত-গাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরীব ছাত্র হেড-মাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্ যা দিকি, একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম করে বলগে, দুটি গরম মুড়ি যেন ভেজে দ্যায়—এক্ষুনি...

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা...

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন! হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!...এখানকার লোক-জন দেখেচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখা-পড়া শেখায় এই জন্যে যে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভংকরীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে! কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই নে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি...

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনোও ভুলতে পারেননি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবন-ধারাকে অশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন? এখন নেই?

—সে কথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সংগে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শনুলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সংগে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম-কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্ছে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও-পাড়ার মধ্যে বাঁদিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হ'ল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যেই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় ভাঁট্‌শেওড়ার গাছ গজিয়েছে, চুণ-শুরকী মাখার ছোট খানাতে পর্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে।...ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্ছে না।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম, ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?...

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলে-বেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যে-বাড়ির ভাগ্নে, চাকরি-বাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর শুরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখা-শুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরীর স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোন ন্যায়সংগত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে,

বাড়ি গাঁথার জন্যে...না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুল-মামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেগমা-বেগমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস্ করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল? তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, শুনবি-নে তো আমায় রেহাই দে, —রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে——তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার!

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হ'ত সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুল-মামার সেই আধতৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়া বনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পেঁছিলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয় নি, বনে জঙ্গলে একেবারে ভর্তি, ইঁটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারে নি আর!

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্র-মাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগা-যোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজী করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কি রকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাট-ফর্মের কাঁকরের উপর পড়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পেঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারি নে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূরে গাঁথা

হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয় নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রী আসে নি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েছে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাল্গুনে ফুলের খই ফুটেছে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে...ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না—ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বলবে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক হয়েছে কবে আমি দেখি নি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানলায় এখনও কপাট বসানো হয় নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাসকতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেছে রত্নদত্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাই নে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধদিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে...বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েছে বলে মনে হয় না... একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্তি...

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এণ্ট্রান্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েছি।

বোধকরি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের জানলার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন,—এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর্।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের

বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলান্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদ্‌লে—তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরানো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েচে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুল-মামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কল্‌কাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড় ছেলেও এবারে ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস্ করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না?

ভণ্ডুলমামা বললেন, আন্‌ব, শিগগীরই আন্‌ব বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই...সেইজন্যেই তো খেয়ে না খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী আছে...তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও... এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি! এখনও বাকী! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে। এ তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চৌদ্দ পনেরো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেলবো। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন তো চৌদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে...যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে...শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন যেমন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে...ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বললেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমায় দেখলে খুশি হবে। সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি, অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি,—তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু

সিম আর বরবটি পাতা চিবিয়ে তো মানুষে...তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভন্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম এই যে মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বট অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকী। ভন্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয় নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে, এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভন্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আস্‌তে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আস্‌তে হয়, দেখাশুনো করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন।...পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল —সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে...সাম্‌নের বর্ষায়...ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায় পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম! তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাক্‌লে বাড়িখানা তে থাকবে না—আর এককাল না-এককালে ছেলেদের তো এসে বস্‌তেই হবে বাড়িতে। কল্‌কাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভন্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভন্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভন্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভন্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এই রকম ক'রে চেয়ে চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাই নে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু

একদিকের দোতলা-সমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরু-বাছুর কচুরীপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হতে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারি নি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা, এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!...শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখিন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের শতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত ; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি। আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় শখ হ'ল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে বলে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি...

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়-ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে

চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুল-মামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললেন—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন তাতে রাজী নন। বুদ্ধিশুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে—পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরী করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপর ভণ্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখি নি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করে নি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাই নি, হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখি নি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানালার কপাট নেই, থামে থামে কাঠথামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে!...

আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য যে. পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

সার্থকতা

সকাল বেলা। রূপগঞ্জের ভাঙ্গা কালীবাড়ির সামনে বাঁধানো বটতলায় নিয়মিত আড্ডা বসেছে। এখানে প্রথমেই বলা উচিত, রূপগঞ্জ কোনো ব্যবসার জায়গা নয়,—কোনো কালে ছিল যে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। রূপগঞ্জ নিতান্তই সাধারণ ছোট পাড়াগাঁ—দু'দশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ; এ ছাড়া কামার, জেলে ইত্যাদি অন্য জাত আছে। গঞ্জ থাকা তো

দূরের কথা, গ্রামে একখানা মাত্র মুদীখানার দোকান। কিন্তু লোকে বারোমাস ধার নিয়ে নিয়ে দোকানের অবস্থা এমন করে তুলেছে যে, দোকানের মালিক দোকান তুলে দিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—অথচ সে বেশ জানে এবং তার খরিদ্দাররাও জানে যে দোকান একবার উঠে গেলে বাকী বকেয়া আদায় হবার আর কোনো আশাই থাকবে না। রূপগঞ্জে সবাই গরীব, পরস্পরকে ঠকিয়ে কোনো রকমে তারা দিন কাটিয়ে চলেছে।

কালীবাড়ির বটতলায় বসে এই সব কথাই হচ্ছিল—রোজই হয়, আজ ত্রিশ বছর ধরে হয়ে আসছে। এর আগে কি হয়েছে না হয়েছে তার হিসেব নেই, কেননা সে-সব লোক এখন বেঁচে নেই। এ-গ্রামে খুব বুড়ো লোক বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করে ভদ্রলোকের মধ্যে। তার আগেই তাদের রূপগঞ্জের কালীবাড়ীর আড্ডার মায়া কাটাতে হয়, পৈতৃক আমন ধানের জমি ও আমবাগানের মায়া কাটাতে হয়। বিশ বছর ধরে গোপনে মনের কোণে পোষণকরা কাশীবাসের ইচ্ছাও পরিত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চু মুখুয্যে তাই দুঃখ করে বল্‌ছিলেনঃ কি জান হারাণ ভায়া! এই জায়গাজমি-গুলোই হয়েছে কাল—নইলে এ-গাঁয়ের মুখে ঝাঁটা মেরে কোন্‌দিন বেরুতাম। এই আমাদের দুঃখু! বিদেশে যারা বেরিয়েছে, তারা বেশ দু'পয়সা—এই ধরো না কেন, সরুলের দীনু ভট্‌চায্যির ছেলে—চেনো তাকে? আরে, অই যে রোগাপানা ছোক্‌রা, বোসেদের বাড়ি কালীপুজো দেখতে আস্‌তো—মনে নেই? সে লেখাপড়া তো শিখলে না, একবার তো ম্যালেরিয়ায় মর-মর হোল, তারপর তার মামারা তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। এখন বেশ সেরে উঠেছে, আর সে পিলেরোগা চেহারা নেই। সেদিন শুন্‌লাম রেলে চাক্‌রি পেয়েছে—পঁয়ত্রিশ টাকা করে মাইনে। থাকে অই মগরা লাইনে ওদিকে যেন কোথায়।... উপযুক্ত ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চু মুখুয্যে বর্ণনাটাকে বিশদ করে তুলতে পারলেন না।

হারাণ রায় বললেনঃ তোমার সেই চাকরির কি হোল, পঞ্চু ভায়া?

পঞ্চু মুখুয্যের বয়স পঞ্চাশের ওপর। জীবনে তিনি এ-জেলার গণ্ডী পার হন নি, কিন্তু উঠতি বয়েস থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বিদেশে কোথাও তিনি চাকরি পেলে করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে এ-আশা পূর্ণ হয় নি। গ্রামের সামান্য সম্পত্তির আয়েই সংসার চলে। যে-ভাবে চলে, তাকে চলা বলা যায় না—অন্য জায়গায় হোলে অচল হোতো, রূপগঞ্জ বলেই চল্‌ছে।

তিনি মধ্যে বোসেদের বাড়ি 'হিতবাদী' কাগজে দেখেছিলেন, কলকাতার কি একটা আপিসে ষাট টাকা মাইনের গুটি দুই তিন চাকির খালি আছে—কাজ জানার দরকার হবে না, তারাই শিখিয়ে নেবে। পঞ্চু মুখুয্যে একখানা দরখাস্ত করেছিলেন ; কাল বিকেলে তার উত্তর পেয়েছেন।

হারাণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চু সেই উত্তরের চিঠিখানা মলিন জীর্ণ কামিজের পকেট থেকে বার করে সলককে দেখিয়ে ম্লানমুখে বললেনঃ এই তো তারা চিঠি দিয়েছে—কালকে সরুলের হাটে পিওন বিলি কল্লে! কিন্তু পাঁচশো টাকা নগদ জামিন জমা চায়! কোথা থেকে দেবো নগদ পাঁচশো টাকা জমা? পাঁচটা টাকার সংস্থান নেই? নাঃ, ও-সব আমাদের জন্যে নয় হে—

মধু লাহিড়ী নিজের বাড়ি থেকে তামাক সেজে হুঁকো হাতে নিয়ে বটতলায় এসে পৌঁছলেন। সবাই জানে মধু লাহিড়ী সম্প্রতি কিছু টাকা হাতে পেয়েছেন-তার শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে, গত কার্তিক মাসে। এজন্য মধু লাহিড়ীর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়, মনে মনে সবাই তাকে হিংসে করে।

মধু বয়োজ্যেষ্ঠ হারাণ রায়ের হাতে হুঁকো দিয়ে বললেনঃ কাল রাত্রে এক কাণ্ড

হয়েছে আমার বাড়ি, জানো না বোধ হয়? রান্নাঘরের জানলার পাশে অনেক রাত্তিরে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল—রাম ছাদ থেকে দেখতে পায়। সে বাইরে এসেছিল, ছাদের নীচেই ওপাশে রান্নাঘর। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না রাত, দেখে যে কালোমত কে একজন জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে। সে ছেলেমানুষ, চেঁচিয়ে উঠতেই আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙেছে। আমারও ঘুম ভেঙেছে। সবাই ছাদে বার হয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই—কিন্তু রান্নাঘরের পেছনে সেওড়াগাছগুলোর মধ্যে যেন কি শব্দ হচ্ছে! সারা রাত জেগে কাটিয়েছি! গাঁয়ে বাস করা ভার হোল দেখছি!

মধু লাহিড়ীর এ-কথায় কেউ সন্তুষ্ট হোল না। কেউ কথাটা বিশ্বাসও করলে না। সবাই ভাবলে, হাতে টাকা হয়েছে, তাই লোককে জানানো যে আমার বাড়ি চোর যাতায়াত করে রাত্রে—এটা বড়মানুষী দেখানো একরকম।

হারাণ রায় মধুর হাত থেকে হুঁকো নিয়েছিলেন, তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে বললেনঃ তুমি আবার বাস করো বাঁশবাগানের মধ্যে। রাত-বেরাত খুব সাবধান থাকবে, কাল পড়েছে বড়ই খারাপ।

মধু লাহিড়ী বললেনঃ উঠে যাবো উঠে যাবো করি, কিন্তু উঠে যাই বা কোথায়? একবার তো ভেবেছিলাম, শ্বশুরবাড়ি বলাগড় গিয়ে বাস করি। কিন্তু সে বেজায় ম্যালেরিয়ার জায়গা—আমাদের এখানকার চেয়েও বেশী। তাই দাদা বারণ করলে, দুই ভায়ে যে ক'দিন বেঁচে থাকি, এক জায়গাতেই থাকি, পৈতৃক ভিটেটাতে আলো দিই দুজনে।

পঞ্চু মুখুয্যে বললেনঃ না উঠে যাবে কেন? সবাই যদি উঠে যাবে, গাঁয়ে তবে থাক্‌বে কে? তোমাদের বাড়ির পাশে শ্যামাপদ চাটুয্যেদের ভিটে এখনও পড়ে আছে—তোমরা দেখো নি, আমাদের একটু একটু মনে আছে, শ্যামাপদ চাটুয্যে এখানেই মারা যায়। তার স্ত্রী এখানকার সম্পত্তি বেচে কিনে বাপের বাড়ি চলে গেল, ছ'মাসের ছেলে নিয়ে। অবস্থা ভাল ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল ওই ঘাটের ধারের আমবাগানখানা—এখন মাখন কাকা কিনেচেন। আর কিছু ধানের জমি, তাতে বছর চল্‌তো না। একশো টাকায় সম্পত্তি বিক্রী করে ফেল্লে, রাজকৃষ্ট জ্যাঠা কিন্‌লেন আমার বেশ মনে আছে। তারপর এখন আমার মাখন কাকা নিয়েচেন রাজকৃষ্ট জ্যাঠার ছেলের কাছ থেকে। তবে ফাঁকি দিয়ে কেনা সম্পত্তি, ওর অপবাদ আছে, ও ভোগে আসে না।

হারাণ রায় এখানে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনি বল্লেনঃ অনেকদিন পরে শ্যামাপদর মথাটা উঠ্‌লো। শ্যামাপদদা আমাদের চেয়ে দশ পনেরো বছরের বড় ছিল! তা'হোলেও একসঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে গিয়েছে খাঁদের পুকুরে। আহা, অল্প বয়সে মরে গেল। হ্যাঁ হে, তার সে ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা জানো? তার অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেচি, বেশ মনে আছে। ছেলেটার মুখে ভাত দেওয়ার মাস দুই পরেই শ্যামাপদদা মলো। আহা সে সব কি আজকের কথা!

পঞ্চু বল্লেনঃ না। তাদের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি অনেককাল।

মধু লাহিড়ী বল্লেনঃ কি জানো, একবার এ গাঁ থেকে বেরুলে আর কি কেউ ফিরতে চায়? এই আমাদেরই যদি অন্য উপায় থাকতো, তবে কি আর এখানে পড়ে থাকতে যেতুম। এই যে আমার বাড়ি কাল রাত্তিতে কাণ্ডটি হয়ে গেল।—মধু লাহিড়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পঞ্চু অসহিষ্ণুভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মোড়ে হঠাৎ মোটর গাড়ির হর্ণের আওয়াজে তিনি এবং উপস্থিত সবাই সেদিকে চেয়ে রইলেন। এবং চেয়ে থাকতে থাকতেই প্রকাণ্ড একখানা নতুন মোটর বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটর গাড়ি যে এ-গ্রামে আসে না তা নয়, তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্টেশন থেকে মাকে

মাঝে গ্রামের কোনো নতুন জামাই শখ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেচে, শক্ত অসুখে পড়লে কেউ মহকুমা থেকে ডাক্তার অনেকবার এসেচে নিজের মোটরে—কিন্তু এ-ধরণের বড় ও সুন্দর মোটর গাড়ি উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেউ দেখে নি। লম্বা ধরণের প্রকাণ্ড গাড়ি, পালিশ-করা নিকেলের পাতের বনেট, দোরের হাতল ল্যাম্প—সবই ঝক্‌ঝকে; তবে গাড়ির পেছনে ও মাড্‌-গার্ডে রাঙা ধুলো জমেছে—যেন অনেক দূর থেকে আসচে।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক গাড়ি চালাচ্ছিল—দোহারা গড়ন, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় একমাথা ধুলো। সে নেমে বটতলার দিকে এগিয়ে এল—এবং অল্পক্ষণ উপস্থিত সবারই মুখের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে কি যেন চেনবার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ পঞ্চুর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লেঃ এই যে কাকা! আমায় চিনতে পারচেন না?

হারাণ রায়ের দিকে চেয়েও বল্লেঃ কাকা, আমায় মনে নেই আপনার? আমি ননী, আমার পিতার নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের পাড়াতেই—

হারাণ রায় বিস্ময়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চুও তাই। দু'জনেই সমস্বরে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, যেন অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেনঃ রাজেনদা'র ছেলে সেই ননী!

এর বেশী কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বের হোল না। ইতিমধ্যে ননী উপস্থিত সকলেরই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারাণ রায় নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বাঁধানো বেদীর এক অংশে তাকে হাত ধরে বসালেন। নানা সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান চলতে লাগল।

হাঁ, রাজেন বাঁড়ুয্যেকে কার মনে নেই? বেশীদিনের কথা তো নয়, বড় জোর কুড়ি বছর আগে রাজেন মারা যায়। রাজেনের ছেলে এই ননী তখন দশ-বারো বছরের ছেলে। এই মাঠে কালী তলায় লাফিয়ে খেলা করে বেড়াতো—সবাই দেখেচে। রাজেন বাঁড়ুয্যে মহকুমার রেজেস্ট্রি অফিসে দলিল-লেখক ছিল। সেখানে শশী উকিলের বাসায় থাকতো। সপ্তাহের শেষে শনিবার সন্ধ্যার সময় পিঠে এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে, এক পা ধুলো নিয়ে বাড়ি আসতো—আবার সোমবার ভোর বেলা মহকুমায় ফিরতো। বিশ বছর আগে রাজেন বাঁড়ুয্যের লাঠির আগায় কেম্বিসের ব্যাগ-ঝুলানো মূর্তি গ্রামের পথে-ঘাটে অতি সুপরিচিত ছিল। একদিন হঠাৎ খবর এল, কলেরা হয়ে রাজেন শশী উকিলের বাসাতেই মারা গিয়েচে। ননীর মা তার পরও বছর দুই এ গাঁয়ে ছিল, কিন্তু শেষকালে চলাচল্‌তির কোন উপায় না দেখে এখান থেকে চন্দননগরে ভগ্নিপতির ওখানে চলে যায়। তারপর আর কোন খবর কেউ রাখে না তাদের।

সেই ননী আজ এতকাল পরে ফিরে এল নতুন মোটরে চড়ে!

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে সবাই দেখলেন, গাড়ির পেছনের সিটে একটি মহিলা ও দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হারাণ বল্লেনঃ সঙ্গে কে ননী?...বৌমা আছে? ছি ছি, কি ছেলেমানুষ! এসো, এসো, নামিয়ে নিয়ে এসো? এই রদ্দুরে কিনা—এই কাছেই তোমার গরীব কাকার বাড়ি, এসো বৌমাকে আমার নিয়ে এসো। পঞ্চু। উত্তেজিত ভাবে বললেনঃ তা কি কখনো হয়? আমার সঙ্গেই বাবাজীর প্রথমে কথা হোল—আমার বাড়িতেই এ বেলাটা অন্ততঃ—

শেষে হারাণ রায়ই জয়ী হয়ে বিজয়গর্বে উৎফুল্লমুখে ননী ও তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাণ রায়ের বাড়িতে রথ-যাত্রার ভিড় শুরু হোল। ননীর স্ত্রী বেশ সুন্দরী, একটু মোটাসোটা, কথাবার্তায় খুব

অমায়িক, বড়মানুষী চালচলন একেবারে নেই। ননীকে ছেলেবেলায় দেখেছে, এমন অনেক লোকই গাঁয়ে আছে—সবাই বলাবলি করতে লাগলোঃ একেই বলে অদৃষ্ট! ওর মা ওর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, আর আজ দ্যাখো কান্ড! ভগবান যাকে যখন দ্যান—ইত্যাদি।

পশু বললেনঃ আহা, সকাল বেলাতেই তো বলেছিলাম, এ গাঁ ছেড়ে যে বাইরে পা দিয়েচে সে-ই উন্নতি করেচে—কেউ বেশী, কেউ কম। আজ যদি আমি গাঁয়ে বসে থেকে নিজেকে মাটি না করি, তবে আমার কি এ-দশা হয়? না—এবার বেরুতে হবে। দেখি একবার ননী বাবাজীকেই বলে দেখি, যদি কিছু যোগাড়-টোগাড় করে দিতে পারে।

ননীর অবস্থা পরিবর্তনে গ্রামের কেউই অসুখী নয়, বরং সকলেই আনন্দিত। কারণ ননীর সঙ্গে এ গ্রামের কারো স্বার্থের সংঘাত নেই, ননী এখানে বাসও করে না—তা ছাড়া সবাই ননীকে শেষবার যখন দেখেচে তখন ননী ছিল ছোট ছেলে—তার সম্পর্কে কোনো হিংসাদ্বেষের স্মৃতি কারো মনে গড়ে ওঠে নি—ছোট ছেলের ওপর স্নেহের স্মৃতি ছাড়া।

বিকেলে বাঁধানো বটতলায় প্রকান্ড মজলিস বসেচে—মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে ননী—তাকে গোলাকারে ঘিরে গাঁয়ের বালক, বৃদ্ধ ও যুবার দল। কি ক'রে সে বড়লোক হোল, এ কথা সবাই শুনতে চায়।

শ্রীপতি কর্মকার ওপাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তামাকের ব্যবসা করে তিনি হাতে দু'পয়সা জমিয়েচেন সবাই বলে, যদিও শ্রীপতি তা স্বীকার করেন না। শ্রীপতির সঙ্গে ননীর বাবা রাজেন বাঁড়ুয্যের খুব বন্ধুত্ব ছিল, ননীর আসবার খবর পেয়ে তিনি পায়ের বাত সত্ত্বেও ওপাড়া থেকে এসেচেন দেখা করতে। শ্রীপতি জিগ্যেস করলেন—তা বাবাজির এখন থাকা হয় কি কলকাতাতেই?

—আঁজ্ঞে না, আমি থাকি হোসঙ্গাবাদ, নর্মদার ধারে, সি. পি.—সেখানেই আমার কাঠের গোলা আর আপিস। কলকাতাতে এসেছিলাম—একটু কাজও ছিল, আর একখানা মোটর কিনবো বলে। কাল তাই ভাবলাম গাড়িখানা তো কেনা হোল, একবার এতে করে গিয়ে পৈতৃক ভিটেটা দেখে আসি।

বলা বাহুল্য ননী কোথায় থাকে সে কথা কেউ বুঝতে পারলেন না, নর্মদা নামে একটা নদীর কথা অনেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যে পড়েচেন—কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এদের ধারণা—কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রভাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে দৃশ্যমান দূরের তীররেখার চেয়ে স্পষ্টতর নয়। পশু মুখুয্যে একটা সোজা প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন—বিয়ে করেচ কোথায় বাবাজী?

—ওই হোসঙ্গাবাদেই, আমার শ্বশুর ওখানকার ডাক্তার। বহুদিন সেখানে বাস করচেন, তবে কলকাতায় সব আত্মীয়স্বজন আছে তাঁদের।

দেখতে দেখতে দুদিন কেটে গেল। এক বেলা থাকবার জন্যে ননী এসেছিল এখানে .....কিন্তু শৈশবের শত স্মৃতি-মাখানো গ্রামকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে তার সাধ্যে কুলিয়ে উঠল না। ননীর এক ছোট ভাই ছিল বোবা ও কালা, তিন বছর বয়সে বর্ষার সময় ননীদের বাড়ির পেছনে ডোবার জলে ডুবে মারা গিয়েছিল ; মৃতদেহ যখন ভেসে উঠেছিল তখন জানা যায়, তার আগে হারিয়ে গিয়েচে বলে এপাড়া-ওপাড়া খোঁজ হচ্ছিল।

সেই ডোবাটি তেমনি আছে। এ-সব পাড়াগাঁয়ে কোনো কিছু হঠাৎ বদলায় না, হয়তো আরও বিশ বছর ডোবাটা থাকবে, হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর থাকবে। ননীর বয়েস তখন ছ'বছর, কিন্তু সে বর্ষাদিনের কথা আজও তার বেশ মনে আছে—কখনও কি ভুলবে? ওপারের ওই ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীর বাবা, এপারে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। হোসঙ্গাবাদে তার কিসের বাঁধন আছে? কিছুই না—সে

দু'দিনের বাঁধন। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক গভীর ; এতদিন আসে নি, তাই ভুলে ছিল। আজ সেই তিন বছরের অবোধ বোবা কালা ছোট ভাইয়ের করুণ মুখখানি তার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটলো—সে কি ভাবে তার দিকে চাইতো, তার সে বুদ্ধিহীন দৃষ্টি, নাকের সেই তিলটি—আশ্চর্য মানুষের এতও মনে থাকে!

সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্তে একটা ম্যাপের মত চোখের সামনে পড়ে আছে দেখতে পেলে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ—তার মনে হোল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি? তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুনভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন সে ভুলে আছে আজ মনে হচ্চে তা ভেতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়। জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতা বিহীন একটা পথে চলে এসেচে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারে নি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটা তার গভীরতা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশ কখনো তো হয় নি!

যে-পথ দিয়ে নেমে গেলে সরোবরের গভীর অন্ধকারতলে লুকানো মায়াপুরীর সন্ধান মেলে—তার সোপাণশ্রেণী অস্পষ্ট নজরে পড়েচে, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে, এমন অসময়ে নজরে পড়লেই কি, বা না পড়লেই কি?

তাকে ফিরে যেতে হবে। কাঠের হিসাব করতে হবে, ফরেস্ট অফিসারদের সাথে দেখা করে নতুন জঙ্গল ইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবসাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা পেতে হবে, ব্যাঙ্কে জমানো টাকার অঙ্ককে বাড়াতে হবে। আরও কত শত দরকারী কাজ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে হোসঙ্গাবাদের কাঠের গোলায়।

এখন নতুন পথ ধরে চলবার মত সময়ও নেই, বয়সও নেই। সাফল্যের আলোয় তাকে ব্যর্থতার যে-পথে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেচে—সেই পথই তার পথ।

তবুও এই দিনটি সে ভুলবে না। এই ম্লান মেঘলা দুপুরের আলো, এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পানা-শেওলা-ভরা ডোবা, এই আশ্চর্য অদ্ভুত জীবনমুহূর্তটি স্বপ্নের মত মনে আসবে বহুদূর উত্তরকালের মানসপটে।

সকলের প্রশংসাবাদের মধ্যে ননী একদিন গ্রামের বারোয়ারী ফণ্ডে শ'দুই টাকা দিল। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করে হারাণ রায়ের বাড়ীতে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করলে। একটি অনাথা বিধবাকে মাসিক কিছু সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। এক সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল। ননীর স্ত্রী আর থাকতে চায় না ; ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ হবে—তা ছাড়া হারাণ রায়ের বাড়িতে তেমন ঘরদোর নেই, থাকবারও কষ্ট।

নতুন মোটরগাড়ি চালিয়ে হারাণ রায়ের বাড়িসুদ্ধ সকলের এবং পাড়ার সবারই চোখের জলের মধ্যে ননী গ্রাম থেকে বিদায় নিলে।

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেনঃ একেই বলে ছেলে! বিদেশে না বেরুলে কি পয়সা হয় বাপু? দেখে নিলে তো চোখের ওপর? তা তোমাদের বলি, তোমরা তো শুনবে না? গাঁয়ে কারুর কিছু নেই, তাই মধু লাহিড়ী মুখের সামনে বড়মানুষী চালে কথা বলে পার পায়। দেখি এবার বেরিয়ে একটা কিছু যদি—

খবরের কাগজের অফিসে সন্ধ্যার পর আড্ডা চলছিল। 'তরুণ' শব্দটার ওপর ভয়ানক জোর দিয়ে কথা বলা তখন দিনকতক খুব চলেছিল—সেই সময়কার ব্যাপার। তরুণ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, তারুণ্য, তরুণ দৃষ্টিভঙ্গি, তরুণ সমিতি, তরুণের অভিযান, তরুণের জয়যাত্রা—মাসিক পত্রিকা ও কথাসাহিত্য তখন তরুণ-বায়ুগ্রস্ত! ওদিকে পরশুরাম তখন 'কচি সংসদ' গল্প লিখলেন তা নিয়ে দুটো দলের সৃষ্টি হোল, একজন বললে—আঃ, কি ঠোকাই ঠুকেচে! আর একজন বললে—যাদের নিজেদের জীবনের পুঁজি বহুকাল ফুরিয়েচে, যাদের প্রাণের ভারে মরচে ধরেচে, তারা তরুণের মনকে বুঝবে কেমন করে? সমস্ত মহী গ্রাস করতে ছুটেছে তরুণের জয়রথ-চক্র, তার উদ্দাম, অশান্ত বেগের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ধরে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার স্পর্ধা রাখে কোন ওল্ড ফসিল?...ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের ওপর শেষের দলটাই বেশী পুষ্ট—তরুণের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছিল চেয়ে দেখলুম তারা সকলেই মধ্যবয়সী, অপর পক্ষে তরুণ ও প্রৌঢ় দু-ই আছে—এবং স্বয়ং সম্পাদক যিনি, ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন তরুণের সপক্ষে।

কাগজের অফিস থেকে বার হয়ে এসে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই তরুণেরাই জয়ী—কিন্তু সে বয়সটাকে বহুকাল হারিয়েচি। মাথার চুল ছ'আনা আন্দাজ পাকা, পরিচিত ছোক্‌রার দল সামনে বিড়ি-সিগারেট খায় না, হঠাৎ সামনা-সামনি হয়ে গেলে বিড়ি মুখে থাকলে তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়। সমীহ করে কথা বলে—আর বয়োবৃদ্ধ লোকের পরিচয় দিতে গেলেই বলে,—"আজ্ঞে তাঁর বয়েস হয়েচে, এই প্রায় আপনার বয়েসী হবেন।" তা সে কে জানে চল্লিশ—কে জানে পঞ্চাশ—আমার বয়েসী, তাও 'প্রায়'—অর্থাৎ আমিই বড়। কারণ কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ বয়সের ছোক্‌রারা চল্লিশে আর পঞ্চাশে বিশেষ কোনো তফাৎ দেখে না। এদিকে বাড়িতেও বড় সংসার, সেখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখে 'বাবা' 'বাবা' অনবরত শুনতে শুনতে মনটাও অনেকটা গম্ভীর প্রবীণত্বের দিকে ঝুঁকে চলেচে বৈকি। ছোট মেয়েটা কাছে এলেই বলে—বাবা তোমার পাকা চুল তুলে দেবো?

নাঃ, মনটা খারাপ হবারই কথা বটে। রাত ক্রমে বেশী হলো, পার্কের মধ্যে কুলপীবরফওয়ালা হেঁকে যাচ্চে, মোড়ের মাথায় বেলফুলের মালা বিক্রী হচ্চে, রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমে কমে আসচে। জ্যোৎস্নারাত, চাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলচে।

কত বছর বয়সের মানুষকে ঠিক তরুণ বলা চলে? উনিশ থেকে বত্রিশ, না আঠারো থেকে আটাশ, না কুড়ি থেকে পঁচিশ? এ-বয়েস একদিন আমারও ছিল—ওর চেয়েও কম ছিল। কিন্তু তখন কেউ বলে দেয় নি যে আমি তরুণ বা তার জন্যে একটা কিছু হয়েচে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার উল্টোটাই শুনে এসেচি চিরকাল। কখনও বুঝতে পারি নি যে আমার বয়স অল্প।

সেই কথাটাই আজ রাত্রে আমার বেশী করে মনে এল।

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুব রোগা শীর্ণ—অসুখে ভুগতাম বছরে ন'মাস। হাতে তাবিজ-কবচ, গলায় আমড়ার আঁটি, কোমরের ঘুন্‌সিতে বাদুড় নখ—সমস্ত দেহে নানা ধরনের বাধা ও গণ্ডী—মৃত্যু যাতে হঠাৎ ডিঙ্গিয়ে এসে আমাকে নিয়ে না পালায়।

এই কারণে ইস্কুলে ভর্তি হতে হয়ে গেল দেরি। যে ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হলুম, সে ক্লাসের মধ্যে আমিই বড়। সকলে আমাকে ডাকতে লাগল—'কানু-দা' বলে। কিন্তু প্রথমে

ততটা বুঝতে পারি নি যে আমার বয়েসটা এমন বেখাপ্পা গোছের বেশী। একদিন হোল কি, তখন মাস দুই ভর্তি হয়েচি, মামার বাড়ি যাওয়াতে দিন তিনেক ইস্কুল কামাই হোল—তারপর যেদিন ইস্কুলে গেলাম, ফণিমাস্টারের ক্লাসের পড়া হোল না। ফণিমাষ্টার আমার চুল ধরে টেনে বল্লে—বুড়োধাড়ী কোথাকার, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেচে—আবার ইস্কুল কামাই করে! ছেলেরা অনেকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল আমার দুর্দশায় খুশি হয়ে। বাবার আপিসের পেন্সিলের ও 'পেন্সিল-ঘষা' রবারের প্রত্যাশা রাখ্‌তো যে সব ছেলে, তারাই চুপ করে রইল। এই আমি প্রথম জানলুম যে আমার বয়স বেশী। এর আগে কেউ আমাকে এ-কথা বলে নি। বাড়িতে দিদি ছিলেন আমার চেয়ে বড়। মা বাবা এদের মুখে কখনও আমার বয়েস সম্বন্ধে শ্লেষ-সূচক কোনো কথা শুনি নি। কিন্তু আজ থেকে আমার ধারণা বদলে গেল—তখন বুঝলাম কেন ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'কানুদা' বলে ডাকে। এবং এই দিনটি থেকে ক্লাসের পড়া না বলতে পারার অক্ষমতার চেয়েও আমার বয়সের লজ্জায় সব সময় সংকুচিত হয়ে থাকতুম। ফণিমাস্টারও কি প্রতিবারই প্রতি পদে পদেই আমার সে গোপন লজ্জা, যা আমি লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ করি, —তা-ই ঢাক পিটিয়ে সকলের সামনে প্রচার করবে আর আমার সে অত্যন্ত নিভৃত গোপন ব্যথার স্থানে কারণে অকারণে আঘাত করবে নির্মম ভাবে? এদিকে বয়সের তুলনায় আমি একটু লম্বা ছিলাম। একদিন গ্রামারের কি ভুল বার হোতেই ফণিমাস্টার বল্লে—না, এ ধাড়ী ছোঁড়াটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখ্‌চি। বলি গোঁপ-দাড়ি যে লতিয়ে চললো, এখনও নাউনের পার্সিং শিখলে না? আমার চোখে লজ্জায়, অপমানে জল এল। আমার মনে হোল বাস্তবিকই আমার বয়েস বেশী তাতে নীচের ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়া আমার পক্ষে লজ্জাকর কথা—প্রতিদিন ওদের চোখের সাম্‌নে আমি এরকমভাবে বকুনি খেতে আর পারি নে, বিশেষ করে ওই ছোট ছোট ছেলেরা—যারা আমায় দাদা বলে ডাকে, তাদের সাম্‌নেই আমার এ অপমানের লজ্জা অসহ্য।

বাড়ি গিয়ে মাকে লাজুক মুখে বললুম—আমি আর স্কুলে পড়বো না মা! আমার ক্লাসের ছেলেরা ছোট ছোট, আমার লজ্জা করে ওদের সঙ্গে পড়তে।

মা অবাক হয়ে বললেন—কেন রে তোর বয়স কত হয়েছে?

—তুমিই বল না কত হয়েচে?

—এই তেরোয় পড়্‌বি আষাঢ় মাসে—বারো বছন ন' মাস চল্‌চে—

—ও বয়সে কেউ বুঝি সিক্‌সথ্ ক্লাসে পড়ে?

—না, তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েচো—তোমার দাঁত পড়ে গিয়েচে, চুল পেকে গিয়েচে—তুমি কি আর সিক্‌সথ্ ক্লাসে পড়তে পার? পাগ্‌লা একটা কোথাকার—

মায়ের কথায় আমার মনের সন্দেহ দূর হোল না। নিজের ছেলেকে কেউ বড় দেখে না—ওঁরাই আমায় ছোট বলেন, কই আর তো কেউ বলে না? হায় আমার সে তেরো বছর বয়েসের শৈশব! এখন সেই কথা ভাবি।

বয়েস আর কম্‌লো না—বেড়েই উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বাকী ক'বছরের মধ্যে আমার চেয়ে বড় কোনো ছেলে এসে ভর্তি হোল না আমার ক্লাসে, আমিই সকলের 'দাদা' রয়ে গেলুম। এর পরে ক্লাসে আমি পড়াশুনোতে খুব ভাল হয়ে ফার্স্ট, সেকেণ্ড হয়ে উঠ্‌তাম —কিন্তু তাতে আমার গৌরব বাড়লো না। আমি সকলের চেয়ে বয়েসে বড়, আমি পড়াশুনোতে ভালো করবো, এতে বাহাদুরিটা কি?

এই সময় আবার আমার গোঁপ বেরুল একটু একটু—সেই 'ড্রেডেড্' গোঁপ যার কথায় চিরকাল খোঁটা খেয়ে আস্‌চি—যখন সত্য সত্যই সেটা বেরুলো—তখন মরীয়া হয়ে সহ্য করলুম। প্রথম বড় লজ্জা হোত—শেষে সয়ে গেল।

একবার আমাদের ওখানে রামেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়িতে তার ভাগ্নে এল—তার নাম প্রসাদ, কলকাতায় কলেজে বি. এ. পড়ে। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে—হঠাৎ কথায় কথায় একদিন সে তার বয়েস বল্লে উনিশ বছর, আমি মনে হিসেব করে দেখলুম আমারও এই বয়েস—অথচ আমি এবার ম্যাট্রিক দেবো—আর ও পড়ে বি. এ. থার্ড ইয়ার ক্লাসে। ক্লাসের সবাই ঠিক বলে, আমার বয়েস বেশী আমি যে পড়াশুনোতে ভাল করবো এ আর বিচিত্র কি?

ম্যাট্রিক দেবার সময় হেড্ মাস্টারের কাছে ফর্ম লিখবার সময় অন্য সব ছেলে লিখলে, ষোল, সতেরো। ধীরেন বলে একটা ছেলে ষোলর চেয়েও কম বলে তাকে হেড্ মাস্টার পরীক্ষা দিতেই দিলেন না—আর আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে, কান লাল করে বয়েসের জায়গায় লিখ্লুম—উনিশ বছর ক'মাস। এমন বিড়ম্বনাতেও মানুষে পড়ে?

এই সময় আমি আর এক দুর্ভাবনায় পড়ে গেলুম। অনেক দিন আগে আমার আট-ন' বছর বয়েসের আমার মামা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তাঁর গোঁপ বেরিয়েছিল, খুব লম্বা-চওড়া—তাকে আমার খুব বড় বলেই মনে হোত—আমি তার বুকে হেলান দিয়ে বসতাম সে সময়—আমাকে কাঁধে পিঠে করে নিয়েও কত খেলা করেচেন। তখন শুনেছিলাম মা'র মুখে যে মামার বয়েস বাইশ বছর। উঃ সে কত বয়েস; তার ওদিকে তখন ভাব্তেই পারতুম না, আমার শৈশব মনের জগতের অনন্ত কালসমুদ্রে 'বাইশ বছর' বলে একটা পরিচিত, একটা সুদূর দ্বীপ—আমার বয়োবৃদ্ধ মামা ছিলেন সেই দ্বীপের অধিবাসী—তার ওদিকে কি আছে আমি জানতাম না, ভাবতেও চেষ্টা করি নি তখন; সেই থেকে বাইশ বছরের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল যে—যার বাইশ বছর, তার জীবন ফুরিয়ে এল।

এই ম্যাট্রিক দেবার বছরে আমার হঠাৎ মনে হোল, আমার বয়েস কুড়িতে পড়বার আর দেরি নেই—এবং সেই ভীষণ বাইশ বছরে আসবার দেরি মাত্র দু'টি বছর! আরও মুশকিল বাধ্ল এই যে—এতদিন ছিল গোঁপ, এইবার আমার এমন অবস্থাতে এসে পেঁছতে হোল যে দাড়ি না কামালে আর চলে না। গোঁপ ও দাড়ি দুই-ই হোল। গোঁপ-দাড়ি এবং কুড়ি বছরে পা দেবার দেরি মাস কতক মোটে—তার পরে বছর দুই পরেই বাইশ বছর।

কিন্তু তখনকার দু'বছর অনকে সময়—আজকালকার মত নয়। মন ছিল চিন্তাশূন্য, স্ফূর্তিবাজ, কৌতুকপ্রিয়,—দু'বছর আসতে দেরি হয়ে গেল। এল বাইশ বছর···চলেও গেল।

তখন যদি কেউ বলতোও যে আমার বয়েস কম, বাইশ বছর আর এমন কি বয়েস—তাহোলেও হয়তো তার কথা আমার বিশ্বাস হোত না, যেমন বারো বছর বয়েসে বিশ্বাস করি নি মায়ের কথা যে আমি ছোট—কিন্তু আসলে সে-কথা আমাকে কেউ বলেও নি।

বরং আরো একটা ঘটনায় উল্টো কথাটাই একবার শুনলুম! তেইশ বছর বয়েসে আমার বিবাহের জন্য কোথা থেকে একটা সম্বন্ধ এল—আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়চি। ঘটক আমাকে দেখে বল্লে—ছেলের বয়েস একটু বেশী না?

বাবা সামনে বসে। বল্লেন, কোথায়, এই তো মোটে তেইশ—

আমি ভাবলুম বেশ তো? বাবা ওরকম কথা কেন বল্লেন? ছিঃ, ওরা কি মনে ভাবলে? মোটে তেইশ মানে কি? সেই থেকে আমার বিশ্বাস হোল যে বিবাহ করবারও আমার বয়েস আর নেই। ঘটক নিশ্চয় আমার লম্বা-চওড়া মূর্তি দেখে আমার বয়েস বেশী আন্দাজ করেছিল—তেইশ বছরের অনুপাতে আমার চেহারা বড় ছিল। কিন্তু আমার সেই থেকে বিশ্বাস দাঁড়ালো অন্যরকম।

চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ·····

ত্রিশ বৎসর বয়সে যেদিন পড়লাম, সেদিন থেকে মনে হোল এখন থেকে গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে হবে, সাদা রং ছাড়া অন্য রঙের জামা পরা তো অনেকদিনই ছেড়েছিলুম, এখন থেকে ছোট বড় চুল ছাঁটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলুম। তখন থাকতুম, পাড়াগাঁয়ে, সেখানে কেউ কোন দিন একথা বলে নি যে আমার বয়েস খুব বেশী এমন কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, ত্রিশের পরেই বৃদ্ধত্বে পৌঁছোয়, মনে তো বটেই, চেহারাতেও খানিকটা বটে।

কারণ আমাদের মুখশ্রীকে আমরা অহরহ গড়চি, আমাদের ভাব ও চিন্তার দ্বারা, যেমন ভাস্কর বাটালি দিয়ে মূর্তির মুখ গড়ে। এদের প্রভাব আমাদের মুখশ্রীর ওপরে অনেক বেশী, অন্তরের তারুণ্য মুখশ্রীতে তো বটেই, সারাদেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপর। বাল্যের কত সুন্দর-মুখ ছেলেকে যৌবনে হতশ্রী, হীনশ্রী হতে দেখেছি, শিক্ষার ও কালচারের অভাবে। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের দেখেছি, বিধাতা যেন তাদের দেহ ও মুখশ্রীকে এমন কি চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ভেঙে গড়ছেন।

এ সব অবান্তর কথা যাক্।

তারপর আজ এতকাল পরে যখন পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস চল্‌চে, কাগজে-পত্রে লোকের মুখে শুনি কুড়ি বছর বয়েস থেকে তরুণ বয়েসের নাকি শুরু—মোটের ওপর বাইশ বছরটা যে নিতান্ত তরুণ বয়েস, এতকাল পরে তা' বুঝছি খুব ভাল করেই। কারণ আমার বড় ছেলেরই প্রায় হতে চলেচে ওই।

কিন্তু শুন্‌লাম কখন, যখন বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ মর্ত্যধামে ফিরে এলেও আর আমাদের তরুণ বলতে সাহস করবেন না, স্নেহপরবশ হয়েও নয়। লোক-লজ্জার ভয় একটা আছে তো?

হায় রে ,আমার বাইশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তুমি যখন এসেছিলে, তখন তোমায় চিনি নি, তারপর পৃথিবী নিজের কক্ষপথে বহুদূরে চলে গিয়েচে সে দিনটির পরে, আজ আর তোমার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কি? কিন্তু মুশকিল এই যে তখন একথা বললেও বিশ্বাস করতুম না। একটা কথা মনে এল। চব্বিশ বছর বয়সে একবার টুর্গেনেভের কোন একখানা বইয়ে পড়ি যে ভালবাসা, প্রেম, রোমান্স সব তরুণদের জন্যে। যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওসবের দিন শেষ হোল। কথাটা পড়ে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল—এই জন্যে যে আমার আর সেদিন নেই—বাইশ বছরের গণ্ডি অনেক দিন ছাড়িয়েচি, যৌবন কতকাল শেষ হয়ে গিয়েচে।

তাই বলচি—যদি কেউ একথা বলতো তখন যে বাইশ বৎসরে তরুণ বয়সের অবসান নয়, সবে শুরু—একথা আমি বিশ্বাস করতুম না নিশ্চয়।

মা তো বারো বছর বয়সে বলেছিলেন আমি ছেলেমানুষ, সে তো নিতান্ত বাল্যকাল, মায়ের কথা কি বিশ্বাস করেছিলাম?

ডানপিটে

যে সময়ে আমাদের গল্পের শুরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট লচ্ছাদার রাবড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

বাংলা ১২৮৭-৮৮ সালের কথা।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, শহরের বসতি আরও ঘিঞ্জি ছিল, তেলের

আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল শহরের অবস্থা, গাড়ি-ঘোড়া ছিল কম। বুড়ুয়া-মঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নূতন ধরনের ভিকটোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। এক্কা ও স্প্রিংবিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, শহরের বাহিরে উটের গাড়ি চলিত।

গণেশ মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্তীর খুব নাম ও প্রসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট্ বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়িটা ছিল একটা হোটেলখানা। চাকুরী-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়স্বজন ও স্ব-গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়িতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাইবার নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ি ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের বিদ্যার্জনস্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হয়তো শহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ি ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরো দিন এইরকম চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভ্যাস করিত। কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টক্‌টকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন স্প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ় বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদ্‌মায়েশি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন শখের থিয়েটারের ধুম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পৌঁছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দোলনের প্রতিভূ ও প্রাণস্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই স্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় শুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলা-প্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ-মহল্লার রামজীবন-বাবুও গভর্নমেণ্ট পেন্‌সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল—যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি দু'তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল, সামান্য বেতনের কম্পাউণ্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্র্যাক্‌টিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জন করিল, বিশেষ করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ চোখ, সাহস, সতর্কতা, প্রকৃতিস্থতা, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এ সব

গুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ি নদীয়া জেলার মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্বপ্রথম কলিকাতা শহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলাদেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল, যে মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাতে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই পারে না, কারণ সে গিয়াছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে দশ-বারো বছর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ি করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নামজাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্র্যাক্‌টিস করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সে তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না!

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটি লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটি ফুরাইলে আবার কর্মস্থানে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছাড়ানো সহজ? চন্দ্রগিরি, উদয়গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্র সহ দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্র্যাক্‌টিস শুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্‌-বি পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজকালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিকটবর্তী নরহরিপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাক্‌রা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথ একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সার্টিফিকেট আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্‌টিস জমাইয়া ফেলিল। সে উপরোক্ত হাতুড়ে দলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিয়া আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইল না, বা রোগীর বাড়ি আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ির একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্‌পেন্‌সারিও ছিল না—রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ির সামনে বটতলায়—তাহাদের বসিবার স্থানের পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ির সামনে বটতলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনরাতে স্নানাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়িতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ

হাঁফাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়িতে গড়ে তিন-চারটা সার্জিক্যাল কেস লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, "এত রুগী এ-দেশে ছিল কোথায় এতদিন হে?" গত বিশ বৎসরের মধ্যে যদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিস-পত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল—কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকান ঘরের সন্ধান করিতে লাগিল! যাদু স্যাক্‌রার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু'পাঁচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র!

সতীশের দুটি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটির হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল! নিজের বাড়িতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাক্‌রাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষণ্ণমুখে বলিল, তাই মুখুয্যে মশায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্‌থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কিনা?

যাদুরাম প্রাণপণে ক'দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না! তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি-ঘটিল—আপন মনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ! নয় তো অন্য সবদিকে কোনো অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজকর্ম, স্বামী পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোন ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্‌ বন্ধ রাখিয়া এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ববঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়া রহিল কিছুদিন, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে, এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্তী রামনগরে হাই স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনো করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল!

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমনি ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটির নাম বিনয়, সে আই-এস-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবুদ্ধি। ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

এ সব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো-ষোল বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো-ষোল বৎসরের জীবন নিতান্ত একঘেয়ে; রোগী দেখা, খাওয়া, ঘুমানো—ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প-গুজব, সংসারের বাজার-হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একঘেয়ে, এক রকম জীবনধারা, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্তনও নাই, নূতনতর অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্‌ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন

আর আনন্দ নাই, এ কথা এক-আধবার তাহার মনে যে না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবারও সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়িতে আরামে সে ভিন্ গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে ; মাঠের ধারে ধারে বন্য পাখীর ডাকে কিংবা বিলের গভীর জলে বাগ্দী ছেলের ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে—সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে...রামরাম সাহু হালওয়াইর দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটি থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে... একবার সে রামজীবনবাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু—তিনজনে জঙ্গল বাড়ির বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল।...

নেপালে একবার—কর্ণেল খড়্গ সম্‌সের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি আর একটা মোড়কে পাঁচটি টাকা! সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল—টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চটতে পারে।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চটে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি নেবেন? নিন—আমি এখুনি ইস্তফা দিতে রাজী আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর নিজে আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি যাওয়া তো দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।...

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—কিন্তু সে শুধু বাহাদুরি লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জাহির করিবার জন্য। এবার কিন্তু এ সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া এ গ্রামে যে কয়টি সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয়-স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ার অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী—ও পাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—ইঁহারা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাক্‌রার রোগশয্যা-পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি, গত দশ বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যে সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়স, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদুরাম নিজেও সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধুলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দু'দুটো ছেলে মারা গেল—ওইটুকু বংশের মধ্যে শিবরাত্রির সল্‌তে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউণ্ডারীতে ভর্তি করে নেবেন আপনার

ডাক্তারখানায়—বছর তিনেক দেখে শুনে শিখলে তবুও অন্য চাষা গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ত্রুটি করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, তাহার শ্রাদ্ধের খরচ নির্বাহ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহাও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্তন দেখা দিল। ছোট ছেলের কলেজের খরচ, বড়ছেলের ডাক্তারী পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠিল নাকি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে হাতকে আর গুটানো গেল না—বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কত দিন লাগে?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর, বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা? এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার ক'টা আছে? কখনো যে-সব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতে হইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ির চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িবে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

বিনয় এম্-বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্নমেণ্টের চাকরি পাইয়া সুদূর মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছে সেদিন নাকি ছোটখাটো একটি খণ্ডযুদ্ধে আরবদের গুলি বিনয়ের কানের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এমনি হয়? বিনয় পত্রে এ ঘটনাটি বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভূষণ দাঁ-এর পুরনো আড্ডাটি আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভূষণ মারা গিয়াছে। তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে-দেশের খবর পায়, তারই সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইম-মিনিস্টারের বাড়ির সামনের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেছি। মেসিন গান্? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল...আমাদের কাছে ওসব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু'চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ি নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রি লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরনের বে-মেরামতি পুরনো বাড়িতে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ির পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক ব্যয় করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটি ছেলের বসিবার ঘর এইটি

নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আসা বন্ধ হইয়া গেল। দু'দশদিন করিয়া মাসখানেক কোনো খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে নানা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে. ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে!

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল, তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্বল কথা শুনিল না—চোখের জল তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম, মুখুয্যে-বাড়ির তেঁতুলতলার সামনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ির উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে—এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সহেবী-পোশাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল। বিনয়।

মুখুয্যে-গিন্নী স্নানান্তে শিব-পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, পূজা ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুন যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে, বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যুবকেরা সকলে বলিল, আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়-দা, বেশ যা হোক্—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ির উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরিল্লুট দিল।

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল—তারপর সে মহকুমায় গিয়া বসিল। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তার কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিত স্ব-গ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পসার কমিয়া গেল, সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেছেন। অত বড় ডাক্তার, আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ওঁদের কাছে কি আমরা—

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে।

গণেশমহল্লার সে ডানপিটে সতীশ—ঠাসা বন্দুকের এক দ্যাওড়ে অসিঘাটের ওপারের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল মনে আছে, বুড়ুয়া-মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়া ডুব সাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজ্‌রা—

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্তা' বলিতে শুরু করিয়াছে, এটা সে লক্ষ্য করিল: বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এত দিন বাড়িতেই বসিয়া ছিল—এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউন্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে। বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয়

করিত, লোক-লজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্রবধূরা গ্রামের বাড়িতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়িতে রাখিয়াছিল। তবু এতদিন সর্বদা দেখাশুনা করিত, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। এক মাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন' মাইল আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকে যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না! প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে সতীশ ঘোর অর্থকষ্টে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে-মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটি দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুর-বাড়ি চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের বিশেষ কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যা বেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠানে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।

—কে?

—আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুশী হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আয়, পটল! আয়, আয়,—

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাক নাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চৌদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন-কেমন করে সর্বদা—কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না অপ্রত্যাশিত ভাবে নাতিকে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

—তোর বাবার খবর কিরে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—সেই একই রকম দাদা। বরং আরও বেড়েচে। পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কষিতে দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দু'জনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল—বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, একটা ঘরে একা দিনরাত শুইয়া থাকে, আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া বকে, কাজকর্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল—এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাক্‌টিস শুরু করি। কিন্তু এখন আর আমায় ডাকবে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্-বি। ওদিকে তো বিনয় রয়েচে, অমল রয়েচে—শ্যামবাবু—সবাই এম্-বি। আমাকে আর কে ডাকবে?

দিব্যেন্দু বলে—ভেবো না দাদা। আমি পাশ করে যখন চাকরি করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে—আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস্ পটল। কতকাল দেখি নি—এই শুন্‌বি তবে আমরা কি করতাম সেখানে?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুরদাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুশী করিবার জন্য বলিল—বল না, দাদা! চন্দ্রগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া চন্দ্রগিরি রঙ্গগিরি, রক্তসৌলের পশুপতিনাথের-মেলার দৃশ্য—এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখা ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল।

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই দ্যাখ, একেবারে নেই স্যাণ্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুন, সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েচে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুলবে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম একেবারেই নাই—এ ধরনের অলস জীবন সে যাপন করে নাই কখনো। আপন মনে বসিলেই সেই সব কথাই মনে আসে।

গাঙ্গুলী-বাড়ীর আম্রাকালি দুটি কচি শসা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বলিল—গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা বললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়ায় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দ ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ-উজ্জ্বল চোখে আম্রাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে? মটর ডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে, মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে অমন উপার্জনক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই—তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়িতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

আম্রাকালী চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে—উপরি উপরি চারটি কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটির ওই নাম রাখিয়াছিলেন, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুলবো না জ্যাঠাবাবু। মেয়েমানুষে অমন রাঁধতে পারে না।

সতীশ খুশী হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, আম্রা?

আম্রাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন। তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ। ওরই জন্যে তো কোথাও যেতে পারি নে আম্রা। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধু-বান্ধব, তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখ্‌বে কে, সেই জন্যেই তো আছি আট্‌কে। নইলে আমার আবার ভাবনা? এই শুনবি, কাশীতে আমরা কি করতাম?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। আম্রাও এসব গল্প ইতিপূর্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালোবাসে, বিশেষ করিয়া জ্যাঠামশায়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দুজনের কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ আম্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে!...

—ধর্, ধর্, মা, ধর্—নিয়ে আয়। নাঃ জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এসো জ্যাঠাইমা কোথায় যাচ্চ, এসো···

—একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ ; তা ইয়ে আন্না কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস এখন।

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন মহকুমা-টাউনের উপর তিনজন এম্-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ হইলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার, দিল-দরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করে তা নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ির মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে!

বিনয় বলিল—থাক্ বাবা থাক, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তসুরে বলিল—উঃ, ঘেমে একেবারে···দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন? তোমার গাড়ি কোথায়?

—গাড়ি আছে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে মেরামতের জন্য একমুঠো টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায়? কাজেই গাড়ি গ্যারেজে পড়ে।

—পটল কোথায়?

কলকাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনার যে কি করি? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিনমাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দুমাস পাঠাতে পারি নি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জয়গার খরচ বিনয় তো আর পারে না। দেশের বাড়ি টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায়?

বিশেষ কিছুই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দুটি টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দুটি প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবার দস্তিঘাটা থেকে ডাক এসেছিল, কিছু পেয়েচে, তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগ্‌বে আবার?

গ্রামের একটি ছেলে রেলে কাজ করিত, ছুটি লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—দ্যাখ উমাপদ, ভাবচি কি জানো? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়িতে রেখে আমি কাশী চলে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চলবে। নইলে এদিকে সবই তো শুন্‌লে—বিনয় বড় মুশকিলে পড়েচে, রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই, এই বাজারে দুটো সংসার চালানো কি সোজা কথা রে, বাবা? আমরা চলে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়···তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্তি, আহা, কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি?

উমাপদ আবাল্য এসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত সে, বলিল—পাগল হয়েছেন? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছে ভাবচেন? সে সব কি—

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই? আমাদের সে ডানপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে, হে'-হে' হঠাৎ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা—শুনবে তবে?

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী স্টেশনে দুপুরবেলা নামিল! স্ত্রীকে মেহের-পুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ির চাবিটা আম্রাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছামিছি তাহাকে বিব্রত করা।

কাশীতে নামিয়া মনে একটা অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী! এতদিন কি করিয়া ভুলিয়াছিল সে! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে জীবনের ত্রিশটি বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ বছর আগে-কার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল? এ কাশীকে তো চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবনবাবুর মেজ-ছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটিতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশ-দা, তোমার চেহারা তো এখনো বেশ আছে! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, অমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি—মানে, অম্বলের অসুখে আমরা—এতদিন ছিলে কোথায়?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে—তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুরবাড়ি বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেইখানে আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখে হাসিমাখা, কত অজানা তরুণ মুখে—গান...আনন্দের উচ্ছ্বাস...দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। দিব্যেন্দু বলিয়াছিল—দাদা, আমি চাকরি করলে তোমার ভাবনা থাকবে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, এই সন্ধ্যা-বেলা যেন প্রত্যেক বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চাশ বছর আগেকার নিজে?

আম্রাকালীর মুখ মনে পড়িল—যখন গরুর গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

নাঃ, সে ডানপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তার সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কত রাত পর্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আম্মাকালীর জন্য কৌটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুশী হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিতপাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, গিয়া দাম পাঠাইবে। ভাল পট...বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল—তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমার এখানে আর ক'দিন থাকবো। তুমি একটা বাজার-সরকারী গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায়। অভাবে রাঁধুনী-গিরিতেও রাজী আছি। খুব ভাল রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না। ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দুর কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধক দিতে হইবে, ছিঃ—

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে সেগুলোর মূল্য বড় কম নয়। সম্প্রতি আমার অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যেই এমনি একটা ঘটনা এসে পড়েছিল—ঠিক একটা ঘটনা না ব'লে বরং তাকে দুটো ঘটনার সমষ্টিই বলা যেতে পারে।

মধুপুরে একটা বাড়ী ভাড়া করবার দরকার ছিল—এক জায়গায় সন্ধান পেলাম—ভবানীপুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ী আছে মধুপুরে এবং তিনি সেটা ভাড়া দেবেন। সকাল বেলা তাঁর ওখানে গেলাম, বেলা তখন দশটা। ভবানীপুরে ভদ্রলোক যে বাড়িতে থাকেন তা বেশ বড় বাড়ী। বাইরে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, কিন্তু তিনি তখন বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট ঘরের তক্তাপোশের উপর ব'সে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ, বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি মনে হ'ল। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর বয়সের সম্বন্ধে আমার মনে কোন কল্পনার স্থান করলেন না। বললেন—আসুন, আসুন, বড় ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মতিথি কি-না, তাই বাড়ীতে একটু উৎসব গোছের আছে। তা বেশ, এসেছেন যখন আপনাকেও ছাড়ছিনে—ইত্যাদি।

কারুর জন্মতিথি উৎসবে যে ভাবে তাকে মিষ্টকথা বলবার কথা—ভদ্রলোককে আমি

তা বললাম। কাজের কথাটা এই উৎসবের দিনে কি ভাবে পাড়া যায়? বা কতক্ষণ ধ'রে জন্মতিথিতে মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ সংক্রান্ত কথাবার্তা বলবার পরই বা কাজের কথা পাড়া সুষ্ঠু হবে—কিংবা আজকার দিনে বাড়ী ভাড়ার দরদস্তুর-রূপ ইতরজনোচিত কথাবার্তা বলা আদৌ শোভন হবে কি-না—ইত্যাদি মনে মনে তোলাপাড়া করছি এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী হাসিমুখে বড় একটা ফুলের তোড়া হাতে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে একটি যুবক। গৃহকর্তা ব'লে উঠলেন—এই যে অরুণা এসেছিস দিদি—ওঃ, পেছনে যে নির্মলকে গাঁটছড়া বেঁধে এনে হাজির করেছিস—ছেড়ে আসা যায় না বুঝি? বেশ বেশ, আমরা হয়ে গিয়েছি এখন বুড়োসুড়ো—

তরুণী ফুলের তোড়াটি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে প্রণাম ক'রে এবং হাসি মুখে বৃদ্ধের গালে দুটি ঠোনা মেরে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল, যুবকটিও গেল পেছনে পেছনে। বৃদ্ধ বললেন—আমার নাতনী—আমার বড় ছেলের মেয়ে। আই. এ. পাস— ওবছর বিয়ে হয়েছে —স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত-ফেরত, কর্পোরেশনে ভালো চাকরি পেয়েছে।

কথা তখনও ভালো ক'রে শেষ হয়নি, আর দুটি তরুণী ঘরে ঢুকল—এদের ঘাড়ের উপর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়েছে—পরনে জামিয়ারের মতো ছোট কল্কার কাজ করা নীল শাড়ি ও ব্লাউজ, গলায় সরু মফ্‌চেন, পায়ে সোনালি জরির কাজ করা নাগরা। দুটিই অবিবাহিতা—একটি গৌরী, অপরটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। এরাও ফুলের তোড়া দিলে—গৌরী মেয়েটি ঝিনুকের কাজ করা একটি নস্যদানি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে—বাবা পাঠিয়েছেন কুসুর থেকে—মা আসতে পারলেন না এখন—রাত্রে আবার থিয়েটারে যাবেন।

বৃদ্ধ বললেন—আজ দু'জনে বুঝি স্কুল-কলেজ কামাই ক'রে ব'সে আছ? যা, ও ঘরে যা হরিদাসকে বলে রাখ্ গাড়ীর কথা। আমার এর পরে মনে থাকবে না।

তরুণী দুটি চলে যেতেই বৃদ্ধ বললেন—আমার মেজ মেয়ের মেয়ে—বাগবাজারে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। গোরাচাঁদ মল্লিকের নাম শুনেচেন তো? ওই তাদেরই বাড়ী। বনেদী বংশ—গোরাচাঁদ মল্লিক ছিলেন আমার মেয়ের শ্বশুরের···এই যে ভুধর! এসো, এসো বাবা—ব'সো।

এবার আরও গুরুতর ব্যাপার! যাঁকে সম্বোধন করা হ'ল এবং যাঁর নাম ভুধর তাঁর বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। তিনি স্থূলকায় হ'লেও সঙ্গের মহিলাটির তুলনায় তিনি নিতান্ত কৃশ। এ'দের স্বামী-স্ত্রীর পেছনে চার পাশ ঘিরে ছ' সাতটি ছেলেমেয়ে। এদের বয়েস দশ থেকে উনিশের মধ্যে—আর একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে একটু পিছিয়ে ছিল—তার কোলে একটি শিশু কিন্তু এ পর্যন্ত যে কয়টি মেয়ে এখানে দেখলুম, তার মধ্যে এই মেয়েটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী।

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে বললেন—এই যে মৃণাল, পিছিয়ে কেন—আয় আয়, খোকাকে দেখি, দে একবার ভাই আমার কোলে। নিশীথ এল না?

আমার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। ছোট ঘরে যে ফাঁকা জায়গাটুকু ছিল স্বামী-স্ত্রী তার অনেকটা অংশ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন। বাকিটা জুড়েছে ছেলেমেয়ের দল—পেছনের মেয়েটির জন্যে তেমন জায়গা নেই, আমি সঙ্কুচিত অবস্থায় চেয়ার যতদূর সম্ভব পিছিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। জড় পদার্থকে আর সঙ্কুচিত করা সম্ভব নয়। অথচ এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলে যে বাইরে গিয়ে এদের স্থানের সঙ্কুলান করবো তাও অসম্ভব। এরা আমাকে সঙ্কোচের হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিলেন—এই জন্যে যে, পেছনে আর একদল এসে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে, এরা না বেরুলে তারা ঢুকতে পারে না। এরা তো প্রত্যেকে এক-একটা তোড়া দিয়ে গেল—দুটি মেয়ে আবার দুটি বেলের গোড়ে বৃদ্ধের গলায় নিজেরা পরিয়ে দিলে—বৃদ্ধ কি একটা ঠাট্টাও করলেন।

আমার তখন শোনবার মতো অবস্থা ছিল না। তারা ঘর থেকে বা'র হয়ে গেলে বৃদ্ধ বললে—এই আমার বড় ছেলে তারক, আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্‌ করে, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছে, সেখানেই থাকে। পিছনের দলটির মধ্যে মহিলা নেই—তিনটি ছোকরা, বয়সে ষোল থেকে একুশ, এরা এসে কিছু দিলে না, একজন অটোগ্রাফের খাতা বার করে বললে—জ্যেঠামশায়, আমার খাতায় আজকের দিনে কিছু লিখে দিন। অটোগ্রাফের খাতা ফেরত দিতে না দিতে আর দুটি ছেলে, তাদের সঙ্গে বারো তেরো বছরের একটি বেণী-দোলানো মেয়ে।

তারপরে ব্যাপারটা গণনার বাইরে চলে গেল।

কত ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যে ঘরটায় ঢুকতে বেরুতে লাগল, আমার আর তাদের হিসেব রাখা সম্ভব হ'ল না। ফলে ফুলে তক্তাপোশটা ছেয়ে গেল, ফুলের তোড়া ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠতে লাগল—আর সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না। আর এরা সবাই আত্মীয়-আত্মীয়া, বাইরের লোক কেউ নেই। সব আপনা-আপনির মধ্যে, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইত্যাদি। ভদ্রলোক ভাগ্যবান, এঁদের মতো লোকের সাহায্য না পেলে প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত। ক্রমশ ভিড় বাড়চে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম, আমি তখন হাঁপিয়ে উঠেছি, ভদ্রলোকও গোলমালের মধ্যে আমাকে তখন ভুলে গিয়েছেন। আমি বাড়ীর বাইরে এসে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি। বাড়ীর সামনে গলিতে সারিবন্দী মোটর দাঁড়ানো—সেখানে ধরেনি। গলি ছাপিয়ে মোটরের সারি বড় রাস্তায় এসে পেঁছেচে ; বিয়ে বাড়ীতেও এত মোটর জমে কি-না সন্দেহ। গলি পার হ'য়েই বড় রাস্তার মোড়ে নিবারণ মিত্রের সঙ্গে দেখা—সে আমার পরিচিত বন্ধু, সেজেগুজে সিল্কের পাঞ্জাবি শুঁড়ওয়ালা নাগরা পরে তাকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গলিতে ঢুকতে দেখে বললুম, ওহে, তুমিও কি বিশ্বনাথবাবুর বাড়ী যাচ্ছো না কি?

—হ্যাঁ। কেন বল তো? তুমি বিশ্বনাথবাবুকে চিনলে কি করে?

—এতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম ভাই, দেখে শুনে মাথা ঘুরে উঠল। শহরের এক-তৃতীয়াংশ লোক দেখলুম বিশ্বনাথবাবুর আত্মীয়-আত্মীয়া, আর তাঁরা সবাই এসেছেন ওই সাতাত্তর বছরের বুড়োর জন্মদিনে ফুলের তোড়া উপহার দিতে। তোমার তোড়া কই?

বন্ধু হেসে বললে—খুব আশ্চর্য লাগছে? বিশ্বনাথবাবুর সাত ছেলে চার মেয়ে। এদের সকলেরই আবার ছেলেমেয়ে এবং অনেকেরই নাতি-নাতনী, নাতজামাই ইত্যাদি হ'য়ে গিয়েছে। বিশ্বনাথবাবুরা তিন ভাই। তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী আছে। হিসেব ক'রে দ্যাখো কত হয়—এবং আসল কথা কি জানো, বুড়োর হাতে হাজার পঞ্চাশ-ষাট টাকা আছে, সকলেরই চোখ সেদিকে একথা যদি বলি, তবে সেটা খুব খারাপ শোনাবে হয়তো। কিন্তু কথাটা মনে না উঠে কি পারে? তুমিই বলো। আচ্ছা, আসি ভাই, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনের সপ্তাহ দুই পরেই আমি স্বগ্রামে গেলুম। বলা আবশ্যক যে, আমার গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশি নয়, সেখানে বছরে একবার যাওয়াও ঘটে কি-না সন্দেহ।

বাড়ী গিয়ে শুনলুম গ্রামের বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুণ মারা গিয়েছেন। শশী-ঠাকরুণের বয়স যে কত হ'য়েছিল, তা বলা শক্ত। কেউ বলে নব্বুই, কেউ বলে একশো'র কাছাকাছি হবে। আমরা মোটের উপর তাঁকে আমাদের বাল্যকাল থেকেই অতি-বৃদ্ধাই দেখে আসছি। বয়সের যে গণ্ডী পার হ'য়ে গেলে মানুষের আকৃতির পরিবর্তন আর চেনবার উপায়

থাকে না, শশী-ঠাকরুণ আমাদের বাল্যেই সে গণ্ডী পার হ'য়েছিলেন। শশী-ঠাকরুণের চার ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই বিদেশে চাকরি করে—বড় ছেলে তেমন লেখাপড়া না জানার দরুণ দেশে থেকে সামান্য কি কাজকর্ম করে, তার অবস্থাও ভালো নয়, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্ট পায়। ভায়েরা পৃথক, কেউ কাউকে সাহায্য করে না। কর্মস্থান থেকে দেশেও কেউ আসে না!

শশী-ঠাকরুণের কষ্টের অবধি ছিল না। একটা চালা-ঘরে ইদানীং তিনি পড়ে থাকতেন—বড় ছেলেই তাঁর ভরণ-পোষণ করতো বটে, কিন্তু তেমন আগ্রহ ক'রে করতো না। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে এ ভাবটা জেগে রইতো যে, মা তো আমার একার নয়—সকলেরই তো কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত মাকে—তারা যদি না করে আমিই বা কেন এত দায় ঘাড়ে করতে যাই?

শশী-ঠাকরুণের অন্য ছেলেরা কখনো সন্ধান নিত না—বুড়ী বাঁচল, কি মোলো। অথচ তাদের সকলেরই অবস্থা ভালো—মাইনে কেউই মন্দ পায় না, শহরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের পত্রের জবাব দিত—তাদের নিজেদেরই অচল হয়েছে, শহরের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাড়ীতে কি ক'রে পাঠায়। বাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তি তো রয়েছে—তার আয় থেকে তো মায়ের চলা উচিত—ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি এমন কিছুই না যার আয় থেকে বেকার বড় ছেলের একপাল পোষ্য ও শশী-ঠাকরুণের ভরণ-পোষণ ভালো ভাবে চলে।

বুড়ী খেতেই পেত না। ইদানীং আবার তার ছেলেমানুষের মতো লোভ দেখা দিয়েছিল—বিশেষ ক'রে মিষ্টি জিনিস খাবার। আমি সেবার যখন দেশে যাই, বুড়ী দেখি একটা কঞ্চির লাঠি হাতে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে বেলতলায় বসে। আমায় দেখে বললে, কুঞ্জ এলি নাকি?

—হাঁ, ঠাক্‌মা। এখানে ব'সে কেন?

—এই বাদা বোষ্টম খাবার বেচতে যাবে, তাই ব'সে আছি তার জন্যে। বাতাসা কিনব—ভিজিয়ে খাই।

—তা বেশ, বসো। ভালো আছো তো?

—আমাদের আবার ভালো থাকা-থাকি, তুমিও যেমন দাদা। খেতেই পাইনে। বাদার কাছে চারটে পয়সা ধার হ'য়েছে, আর সে ধার দিতে চায় না। সিধুর কাছে আর কত চাইব। সে নিজের ছেলেপিলে নিয়ে আতান্তরে পড়ে আছে। আহা, বাছার আমার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি তার কাছে কিছু নিই নে—তা তুই আমাকে আনা চারেক পয়সা দিয়ে যাবি?

বুড়ীর অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললাম—এখন রাখুন ঠাক্‌মা, যখন যা দরকার হয়—আমি যতদিন বাড়ি থাকি, দিয়ে যাব আপনাকে।

বুড়ী অবাক্ হয়ে গেল—আনন্দে বিস্ময়ে সে যেন প্রথমটা বুঝতেই পারলে না—আমি কি তাকে সত্যি একটা গোটা টাকা দিলুম!

পরের বছর—পুজোর কিছু আগে দেশে গিয়েছি—বুড়ী দেখি আমাদের বাড়ীর সামনের বাতাবি লেবুর তলার পথটা দিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা কাঁসার জামবাটি। আমায় দেখে বললে—কখন বাড়ী এলি?

বললুম—কাল এসেছি ঠাক্‌মা। বাটি হাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

—আর বলিস্‌নে, দাদা! বাটিটা নাপিতপাড়া নিয়ে গিয়েছিলাম যদি ওরা কেনে। আমার দিন তো আর চলে না, হাতে মোটে পয়সা নেই। সিধু খুলনে গিয়েছে—আজ

চার-পাঁচদিন। বাড়ী একেবারে অচল। ছেলেপিলেগুলো খেতে পায় না এমন অবস্থা।

—তা বাটিটা বিক্রী ক'রে আর ক'দিন যাবে ঠাক্‌মা?

—তবু যে ক'দিন যায়। তাও ওরা নিলে না—বলে নগদ এখন দিতে পারব না। ধারে বাটি দিলে আমার কি করে চলে ভাই বলো তো? একটু গুড় খেতে পাচ্ছিনে, বাটিটা বেচে ভেবেছিলাম আজ হাটে আধসের ভালো আকের গুড় আনতে দেব—আর অজকের হাটটাও হবে এখন। ছেলেপিলে শুধু ঝিঙে ভাজা আর ভাত খেয়ে মারা গেল। তা নিবি দাদা বাটিটা? ফুল কাঁসা, এ ওদের বাটি না। আমার নিজের বাটি—বিয়ের দানে আমার বাবা দিয়েছিলেন, দ্যাখ্‌ না?

শহরে থাকি,—অনেক সময় কাঁচা পয়সা রোজগার করি। পাড়াগাঁয়ে যে এত পয়সার কষ্ট তা ভেবে দেখি নে। আমায় অন্যমনস্ক দেখে বুড়ী ভাবলে বোধহয় বাটি কেনবার ইচ্ছে নেই আমার। অনেকটা মিনতির সুরে বললে—না কিনিস্‌, ওটা বাঁধা রেখে আমায় বরং আট আনা পয়সা দে।

এ রকম অবস্থায় বুড়ীকে আমি আরও কয়েকবার দেখেছি।

শুনলাম—বুড়ীর মরণকালে অন্য ছেলেরা কেউ আসেনি—বড় ছেলে খুব সেবাযত্ন করেছিল। বুড়ীর গায়ে একটা লেপ ছিল, মরণের ঘণ্টা দুই আগে বুড়ী পুত্রবধূকে বলেছিল—বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা—আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে, আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ ক'রে লেপ বানাবে? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হ'লে।

আরও খানিক পরে বুড়ী ছেলেকে ডেকে বললে—দ্যাখ্‌ সিধু, একটা কথা বলি শোন্‌। আমার শ্রাদ্ধে বেশি কিছু খরচপত্র করতে যাসনে যেন। বিধু, মনি, শরৎ ওরা কেউ কিছু হয়তো দেবে না—তুই একা পাবি কোথায় যে খরচ করবি? নমো নমো করে অমনি পাঁচটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দিবি। আর যদি ওরা কেউ কিছু পাঠায়, তাও সব টাকা খরচ করিস্‌ নে। হাতে কিছু রাখবি,—এর পরে তোর ছেলে-পিলেরা খেয়ে বাঁচবে।

শুনলাম শশী-ঠাকরুণের ছেলেরা সবাই বাড়ী এসেছে ও খুব ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম। সামনের উঠানে নারিকেলের ডাল পুঁতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের মণ্ডপ তৈরী করা হ'য়েছে—মণ্ডপের সামনে শামিয়ানা টাঙানো। গ্রামের অনেকেই সেখানে উপস্থিত, সেজ ছেলে গোপেশ্বর কাছা গলায় গ্রামের বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আপিসে নূতন লোক ঢোকানো আজকাল যে কত অসম্ভব হ'য়েছে—সে সম্বন্ধে কি বলচে। গোপেশ্বরের বয়েস প'য়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে, রেলের অডিট অফিসে বড় চাকুরি করে—চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় তাকে কারো চাকুরির জন্যে ব'লে থাকবেন, কথার ভাবে তাই মনে হল।

—আগে অনেক ঢুকিয়েছি কাকাবাবু, সিমসন গিয়ে পর্যন্ত আর সেই সুবিধে নেই। সিমসন সাহেব, আমি যা বলেছি তাই করেছে। এখন পোস্ট খালি হ'লে সব তলায় তলায় ঠিক হ'য়ে যায়—আপিসের আর সে-দিন নেই।...শুনলাম গোপেশ্বর রিটায়ার করবার পরে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দরুণ প্রায় আঠার-উনিশ হাজার টাকা পাবে, হাওড়ায় না বরানগরে জমি কিনেছে, সেইখানেই বাড়ী করবে। আজ দশ-এগারো বছর পরে সে দেশে এসেছে, মায়ের মৃত্যু না ঘটলে, আরও কতদিন আসতো না তাই বা কে জানে!

ওদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আমি অবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদের বাড়ীতে যে এত ছেলে-মেয়ে, বৌ, ঝি-চাকর আছে—তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবার জো ছিল না।

মেজ, সেজ ও ছোট ছেলের বৌয়েরা এসেছে, তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনীতে বাড়ী ভর্তি। খুব ছোট বেলায় যে মেয়েদের দেখেছিলাম, হয়তো অনেকের সঙ্গে খেলাও করেছি —তাদের বিয়ে হ'য়ে ছেলেপিলে হ'য়ে গিয়েছে—অনেকের স্বামীরাও এসেছে। তবু তো বুড়ীর বড় মেয়ে অনেক দূরে থাকে ব'লে আসতে পারেনি—অপর দুই মেয়ে ও তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। সবাই ব্যস্তসমস্ত, এখানে তরকারি কোটা হচ্ছে, ওখানে জিনিসের ফর্দ হচ্ছে, বাড়ীময় ছেলেমেয়েদের চিৎকার, হাসি, ছোটাছুটি—মেয়েরা এ ওকে ডাকছে, মেয়েরা ছেলেপিলেদের বকছে, কুয়োতলায় বড় বড় পেতলের গামলা মাজার শব্দ, বাড়ী-সুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত, কারো হাতে একদণ্ড সময় নেই।

—ওরেও বিনু রেণুর গায়ের জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে কেচে দে না বাপু, কতক্ষণ থেকে বলছি, আমার কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

—ও কমলা, হেলে দুলে বেড়াচ্ছ মা, ততক্ষণ পানগুলো তুমি আর বীণা নিয়ে ধুয়ে ফেল না—এরপর আর সময় পাবে?...কি—কি—আবার মরছে ডেকে ছোট বৌ—মাগো, হাড় জ্বালালে—বসতে দেয় না একরত্তি—এই তো আসছি ভাঁড়ার ঘর থেকে—

একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে দালানে ঢুকবার দরজার এক পাশে একটা স্টোভ ধরাবার চেষ্টা করছে—আমি পাশ কাটিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেজ ছেলে বীরেশ্বর ও তার বৌয়ে ঝগড়া হ'চ্ছে। মেজ ছেলে কোন জমিদারী স্টেটের ম্যানেজার, বয়েস পঞ্চাশের ওপর—তার স্ত্রীকে আগে কৃশাঙ্গী দেখেছি, আজ আট ন' বছর দেখিনি —এরি মধ্যে এত মোটা হয়েছেন যে প্রথমটা যেন চিনতে পারি না। হাতে মোটা সোনার বালা ও অনন্ত, গলায় ছিকলি হার। তিনি স্বামীকে বলছেন—ও ঘরে আমি থাকতে পারব না, এই ভিড়, তাতে ও ঘরে খিল নেই। আমার মেয়ের গায়ে এক-গা গয়না, কাজের বাড়ী, লোকের ভিড়—বিশ্বাস আছে কাউকে—তাতে এই পাড়াগাঁ জায়গা? বাবা, ভালোয় ভালোয় কাজ মিটিয়ে এখন এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। কাল সারারাত মশায় খেয়েছে।

বীরেশ্বর বলচে, তা তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে না হয় পশ্চিমের কোঠায় শুয়ো—মাথা গরম কোরো না, দোহাই তোমার—তোমার মাথা গরম আমার বরদাস্ত হয় না বাপু—

আমি ঢুকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললুম—চিনতে পারেন কাকীমা?

তিনি কথার উত্তর দেবার পূর্বেই এগারো বছরের একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে বললে—নাথ্‌নি এখনও পিণ্টুকে দুধ খাওয়ায়নি মা—সকাল থেকে তাকে নিয়ে বাইরের উঠোনে বসে আছে—বললেও শুনচে না—

বীরেশ্বর বললে—যা এখন যা, বলগে যা নাথ্‌নিকে—আমি ডাকছি। এসো কুঞ্জ বসো। ওগো তুমি কুঞ্জকে চিনতে পারলে না?

বীরেশ্বরের স্ত্রী মৃদু হাস্যে বললে—দেখেচি বোধ হয় ওকে ছেলেবেলায়, যাতায়াত নেই—দেখাশুনো তো হয় না, না-চিনবার আর দোষ কি বল? শাশুড়ী মারা না গেলে কি এখন আসা হ'ত? চিঠি পেয়ে আমি বলি—না যেতে হবে বই কি, দেশে একটা মান-খাতির আছে। শাশুড়ীর কাজটা ভালো করে না করলে লোকে ওঁদেরই দুষবে। বট্‌-ঠাকুরের পয়সা নেই সবাই জানে। ওঁদের গাঁয়ে-ঘরে নাম রয়েছে, দেশে-বিদেশে সবাই মানে, চেনে, বলবে—অমুক বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কিছুই করেনি, বল তো বাবা, কথাটা কি শুনতে ভালো? তাই তো এলুম, নইলে এসব জায়গায় কি মানুষ আসে? কি মশা! কাল রাত্তিরে একদণ্ড চক্ষের পাতা বুজতে দেয়নি।

রোয়াকের ধারে বসে মেজ ভাইয়ের ছেলে বিকাশ তাদের স্কুল কি ভাবে একটা ফুটবল ম্যাচ্ জিতেছে, মহা-উৎসাহে সে গল্প করছে সেজ ভাইয়ের ছেলে বিনুর কাছে। বড়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই [illegible] - তারই পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ; আজ তার [illegible] এই পৌত্রীদের তাই বলেছে এতদিন [illegible] কোথায় [illegible] পাড়ার [illegible] তার [illegible] তার কোন উত্তর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সেই পাড়ীওয়ালা [illegible] উৎসবের কথাও মনে পড়ে গেল। [illegible] পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র দৌহিত্রীর ভিড় দেখেছি সেখানেও। সবই সেইরকম কেবল সেটা ছিল জন্মতিথি উৎসব - জন্মতিথি যার, তার বয়স শশী ঠাকরুণের মতই হবে।

রামশরণ দারোগার গল্প

রামশরণবাবু আমাদের সান্ধ্য-আড্ডায় নিত্যই আসেন, কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলেন না। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের কর্মচারী, জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছেন, —আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি দেখেছেন। কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়া আশ্রয় ক'রে সেই যে আড় হয়ে শুয়ে পড়েন, যতক্ষণ না আড্ডার শেষ লোকটি চলে যায়— ততক্ষণ তিনি চোখ বুজে এবং নিজে নির্বাক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য—এই ধরনের একটা আলোচনা চলছিল। এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলেই কোন-না-কোন ঘটনা বলছে। রামশরণ-বাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বলে উঠলেন, আমার চাকুরীজীবনে একটা ব্যাপার একবার ঘটেছিল, অনেকদিন হলেও এখনও ভুলিনি। আরও ভুলিনি এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়ে গিয়েছে, যদিও কত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেড়িয়েছি সারা জীবন! বলি শুনুন ঘটনাটা।

আমি তখন থাকি আলমপুর থানায়। কলকাতার অত কাছে, বড় শহরের উপকণ্ঠে, চুরি-জুয়াচুরির আড্ডা বেশি—একথা পুলিশ-কর্মচারী মাত্রই জানেন। এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশ থেকে অন্ততঃ সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—আমাদের এলাকার কোন বাগান-বাড়ীতে একজন নোট জাল করছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না। আর সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—বাগান-বাড়ীতে বোমার কারখানা বসেছে, আমরা সে বিষয়ে কি খবর রাখি। ফেরারী আসামী তো হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা নিচ্ছে আমাদের এলাকায়! একবার তো মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে—কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে—এক খোলার ঘরে। তা ছাড়া বে-আইনী কোকেন্, গুম, টাকা জাল, চোরাই মালের ব্যবসা, গুন্ডামি প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান-বাড়ী ও বস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?...অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—শতকরা নব্বুইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন, নয়ত আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণ করে নি, তবুও কলকাতা পুলিশের এন্‌কোয়ারীর শিলপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত!

একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই, আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, শীতকাল—এমন সময় গাড়ীর শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—একখানা সেকেন্ড ক্লাশ গাড়ী থেকে একজন স্ত্রীলোক থানার সামনেই নামছেন। তিনি থানার মধ্যে ঢুকে, আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দারোগাবাবু কোথায়?

—বলুন—আমিই।

তখন তিনি একখানা খামের চিঠি আমার হাতে দিলেন। খাম খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বসতে বললুম। চিঠি লিখেছেন নারী-কল্যাণ-আশ্রমের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী। যোগেশবাবু আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে, তাঁর দ্বারা স্ত্রীলোকঘটিত নানা ঘটনায় পুলিশের অনেক উপকারও হয়েছে বটে। তাঁর বর্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই, মাত্র এইটুকু যে, যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যোগেশবাবুর পরিচিতা; তাঁর বক্তব্য কি, তা শুনে আমি যদি তাঁকে সাহায্য করি—তবে ভালো হয়।

আমরা পুলিশের লোক—কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয়! মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে—এতে আমাদের দোষ দেওয়া খুব বেশি চলে না। স্ত্রীলোকটিকে একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হ'ল তাঁর বয়স চল্লিশের মধ্যে হবে। এক সময়ে খুব রূপসী ছিলেন। খুব সরল চরিত্রের মেয়ে নয়—একটু খেলোয়াড় ধরনের। অবস্থাও খুব ভালো নয়।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি চান?

তিনি উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে—এখানকার কোন কালী-মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় তাঁর অবস্থা

খুব ভালো ছিল না বলেই ওরকম পাত্র মেনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছে। তিনি বর্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান—তাঁর নিজের কাছে। যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন ; মোটের উপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে রাজী নন, এ বিষয়ে আমাকে তাঁর সাহায্য করতে হবে।

এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমায় বলেন নি! স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি খুব। তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু ওই সঙ্গে আমায় শুনে যেতে হ'ল। তার মধ্যে দুটো কথা প্রধান। এক সময় তাঁর স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

আমি বললুম—পুলিশের সাহায্য চান কেন? আপনি নিজেই কেন গিয়ে জামাইকে বলুন না?

তিনি বললেন—অনেকবার বলেছি, জামাই শোনে না, মেয়ে পাঠাবার মত নেই, অথচ তার দুর্দশার একশেষ করছে! আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সব বুঝবেন। আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো জোর খাটবে না তো, আমার সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, কে আমার পক্ষ হ'য়ে দুটো কথা বলবে? তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছে আসা।

আমি বললুম—দেখুন, এতে পুলিশের কিছু করবার নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর। আপনার জামাই যদি মেয়েকে না আপনার সঙ্গে দেন, আমরা তাতে কি করব?—আপনার মেয়ের মত কি?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—মেয়েরও মত নয় এখানে থাকা। তারপরে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন—আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি। মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই। তার কষ্ট আর দেখতে পারিনে। আপনি একটু সহায় না হলে—আমার আর কোনো উপায় নেই—এটুকু দয়া আপনাকে করতেই হবে। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরে আর কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি আমার ভালো লাগল না। অনেক রকম লোক দেখেছি, মশাই, ভালো-মন্দ সব রকম দেখে যদি একটু সিনিক হ'য়ে থাকি, তার জন্যে আমাদের বেশী দোষী ঠাওরাবেন না।

শেষ পর্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে—কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে গেলাম সেই কালীবাড়ী। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম। কালী-মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠুরীতে পূজারী-ঠাকুর থাকে, সন্ধান নিলাম। পূজারীকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একহারা পাক-শিটে চেহারা। এই বয়সেই চুলে বেশ পাক ধরেছে, দেখেই মনে হ'ল—নেশাখোর লোক। ধড়িবাজও বটে।

তাকে সব খুলে বললাম। পুলিশ দেখে সে জড়সড় হয়ে গিয়েছে। কাঁচু-মাচু ভাবে বললে—আজ্ঞে বাড়ীতে যদি আপত্তি না করে, আপনি গিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে আসুন আমি পাঠিয়ে দেব। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারোগাবাবু, আমার মোটেই আপত্তি নেই। একটা পেট আমার, যে-কোনো রকমে চালিয়ে নেব। বেশ, আপনি চলুন আমার বাসায়। আমার স্ত্রীকে বলুন—আমি সেখানে থাকব না।

এর পরে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল, যা অতদিনের পুলিশ-জীবনে কখনো হয়নি। পূজারী যখন তার স্ত্রীকে দোর খুলতে বললে—আমরা তখন দোরের পাশে, কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। দোর কে একজন এসে খুলতেই পূজারী-ঠাকুর বললে,

দুটি ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাপের বাড়ী থেকে,—তোমার মায়ের কাছ থেকে, ওঁরা তোমাকে কি বলবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু জলটল খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেখি।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আসুন আপনারা,—কথাবার্তা বলুন।... আসচি আমি।

ঘরের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে আধ-ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—কিন্তু অমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি তো মশাই আমার জীবনে খুব বেশি যে দেখেছি, এমন মনে হয় না। টকটকে গৌর বর্ণ,—মাথায় ঘন কালো চুলের রাশ, প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কি সুন্দর হাত-পায়ের গড়ন,—কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি। আর চোখ—সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ, ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, তুলি দিয়ে আঁকা টানা জোড়া ভুরু। কতদিন হয়ে গিয়েছে—এখনও সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি।

ঘরে ঢুকে বললুম—মা, আমাদের দেখে ভয় পেও না, লজ্জাও করো না। আমরা পুলিশের লোক। এখানকার থানা থেকে আসচি! তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন—তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান। তিনি থানায় বসে আছেন। তুমি যদি যাবার মত কর, তবে তাঁকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে বলি।

মেয়েটি একটিবার ঘাড় নেড়ে বললে—আমি যাব না।

ঘরের মধ্যে চার ধারে চেয়ে দেখি—এক কোণে একটা ভাঙ্গা তোরঙ্গ। তোরঙ্গটার ওপরে একটা কাঠ-বাঁধানো পুরানো আয়না ও একটা কাঁচের তেল মাখবার বাটি ; এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া-ধুকড়ি লেপ, কাঁথা। ঘরের কড়ি থেকে টাঙানো গোটা দুই দড়ির শিকে। তাতে কলাইকরা জামবাটি বসানো। পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও। দারিদ্র্যের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না।

মেয়েটির উত্তর শুনে বললুম—মা, যদি তোমার স্বামীর মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, আমি বলচি তোমার মা যদি তোমায় নিয়ে যন, তোমার স্বামীর তাতে অমত নেই। আমার কাছে তিনি বলেছেন একথা। আসবার সময় সে-সব কথা হ'য়ে গিয়েছে।—কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পার। আর এখানে যে কষ্টে আছো দেখচি, তাতে আমার মনে হয়—তোমার যাওয়াই ভালো।

সে এবারও ঘাড় নেড়ে বললে—না, আপনি মাকে গিয়ে বলুন—আমার যাওয়া হবে না।

সে সুরের দৃঢ়তা এমনি যে, তার ওপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবুও আর একবার বললুম—দেখ মা, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার মা এসেচেন অনেক আশা করে। আমাদের সাহায্য চেয়েচেন বলেই আমরা এসেচি। অবিশ্যি এটাও আমরা দেখবো তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে, তোমার স্বামী তোমার ওপর কোনো রূঢ় আচরণ না করেন। সে বিষয়ে তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার।

মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতো সুরেই বললে—না আমি যাব না।

আমার কেমন একটু রাগ হ'ল—পুলিশে কাজ করে করে একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—কারোর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতাম না। একটু বিরক্তির সুরে বললুম—এই কষ্টে থাকবে, সেও ভালো? যাবে না তবুও? মেয়েটি চুপ করে রইলো। বেশ, না যাবি মরগে যা, তাতে আমার কি? বললুম—তা হ'লে একটা কাজ কর—না যাও সে তোমার ইচ্ছে। আমাদের কিছু বলবার বা জোর করবার নেই। তুমি একখানা পত্র লেখ তোমার

মাকে, যে আমরা তোমাকে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম,—তুমি যেতে রাজী হওনি, আমরা থানায় নিয়ে তাঁকে দেখাব।

কাগজ কলম আমরা দিলুম। মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল। ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো ক'রে চোখ পড়তে দেখি একজোড়া রাঙা কড় ও নোয়া ছাড়া এমন শ্রী সুডৌল হাতে আর কিছু নেই।

আরও কষ্ট হ'ল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে। কি বিশ্রী সেঁতসেঁতে মেঝে, সপসপ করছে ভিজে। সদা-সর্বদা যেন জল উঠছে। এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয় কি করে—এ আমার বুদ্ধির অতীত। অত্যন্ত সুস্থ লোকও তিন দিন এ রকমের শুধু মেঝের ওপর যদি শুয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখি—মেয়েটি মুখ নিচু করে, পা ছড়িয়ে মেয়েলি ধরনে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হ'য়ে বসে চিঠি লিখছে আর তার ডাগর চোখ দুটি বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, দু' এক ফোঁটা জল চিঠির ওপরও পড়ল।

পুলিশের চাকুরিতে মন বেশ একটু কঠিন হ'য়ে গিয়েছিল বটে, তবু মেয়েটির নিঃশব্দ কান্না দেখে, ওর সংসারের এই নগ্ন দারিদ্র্য, নিরাভরণ ওই হাত দুটি, এই সেঁতসেঁতে ঘরের মেঝে, ভাঙা আয়নাখানা, ওই ধুকড়ি লেপ কাঁথা দেখে, তার ওপর ওর গাঁজাখোর মূর্খ স্বামীর কথা মনে হয়ে—না মশাই আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না—সুরটা নরম করেই বললুম—এই তো, মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তবে কেন চল না, তাঁর সঙ্গে?

আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় ওর হৃদয় স্পর্শ করলে, বললে, সেখানে এর চেয়েও কষ্ট।

ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা, ঔদাসীন্য, মরীয়াভাব—সব একসঙ্গে জড়ানো।

অবাক্ হ'য়ে বললুম—এর চেয়েও কষ্ট! এর চেয়ে আর কি কষ্ট থাকতে পারে?

মেয়েটি শান্ত, স্থির সুরে বললে—আপনি সব কথা জানেন না, বললুম যে আরও অনেক কথা আছে এর মধ্যে! সে সব কথা বলতে চাইনে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন, তোমার মেয়ে মরেচে আর তার খোঁজ কোরো না—

কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ-কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল। আমিও চিঠিখানা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম। পথে দেখি পূজারী-ঠাকুর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে আসছে, আমাদের দেখে দাঁত বার করে বললে—হেঁ হেঁ, কি হ'ল দারোগাবাবু? যা বলেচি, তাই হ'ল কিনা? তা এখুনি চললেন যে.....? একটু যৎসামান্য মিষ্টিমুখ—

ওর ওপর রাগ কি হিংসে—কি হ'ল জানিনে। তার সে সব আপ্যায়নের কথা রূঢ়-ভাবে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বললুম—ওসব থাক্। একটা কথা বলি শোন ঠাকুর, কাল থানায় যেয়ো সকাল বেলা। একটা তক্তপোশ সস্তায় নীলাম হবে। দাম তুমি যখন হয় দিও, কাল গিয়ে নিয়ে এসো সেখানা। বুঝলে?

পূজারী-ঠাকুর অবিশ্যি নিজের কাজ ভোলেনি। পরদিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল। এইখানেই আমার গল্পের শেষ।

আমরা এতক্ষণ একমনে শুনছিলুম। রামশরণবাবু চুপ করলে আমরা একজোটে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি আর কখনো সে মেয়েটিকে দেখতে যান নি?.....

রামশরণবাবু বললেন—আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেতুম। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হ'ল। তারপরে সে মেয়ে-টির আর কোন খবর জানি না। মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইলে না, আমি আজও বুঝতে পারিনে।

খুড়ীমা

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি। বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। বর্ষা-বাদল না হইলে বিনোদমাস্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি বাদলই নামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং আমার দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিল। আজও মনে আছে—লোকটির গায়ে একটা ময়লা চিটচিটে কামিজ, খালি পা, রুক্ষ চুল। বয়স বুঝিবার উপায় নাই, অন্তত আমার পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এতদিন ছিলাম মামার বাড়ীতেই! এ-গ্রামে আমি আসিয়াছি বেশী দিন নয়। যখন চলিয়া গিয়াছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাস্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর?

লোকটা উঠানে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া বলিতে গেলাম—আসুন না ওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাস্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—কি চাই পরেশ? লোকটা আর একবার কেমন এক ধরনের হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরনের হাসা উচিত ছিল তেমন নয়—যেন নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক হাসি হাসিতেছে। ছেলে-মানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা অসংলগ্ন ধরনের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জাঠতুতো ভাই শীতল বাড়ীর ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে পরেশকাকা কোথা থেকে? কোথায় ছিলেন এতদিন?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটি মুড়ি আনিয়া লোকটার কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন, এমন সময় লোকটা একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদা'র দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকিগুলি একবার রাইট-য়্যাবাউট্ টার্ণ করিয়া ঘুরপাক খাইয়া উঠানময় কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে কি একটা দুর্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার সুরে—

গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
খোদার চাল গামছায় বাঁধি
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
গুগ্‌লি ঝিনুক—
গুগ্‌লি ঝিনুক—

তখনও সে ঘুরপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন সময় আমার জ্যাঠামহাশয় দুর্লভ রায়—তিনি অত্যন্ত রাশভারী ও কড়া মেজাজের লোক—বাড়ীর ভিতর চণ্ডী-মণ্ডপের পাশের উঠান হইতে অন্দরে যাইবার দরজাতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে

চেঁচামেচি করে দুপুরবেলা? ও, পাগ্‌লাটা? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেন ও-রকম করে ফেললে যে বড়— বদমায়েশী করবার আর জায়গা পাও নি?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পরে তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "বেরোও এখান থেকে, আর কোনদিন দরজায় ঢুকেছ তো মেরে হাড় গুঁড়ো করব"—আমার বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়ের ধাক্কার বেগে রোগা ও পাতলা লোকটা খানিকটা দূরে ছিটকাইয়া গিয়া কাদায়-পিছল উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবার থুতু ফেলিল—রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের দরজায় জড় হইয়াছিল—লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমার মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ-কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েরই মুখুজ্যেবাড়ীর ছেলে, পশ্চিমে কোথায় যেন চাকুরি করিত, বয়স বেশি নয়—এই মাত্র পঁচিশ! হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথা খারাপ হওয়ার দরুন চাকুরি ছাড়িয়া আসিয়া পথে-পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সে যে-বাড়ীর ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্ম করে, এখানে কেহ থাকে না, উন্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্যন্ত দেখায় নাই। পাগল পরের বাড়ী ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেয় না, মাঝে মাঝে মার-ধোরও খায়।

একদিন নদীর ধারে পাখির ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় একজন সন্ধান দিয়াছিল গাঙের উঁচু পাড়ে গাং-শালিকের অনেক বাসা দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াও পাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপরও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন-ছায়া নামিয়াছে। বাড়ী ফিরিতে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাতলার শ্মশানে গ্রামের প্রহ্লাদ কলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কে বসিয়া আছে।

ভয় হইল। ভূত নয় তো?

একটু আগাইয়া গিয়া ভালো করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘরের মেজেতে শ্মশানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—পয়সা আছে কাছে?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া সবাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলাম। আমি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্যন্ত মার খাইয়াছে, মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একটা দগ্‌দগে ঘা, ঘায়ে মাছি বসিতেছে, পাশে একটা মালসায় কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জঙ্গলের মধ্যে আছেন কেন কাকা? আসবেন আমাদের বাড়ী? আসুন, শ্মশানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, শ্মশান বুঝি, এ তো আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ী রয়েছে, দো-মহলা বাড়ী। দু-হাজার টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরি করে টাকা জমাই নি ভেবেছিস?

কত করিয়া খোশামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাদুর ছাড়িয়া কিছুতে উঠিল না।

ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামারা আসিয়া তাহাকে হুগলি লইয়া গিয়াছে।

দুই বৎসর পরে আমার উপনয়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচ করিয়াছিল।

কি সুন্দর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগল অবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা-ধুলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতে পারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, দেখিয়া খুশি হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে! বৈকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুন বর বধূর পৌঁছিতে এক প্রহর রাত্রি হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া বরণ হইল। এসিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধূর মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ-সব অঞ্চলে অমন সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই একবাক্যে বলিল—বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছুদিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরে আবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকাদের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ীর সকলে তখন কি-একটা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। অনেকে আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরিপাড় শাড়ি পরনে আমাদের স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গড়ানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মতো মুখশ্রী।

আমরা সামনে উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিলাম। পরেশ-কাকার বৌ ওখানে বসিয়া থাকাতে সেদিন আমার যেন উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়ীমাকে খুশি করি। সে কি লাফঝাঁপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলাম হঠাৎ! গায়ে যেন দশজনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ীর ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল? বেশ চোখ-দুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলি-বাড়ীর পাবু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—ডাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদে ছুটা-ছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন তা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসের লজ্জা!

গিয়া প্রথমেই একটি প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নাম কি? পাবু? ভালো নাম কি?

লজ্জা ও সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাণীব্রত—

তিনি বলিলেন—বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড় তো? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাত্রে আনন্দে আমার বোধ হয় ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের

দেবী কি রূপকথার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়।

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ী রোজ যাইতে আরম্ভ করিলাম, দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীমার সঙ্গে! আমার বয়েস তখন বারো, খুড়ীমার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তাঁর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বিবাহের পর-বৎসর গ্রামে খবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরিস্থলে আবার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই বাপের বাড়ী। পাগল হইবার সংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। খুড়ীমার সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। খুড়ীমার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড় ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি পত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীমার আসিবার সংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও চেহারায় দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি সুকুমার, বিদ্যুতের মতো রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তরে হাসিয়া খুড়ীমার সামনে মেজের উপরে বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম —আপনি ভালো ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভালো থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু!

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীমার জন্য দুঃখ-হইল। অভাগিনী খুড়ীমা!

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসে বসো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালোবাস—না?

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালোবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি। পাবু, এ গাঁয়ে তোর মতো ভালোবাসে না কেউ আমায়।

লজ্জায় রাঙা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিলাম। তেরো বছরের ছেলে কি কথাই বা জানি!

—কলকাতা দেখেছ পাবু?

—না, কে নিয়ে যাবে?

—আচ্ছা, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বেশ আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে, কেমন তো?

—কবে যাবেন খুড়ীমা? শ্রাবণ মাসে? না এখন কিছুদিন থাকুন এখানে। যাবেন না এখন।

—কেন বল তো?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশি উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীমা নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্য খাবার করিয়া রাখেন, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে

দেন। অনেক রকম ব্রত করিতেন, তাঁর ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পয়সা কত জমা হইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাক্সটাতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীমার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কত আবোল-তাবোল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীমা বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই পড়ে শোনা দিকি? ভারি ভালো লাগে আমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে! তোর গলার সুর ভারি মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার "নিমাই-সন্ন্যাস" পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং বেশ ভালো গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,
দেখা হবে মনে মনে।
আমার নিশীথ স্বপনে এসো।
এসো তন্দ্রা আবরণে।

খুড়ীমা প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও তো?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীমাকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রায়-বাড়ীর বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম—কি জানি বাপু জানি নে, ও সব কলকেতার কাণ্ড। সোয়ামি যার পাগলাগারদে, তার অত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসের, অত পাতাকাটার বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশিই বা আসে কোথা থেকে! কিবে ঢং, কিবে শাড়ির রং—না বাপু, আমার তো ভালো লাগে না—তবে আমরা সেকেলে বুড়োহাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান্ তো জানি নি?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অন্য-অন্য লোকের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুষি লাগাইয়া দিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদের বলি—না, তোমরা জান না। তোমাদের মিথ্যে কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীমা ভালো—খুব ভালো।

কিন্তু যাহারা বলে তাহারা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বয়স অনেক বেশি। কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

তাঁহার চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব যে স্পষ্ট মনে আছে তা নয়। কেবল একদিনের তাঁর অপূর্ব কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখ গভীর ভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল। যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কৌতুকপ্রিয়া, হাস্যমুখী সুন্দরী তরুণীকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঙ্গপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজনেগাছ, ঝোপঝাপ পঙ্গপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীমা ও আমি ছাদে দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—দুজনের কেহই আর কখনও পঙ্গপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ খুড়ীমা বিস্ময়ে ও কৌতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, দ্যাখ্ দ্যাখ্—রায়দের নিমগাছে একটা পাতাও রাখে নি, শুধু গুঁড়ি আর ডাল, এমন কাণ্ড তো কখনও দেখি নি—ও মাগো।

বলিয়াই কৌতুকে ও আনন্দে বালিকার মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িল। আমাদের নদীর দু-ধারে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু শুভ্র মেঘখণ্ড বাদামবনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদের

সায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরীশ-জ্যাঠাদের বড় আমবাগানের উপর দিয়া শুভরত্ন-পুরের মাঠের দিকে কোথায় উড়িয়া যায়...বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত শুরু করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাপিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই রহিয়া গেলেন। পরেশ-কাকাও পাগলাগারদ হইতে বাহির হইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ী তাঁর ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নাম শান্তিরাম, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালোই। অল্প দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে কুটুম্ববাড়ী ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, যাইলেও অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার কিছু কাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তার নামের সঙ্গে খুড়ীমার নাম জড়াইয়া একটা কুকথা লোকে রটনা করিতেছে। একদিন দুপুরের পরে খুড়ীমাদের বাড়ী গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পেঁপেতলার জানালার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শান্তিরাম বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদ ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এক-মনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—কি পাবু, দুপুর-বেলা বেড়ানো কি? পড়াশুনো করো না? যাও, এখন যাও—

আমি শান্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমার দুঃখ হইল যে, খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি তখনই ওদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটা কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও কমাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর তেমন করিয়া পাই না; শান্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই, অসময় নাই, ছাদে কি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প করিতেছে—আমার যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শান্তিরামের কথার উপর কোন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ায় পাড়ায় যে-কথা রটনা হইতেছে, তাহা আমার কানে প্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, ইহার জন্য খুড়ীমার উপর আমার কোনই রাগ নাই, যত রাগ শান্তিরামের উপর। সে দেখিতে ফর্সা বটে, বেশ শহুরে-ধরনের গোছালো কথাবার্তাও কয় বটে, শৌখীন সাজপোশাকও করে বটে কিন্তু হয়ত তাহার ফিট্‌ফাট সাজগোজের দরুনই হোক, কিংবা তাহার শহর-অঞ্চলের বুলির জন্যই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমি কেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভালো না।

একদিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রাণায় সর্ব চৌধুরী ও কালীময় বাঁড়ুয্যে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটি-মাছ-মারা ছিপ-হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকে দেখিয়া উহারা কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম। সর্ব চৌধুরী বলিল—তাই তো, ছোঁড়াটা যে আবার এখানে।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—বল, বল, ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমরা এমন হ'তে দিতে পারি নে। একটা মিটিং ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন কথা উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরির স্থানে, আর ওই শান্তিরাম না কি ওর নাম?—ওকেও শাসন ক'রে দিতে হয়।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—শাসন-টাসন আর কি—ওকে এ-গ্রাম থেকে চলে যেতে বলো। না যায় আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরি ছেড়ে আসবে এখন

কুটুম্ব শাসন করতে? সে যখন বাড়ী নেই, তখন আমরাই অভিভাবক।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়ীটাও নাকি বড্ড বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—তাই তো শুনছি। বয়েসটা খারাপ কিনা। তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময়-জ্যাঠা আমাকে যতই না বোকা ভাবুন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহারা হয়তো খুড়ীমাকে কোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিংবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সংগে সংগে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে এ-কথা আমি বলিতে পারিব না, কোনমতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরের সংসারের শান্তি নষ্ট করিতে? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না? এতদিন কুটুম্ব-বাড়ীতে পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও তো হওয়া উচিত ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিব বলিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সংগে দেখা করিতে গেলাম। মাকে ছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান হয়ে আসবে, কত বড় চাকুরি করবে! মনে থাকবে তো খুড়ীমার কথা?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলব না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছিস্ ভুলবি নে কখনও পাবু?

জোর গলায় বলিলাম—কক্ষনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সজল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যিই বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতে হইল বাবার কড়া হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম? মাস ছয়-সাত পরে গরমের ছুটিতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-একবার খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের কাহারা ঢাকদায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে—ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহনা ইত্যাদি। আরও একবার ফার্স্ট ক্লাসে পড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমার সংগে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি ফেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এ-সব। কিন্তু এ-সব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার তো মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক্, এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আছে! তা নয়। আমার মনের সংগে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিন্তু খুব

সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় তো হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল! খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এ-খবর কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটি কি কাঁচরাপাড়া স্টেশনে গাড়ী আসিলেই কতবার ভাবিয়াছি এই সব জায়গায় কোথায় হয়তো খুড়ীমা আছেন। নামিয়া কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপল্লীর সহিত তাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই কোনদিন। কেন, তাহা জানি না, বোধ হয় বাল্যে কাঁচড়াপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার কারণ আছে। আমার মনে এ-কথা কে যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। যে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়া ফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান তাহাকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধ হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নূতন ভালো-বাসা নূতন মুখ, নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনের অতি-মধুর হাসি ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হইল, কত নূতন মুখের হাসিতে দিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবন এ-রকমই হয়। একদিন যাহাকে না দেখিলে বাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাহার নামটাও আর মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই ওলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-হৃদয়ের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবানই রাখিয়াছেন।

কিসে জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কতকাল চলিয়া গিয়াছেন। পঙ্গপালও আর কখনও তার পরে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিম-গাছটি এখনও আছে। বেশি দিনের কথা নয়—বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়েদের বাড়ী জমিজমা সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটায় নজর পড়াতে কেমন অন্য-মনস্ক হইয়া গেলাম। বহুদিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা। পরক্ষণে দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের এক হাস্যমুখী বালিকার কৌতুক ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলক্ষিতে মনটা এমন একটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল যে দলিলের আলোচনায় আর কোন উৎসাহই খুঁজিয়া পাইলাম না, দেখিলাম, খুড়ীমাকে তো এখনও ভুলি নাই।

বয়স হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠার-উনিশ বছর বয়স ছিল খুড়ীমার! কি ছেলে-মানুষই ছিলেন!

মানুষের মনে মানুষ এই রকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বীথিপথ বাহিয়া কত নববধূ গ্রামে আসিয়াছেন, গিয়াছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছর আগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিস্মৃতা হতভাগিনী তরুণী বধূটি আজও সেই গ্রামে বাঁচিয়া আছেন।

বায়ুরোগ

হাঁসখালি থেকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গিয়েছে, ঐ রাস্তা বেয়ে যাচ্ছিলুম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী। বগুলা স্টেশনে নেমে সোজা পাকা রাস্তা। দুপুরের পর একাই হেঁটে চলেছি, পথে বড় একটা লোকজন নেই, বৃষ্টির দিন, আকাশ মেঘান্ধকার, জোলো হাওয়া বইছে, রাস্তার দু'ধারের বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে, দিনটা ঠান্ডা, রাস্তা হাঁটবার পক্ষে উপযুক্ত দিন বটে।

ডোমচিতি, গোয়ালবাগি ছাড়িয়েছি। রাস্তার দু-ধারে ঘন বন বাগান। আরও আট-দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। একটা বাঁধানো সাঁকোর ওপর বিশ্রাম করব বলে বসেছি, এমন সময় আর একজন পথ-চল্‌তি লোক এসে আমার সামনের সাঁকোটাতে বসল। খানিকটা বসে সে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর একটু সঙ্কোচের সুরে বল্‌লে—বাবু আপনার কাছে দেশলাই আছে? তারপর দেশলাই নিয়ে বললে—আমার সঙ্গে তামাক আছে। একটু তামাক সাজব, খাবেন?

বললুম—না দরকার নেই। আমি—

লোকটা যেন দুঃখিত হ'ল। বললে—না কেন বাবু, খান না? আমি সেজে দিচ্ছি। এমন সুরে বললে যে, আমার জন্যে তামাক না সাজতে পেয়ে তার মনে যেন সুখ নেই। একটু অবাক্ হয়ে দেখলুম ওর দিকে, চিনিনে শুনিনে কোনো কালে, আমি তামাক খাই না খাই তাতে ওর কি আসে যায়?

অগত্যা বললুম—সাজ—

এইবার তাকে ভালো করে দেখলুম! বয়েস ত্রিশের মধ্যে, মুখশ্রী কাঁচা, লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা খাকির সার্ট। কিন্তু ওর চোখ দু'টো এত শান্ত ও এত নিরীহ যে, দেখলেই তার ওপর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসে না। একটা ভাঙা ছাতি আর একটা বোঁচকা ওর সম্বল, ধরন-ধারণে নিছক খাঁটি ভবঘুরে।

দুজনে একদিকেই পথ চলতে আরম্ভ করলুম তারপর থেকে। মামুদপুরের বাজারে এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটি মুদীর দোকানে রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিলুম দু'জনেই —কারণ সবাই বললে,—এখন দুর্ভিক্ষের সময়, সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটা নিরাপদ নয়। অনেক সময়, সামান্য পয়সার জন্যে মানুষ খুন করছে।

আমার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, নদীয়া জেলাতেই কোন্ গ্রামে বাড়ী, সংসারে কেউ নেই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। বছরখানেক পথে বিপথে ঘুরবার পরে সম্প্রতি নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

একটা স্বভাব দেখলুম তার, সাধারণের পক্ষে স্বভাবটা খুব অদ্ভুত বলতে হবে। লোকের এতটুকু উপকার করতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কাছের লোককে কি করে খুশি করবে, এই হ'ল তার জীবনে মস্ত বড় একটা নেশা!

রাত্রে সে-ই রান্না করলে। আমায় এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত করতে দিলে না।

খেতে বসে আমি বুঝলুম লোকটা পাকা রাঁধুনি। পাকা রাঁধুনি বললে সবটা বলা হ'ল না। রান্নার কাজে সে একজন শিল্পী। উঁচুদরের প্রতিভাবান শিল্পী। সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলাম তার রান্না খেয়ে।

বললাম—কোথায় শিখলে হে এমন চমৎকার রান্না?

ও বললে—কেউ শেখায় নি, এমনি হয়েচে।

—তুমি কলকাতায় কি অন্য কোথাও মোটা মাইনের চাকুরি পেতে পারো হে, রান্নায়

কাজে। ধরো কোন বড়লোকের বাড়ীতে। এ রকম ক'রে বেড়াও কেন?

সে হেসে বললে—তাও করেচি। কিন্তু আমার একটা বাতিক আছে বাবু। সেজন্যে আর কোথাও চাকরি স্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। সে কথাটা খুলে বলি তবে। সেটাকে একরকম রোগও বলতে পারেন। হয়তো বা বায়ুরোগ।

আমি ম্যাট্রিক পাস করে ভেবেছিলুম আরও পড়বো, কিন্তু অবস্থা খারাপ ছিল ব'লে পড়ার খরচ চালানো গেল না, সুতরাং ছেড়ে দিতে হ'ল।

তারপর চাকরির সন্ধানে বেরুই। সিংভূম জেলার একটা পাহাড়ে ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় খনিসংক্রান্ত কি জরীপ হচ্চে। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে জুটলাম। মস্ত বড় মাঠে অনেকগুলো তাঁবু পড়েচে, অনেক লোক। আমি একজন ওভারসিয়ারের তাঁবুতে রাঁধুনীর কাজ পেয়ে গেলাম। লোকটির বয়েস চল্লিশের ওপর হবে। একাই থাকে, একটা ছোকরা চাকর ছিল, আমি যাবার পরে তাকে জবাব দিয়ে দিলে।

কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর মনিবের প্রতি আমার একটু অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা লক্ষ্য করলুম। কিসে সে খুশি হবে, কিসে তাকে তৃপ্তি দিতে পারব খাইয়ে, এই হ'ল আমার একমাত্র লক্ষ্য। সে জিনিসটা একটা নেশার মত আমায় পেয়ে বসল। সেই জংলী জায়গায় খাবার জিনিস মেলে না, আমি হেঁটে দূর দূর গ্রাম থেকে মাছ তরকারী বহুকষ্টে সংগ্রহ ক'রে এনে রাঁধতাম। মনিবকে সকল কথা খুলে বলতাম না যে, কোথা থেকে কি জিনিস আনি। রান্না যতদূর সম্ভব ভালো করবার চেষ্টা করতাম, যাতে খেয়ে তৃপ্তি পায়।

লোকটা যে ভালো লোক ছিল, তা নয়। মাইনে বাকি ফেলতে লাগল, বাজারের পয়সা চুরি করি, এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে করতো। আমি সে সব গায়ে মাখিনি কোনোদিন। চার মাস এই ভাবে কাটল। এই চার মাসে আমার অন্য কোন ধ্যান-জ্ঞান ছিল না, কেবল কি করে মনিবকে ঠিক সময়ে দু'টি খেতে দেব এবং ভালো খেতে দেব।

কিরকম—দু'একটা উদাহরণ দিই।

একবার শুনলাম মুংলী বলে একটা পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সাঁওতালরা বড় চিংড়ি মাছ ধরবে। মাছ জিনিসটা ওদেশে বড় দুর্লভ বস্তু। টাকা-পয়সা ফেললেই পাবার জো নেই। চিংড়ি মাছ আনবার জন্যে ভয়ানক পাথর-তাতা রৌদ্রের মধ্যে—সাত মাইল চলে গেলুম এবং মাছ নিয়ে ফিরে এসে রান্না করে খাওয়ালুম মনিবকে। সে কথা বললুমও না যে কোথা থেকে মাছ এনেছি।

চার মাস পরে রান্নার খ্যাতি ও প্রভুভক্তির কথা জরীপের তাঁবুর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সে দেশটাতে ভালো বাঙ্গালী রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সকলেই আমার মনিবকে বেশ একটু হিংসের চোখে দেখতে লাগল, ক্রমে আমার কাছে চুপি চুপি লোক হাঁটতে শুরু করলে আমায় ভাঙ্গিয়ে নেবার জন্যে। বেশি মাইনে দিতে চায়, নানারকম সুবিধে করে দিতে চায়। আমি কিছুতেই গেলাম না। জরীপের হেড্ কানুনগো কুড়ি টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে চাইলে, আমি তখন পাই মোটে সাত টাকা। কিন্তু টাকার সুবিধের কথা আমার মনেই উঠল না। আমার মনিবকে তো আমি এ সব কথা কিছুই বলতাম না।

মাস পাঁচ-ছয় পরে কি জানি কেমন কুবুদ্ধি হ'ল মনিবের, আমায় অকারণে বকুনি গালাগালি শুরু করলে। আগেও যে একেবারে না বকতো এমন নয়, কিন্তু তাতে মাত্রা থাকতো। পুরনো হওয়াতে মনিব বোধ হয় ভাবতে লাগল আমার আর যাবার জায়গা নেই —কাজেই কারণে অকারণে গাল-মন্দ ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

একদিন মনিব আমায় ডেকে বললেন—শোন এদিকে। আলুতে বালি দিয়ে রাখোনি কেন? সব যে কল্ বেরিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েচে—

সন্ধ্যার কিছু আগে। আমি আধ মাইল দূরবর্তী দোকান থেকে সবে-মাত্র তেল, মশলা কিনে ফিরে এসেচি। বললাম—বালি তো দেওয়াই ছিল, বর্ষাকালে বালি দিলেও কি কল্ বেরুনো সামলানো যায় বাবু?

মনিব হঠাৎ চটে উঠে বললে—কি! পাজি, র‍্যাস্কেল, আমার সঙ্গে মুখো-মুখি উত্তর?

ব'লেই আমায় মারলে দু'টো চড়। তারপর গটগট করে বাইরে চলে গেল।

আমার হাত থেকে তেলের বোতল প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল। মারের চোটে ও অপমানে কান লাল হয়ে উঠল। সেখানে বসে পড়লুম এবং অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন এবং আমিও তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম যে, মনিবের ওপর রাগের পরিবর্তে আমার উল্টে একটা করুণার উদ্রেক হ'ল। ভাবলুম—আহা, লোকটা জানে না যে, ওর নিজের দোষে এবার আমি হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছি। হেড্ কানুনগোর তাঁবুতে খবর পাঠাবার অপেক্ষা মাত্র। কানুনগোর সঙ্গে যে আমার মনিবের সদ্ভাব নেই, তাও সবাই জানে। খেও কাল থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে—এখানে আর বাঙ্গালী রাঁধুনী মিলছে না।

এই কথা যতই ভাবি, ততই ওর উপর করুণা ও অনুকম্পা গভীর হয়ে ওঠে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! ভগবান আমার বুকে এসে যেন তাঁর আসন পেতেছেন। ওকে আমি ছেড়ে গেলে ওর কত কষ্ট হবে এবং বিশেষ ক'রে লোকটা কি বোকাই বনে যাবে—এই ভেবেই আমার মন গলে গেল। নিজের অপমান ভুলেই গেলাম একেবারে।

রাত আটটা যখন বেজেচে, তখন আমি উঠে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলুম। তার আগেই ঠিক করে ফেলেচি আমি মনিবকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ঘোড়ার সইস্‌টা কিন্তু আড়াল থেকে আমার মার খাওয়াটা দেখেছিল। সে গিয়ে সবাইকে গল্প করেচে। ফলে সকাল থেকে এক হেড্ কানুনগোর কাছ থেকেই আমার কাছে পাঁচবার লোক এলো আমায় ভাঙিয়ে নিতে।

তিন চার দিন ধ'রে তারা সবাই আমাকে বিরক্ত করে মারলে। মনিব কাজে বেরিয়ে গেলেই তারা আসে। হেড্ কানুনগোর লোক এবং আরও লোক। কতরকম লোভ দেখায়, মনিবের বিরুদ্ধে আমায় রাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে।

হেড্ কানুনগো বাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তিনি ঘোড়ায় চেপে কাজে বেরিয়েছিলেন। আমায় দেখে বললেন—ওহে শোনো, আমার লোক তোমার কাছে গিয়েছিল?

বললুম—আজ্ঞে হাঁ!

—তা তুমি আসতে রাজী হও না কেন? শুনলাম সেদিন তোমায় মেরেচে। ছিঃ ছিঃ—কি বলে তুমি সেখানকার ভাত এখনও মুখে তুলচো? চলে এস ওবেলা থেকেই আমার ওখানে! কি বল?

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলুম। স্বয়ং হেড্ কানুনগো বাবু। তাঁকে 'না' বলি বা কি করে, এ তো আর উড়ে চাকর বা আরদালির দল নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললুম—হুজুর আজই যাব আপনার ওখানে। দেখুন না, মিছিমিছি সেদিন অমনি মার দিলেন—

—কি, হয়েছিল কি?

—কিছু না, ওঁর সোনার বোতামের সেটটা আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পাই। পেয়ে নিজের বাক্সে তুলে রাখি। ভেবেছিলুম এলে দিয়ে দেব। তারপর আর মনে নেই সন্ধ্যেবেলা। উনি এদিকে পরদিন সকালে বোতাম হারিয়েচে বলে খুব তোলপাড় করচেন বাসা। আমি তখন গিয়েচি দোকানে। সে সময় উনি আমার তোরঙ্গটা খুঁজে বোতাম দেখতে পেয়েছেন

সেখানে। তাই আমি দোকান থেকে আসতেই বললেন—রাস্কেল, তুই চুরি ক'রে রেখে-ছিলি বোতাম তোর বাক্সে। এই বলেই মার। কিন্তু হুজুর বাস্তবিক আমি চুরির মতলবে—

কানুনগোর মুখের ভাবে ক্রমশ পরিবর্তন হতে লাগল, ঘুঘু লোক, বেশ বুঝলেন আমি চুরির মতলবেই সোনার বোতাম তোরঙ্গে রেখেছিলুম। এমন লোককে কে বাসায় স্থান দেবে? তিনি 'হুঁ' 'হাঁ' 'তা বটে' বলতে বলতে সরে পড়লেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, 'দুএকদিনের মধ্যেই, যে আমি মনিবের সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলুম, তাই ধরা পড়াতে মার খেয়েছি। আর আমায় কেউ ভাঙ্‌চি দিতে আসে না। জেনে শুনে চোরকে কে কাছে রাখতে চায়?

মনিব একদিন আমায় বললে—এ কি শুনচি? তুমি কানুনগো বাবুর কাছে বলেচ সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলে বলে তোমায় মেরেছিলুম সেদিন? কেন এ কথা বললে?

বললুম সব কথা খুলে। ওরা ভাঙ্‌চি দিতে আসে, বিরক্ত করে সর্বদা, না ব'লে উপায় কি? ও কথা না বললে কি আমার নিস্তার ছিল?

মনিব বললে—তুমি অদ্ভুত লোক। এমন লোক আমি কখনো দেখিনি। আমায় ছেড়ে যেতে হবে বলে নিজের নামে নিজেই একটা মিথ্যে অপবাদ রটালে? এ তো নিজের ভাই করে না, ছেলে করে না। তুমি রাঁধুনীর কাজ কোরো না, সাধারণ লোক নও তুমি। তোমাকে রাঁধুনী করে রেখে দিলে আমার অপরাধ হবে।

তিনি যদিও সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা সর্বৈব মিথ্যে, কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। মনিবকে কত বোঝালুম, ছেড়ে যেতে চাইলুম না। তিনি হাতজোড় করে মাপ চাইলেন, বললেন—আমায় অপরাধী করো না, তুমি আমার রাঁধুনীর কাজ করবার লোক নও। যা হয়ে গিয়েছে তার চারা নেই—আর আমি সজ্ঞানে জেনে শুনে তোমায় দিয়ে চাকরের কাজ করাতে পারব না।

সেখানে চাকরি তো গেলই, যদিও এদিকে মনিব সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা মিথ্যে, কেউ সে কথা বিশ্বাস করলে না। সবাই ভাবলে চুরির জন্যে আমার চাকরি গেল।

আসবার সময় মনিব তাঁর ঘড়ি-চেন এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন। এই দেখুন সেই ঘড়ি-চেন। কিন্তু সেই থেকে মনে কেমন একটা কষ্ট হ'ল, পথে পথে বেড়াই। আর কারো বাড়ী রাঁধুনীর চাকরি নিইনি। নেবও না।

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওপারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

এ অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পুজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল।.....

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধোঢাকা চতুর্দশীর জ্যোৎস্না চিক্‌মিক করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্নগাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।.....বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাকলেও আমি ছই-এর বাইরে ব'সে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম.....বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ-পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হল। খালের দু'পাড়ের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই ; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছই-এর মধ্যে। এসব জঙ্গলে—বুঝলেন না?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তাঁরই লঞ্চে ক'রে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেই সব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে ব'লে উঠল—বাবু, একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হ'ল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দু'ধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্যন্ত চুপ করেছে।.....সঙ্গীকে বললুম—মশায়, এই তো সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না তো নৌকোর ওপর?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য হবো!

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছই-এর মধ্যে ঘেঁষে বসলুম। খানিকটা ব'সে থাকবার পর সঙ্গী বললে—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ ক'রে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে ব'লে মনে হ'ল না ; ভাবলুম, তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।.....তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—গ্রামোফোন? এ বনে এত রাত্রে গ্রামোফোন বাজাবে কে? কান পেতে শুনলুম—গ্রামোফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্তকরুণ সুরে কি বলছে।.....খানিকটা শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট, অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পেঁছিয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হ'ল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল..... তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাঁটার জল কল্‌কল ক'রে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া-ঝোপে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলাম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে ব'সে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম ; তারপর আবার ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বন-ভূমির কোন্ অংশ থেকে সুস্পষ্ট অতি উচ্চ আর্তকরুণ ঝিঁঝি পোকার রবের মত তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল—ওগো নৌকাযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ.....আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম.....আমাদের ওঠাও ওঠাও..... আমাদের বাঁচাও।

নৌকোর মাঝিটা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায়, ও মশায়, উঠুন উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁষে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল। বললে—আল্লা! আল্লা! শুনতে পেয়েছেন বাবু?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি মশায়? ডাকলেন কেন? কোন জানোয়ার-টানোয়ার নাকি?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছই-এর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া ক'রে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ.....ভাঁটার জল নৌকোর তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।.....

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি তবে.....

মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু, বাঁয়েই কীর্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথা-কার!.....

মাঝি বললে—তিনজন আছি ব'লেই রেখেছিলাম বাবু। ভাঁটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথাবার্তার ধরণ শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু

জানেন নাকি?

ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন—ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্। আলো জ্বেলে ব'সে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে, হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও দুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সঙ্গী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় ব'লে আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই ব'লে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে ব'সে সঙ্গীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

তিন শ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারভুঁইয়ার দুই প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দ্বীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে ব'সে থাকত।

সে সময় এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় ক'রে গড়তে হ'ত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট করা রূপ অসৎ কার্যে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়দের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশী ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী বন্ধু।

সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মতন স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু'একদিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর-প্রকৃতি। বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ-পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের

মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান ক'রে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানাজায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন।.....তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হ'তে লাগল, যা কোন কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়।.....তরল-মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার-জর্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হ'লেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন —দু'দিনের জন্য এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত ক'রে তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আসবে না।

দিন-কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল। নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি ক'রে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজ্‌রায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী ব'লে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত-দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে ব'সে চৌকি দেবে—বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজ্‌রা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জল-দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল। তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝক্ করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোনো নৌকো ছিল না—যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র—সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। নরনারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নর-নারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ঊরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞা-শূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হ'লে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে।.....খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র ব'লে মনে হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক'দিন আরো ক'রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্মম মৃত্যু!.....

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন-দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল।..... তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধা-কাতর দেহ প্রসারিত ক'রে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।.....প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না—হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে

তাঁর বন্ধু পত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত? কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়।.....

নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্তিনী, ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খাল-ধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতেবোনা থলি বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে থেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শীগ্‌গির পারো পালিয়ে যাও।

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্তমানে কীর্তি রায়ই দনুজমর্দনদেবের বংশ-ধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্যসামন্ত কীর্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন? কীর্তি রায় যে মাথা নাচু ক'রে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর একপাশে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখে সে চটুল হাস্যরেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ-কোমল হয়ে এসেছে। তাঁদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাঁটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্‌ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে।.....নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুরঠাকুরের কীর্তি। এই জন্যে তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। গৌড়-টৌড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি। খিড়কি গড়ের পাইক সর্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই .....

নরনারায়ণ বললেন—বৌ-ঠাকরুণ, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এলে।

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ভাই, বলতে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন ব'লে যদি রাখ.....

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বৌ-ঠাকরুণ?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—তুমি আমার কাছে ব'লে যাও ভাই যে শ্বশুরঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না?

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাকরুণ, তোমার কাছে ব'লে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, তুমি ফিরে যেতে পারবে তো?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যত দূর পার সাঁতরে গিয়ে তার-পর ডাঙায় উঠে চ'লে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে প'ড়ে মিলিয়ে গেলেন.....

লক্ষ্মী দেবীর প্রতিষ্ঠা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দু'খানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জ'মে গেল—সর্বনাশ! এরা কি তবে জানতে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্তি রায় বুঝতেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে তো তাকে কেটে ফেলাই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল।.....পরদিন আবার দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।.....

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে ব'সে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু'ধারের মুখ বন্ধ ক'রে কীর্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাসরোধ ক'রে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ ক'রে রইলেন।.....এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল.....বাশুন্তার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চণ্ডলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হ'ল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে.....মনে হ'ল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্না-ধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল-সুন্দর শ্রী...নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নব-মল্লিকার মতন ফুটে উঠেছে।.....নরনারায়ণ রায়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্বপুরুষের সেই বর্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন —আমার অপমান আমি এক রকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাকরুণ, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোর রাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, সুলুপে, জাহাজে ভ'রে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্তি রায়ের প্রাসাদ দুর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্তি রায় শুনলেন, আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে, পুরা বহরের বাকি অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্তি রায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্য। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধ'রে শত্রুতা চ'লে আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্তি রায়ের

কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও কীর্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস্ সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা সুলুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্ দু'খানা কামান-বাহী সুলুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু —মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর কর্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারলে না। কীর্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্বল ছিল না, কীর্তি রায়ের গড় থেকে পর্তুগীজ জল-দস্যুদের আড্ডা সন্দ্বীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্তি রায়ের নৌ-বহর সুদৃঢ় ক'রে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।.....নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে প'ড়ে, কীর্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্তি রায়ের গড়ের উপর চক্রাকারে ঘুরছে.....হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু-পত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল—তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন তখনি ভরে উঠল।.....তিনি করেছেন কি! এই রকম করে কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন?.....

নরনারায়ণ রায় হুকুমজারি করলেন—কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস্ গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পর্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুঠপাট করতে গিয়ে দেখলে মূল্যবান দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লুঠপাট চলল.....কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্ণে কেবলমাত্র দু'খানা সুলুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চলে গেলেন।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে, পর্তুগীজ জলদস্যুর দল লুঠপাট ক'রে চ'লে গেলে, কীর্তি রায়ের এক কর্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিনলে—লোকটি কীর্তি রায়ের পরিবারে এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী। তাঁর মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝলে কীর্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার

সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না।.....কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট ক'রে বলবার আগেই আহত লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

এই রকমে কীর্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হল না.....সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বতপ্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিত কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলোকাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইঁটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙ্গা থামের অংশ—বারভুঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে, বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা-কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বন-ভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে.....সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে.....তখন খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা ওগো নৌকাযাত্রীরা.....আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম.....দয়া করে আমাদের তোল.....ওগো আমাদের তোল.....

ভয়ে বেশী রাত্রে এ-পথে কেউ নৌকো বাইতে চায় না।

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩১

বউ-চণ্ডীর মাঠ

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকো ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও.....

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল সরে গিয়ে একটু একটু করে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন খোলা হয়েছে? যত শীগ্‌গির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়.....

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিছনের নৌকো থেকে

লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলের সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটি নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল—বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙ্গায় নৌকো লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক শুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম—Tenancy Act কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়.....

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ লতানো গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া কটা ঘাসওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌কিচ্‌ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতার ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বন-মূলোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।.....

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকোখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুল-পুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই? সামনের এটা, না ওই পাশে?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হ'ল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন? আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হ'তেও তো পাঁচ ছয় মাস.....

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী.....

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পুজো দিতে আসে, বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নইলে মেয়েদের একটু অসুবিধে.....

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত শুরু ক'রে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করেছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরণের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চক্কত্তি মশাই? আপনাদের কি কোন.....

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই, বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোক এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাঁদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাঁদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ব'লে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী দলের সামনেও ঘোমটা দেয়; সকলে বললে, যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁষ নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্যই এ রকম করে! ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে কোন পুরুষ-মানুষ দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সেদিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়, সে জনেজনের পায় প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝ মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ করে দিল। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ী সুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল; সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম ক'রে আর পাঠিও না.....তোমাদের পায়ে পড়ি।.....

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হয়ে গেল।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গবে—নইলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাগ লাগে?.....ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে

গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায়নি। তখন সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে ; পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্য কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়াচাড়া চলল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠান্ডা হ'ল। এই মাঠের পুবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইত—ম'জে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরীদের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্যন্ত বংশে একজন কে ছিল, উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর-আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।.....কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠছে।.....সমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে সাদা কাপড় প'রে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে—তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে।.....মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলেভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু ক'রে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে.....তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে।.....

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উলো-চন্ডীতলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামবধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চন্ডীর পুজো দিতে আসে। বউ-চন্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতির স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পুজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পুজো মানত করবার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন।.....

চক্রবর্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুর্ সুর্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে দূরে একটা পুরনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকোর গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্য-বধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ

ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।.....পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন অপরাজিতা ফুলের রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়.....ছাতিম বনের পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হু-হু ক'রে হাওয়া বয়.....সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পূব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত!.....

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল—সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা দেওয়া ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা-কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত!.....

বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪

আরক

লাহোর মিউজিয়ামে যখন চাকরী করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত "দেশবন্ধু" কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে তিনপুরুষ পূর্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুরে যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দু'পেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূম-পানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বল্লাম—মিঃ সিং, আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত?

মিঃ সিং গম্ভীর সুরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হ'ত না। সে বড় আশ্চর্য ঘটনা।

—আমি বল্লাম—কি রকম?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় সৌখীন মানুষ ছিলেন—আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংহের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ!—এক দম। কেন তিনি উন্মাদ হ'লেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সে কথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিংহ তাঁর অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে। তাঁর দু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া! একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তা'তে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর খেয়াল হ'ল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাঁকে সেখানেই বালুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদা চেয়ে দেখলেন বালুর চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরণের কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি—চক্রাকারে ঘুরচে! কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল ওরা যেই হোক্, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা দু'জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনি নি। হয়তো এ'দের মত্ত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনও নি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে এ'কেবে'কে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশী উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হ'ত

ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে' বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হ'ল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে না—শুধু বল্লে জায়গাটা ভালো নয়! ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে,—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আড়ৎ ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারী করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এ সব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈচৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরণের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সে রাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন! ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেবো—

—মাপ করবেন, হুজুর। এক শো রুপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখি নে—এই হাতে তীরে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্যতাপে চক্ চক্ করচে। জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময় ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মত তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন, হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পূবের পাহাড় ডিঙিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা

দ্বিতীয়ার। দুদিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি রহস্যময় হয়ে উঠেচে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হ'লেও তাঁর যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্না-লোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মত পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দু'শো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি। এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা, বা আরও হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্যের মত গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েচেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিষ্টার ব্যানার্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বল্‌চি বানিয়ে, অন্তত এটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মত নয়—অনেক বড় অনেক—অনেক বড়। হাঁসের মত তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হ'ল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মত চেহারা বিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা। পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামলো এবং হাঁসের মত সাঁতার দিয়ে, তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত চকিত, দুঃসাহসী, আরকসেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্‌ করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মত সুঠাম ধরনে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না। কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে।

সেখান থেকে পেঁছিলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈজি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বলেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেন নি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্যহংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

এদিন তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরী নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি নে ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চল্লেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্যহংসের মত সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পেঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজি ঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভাল হতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভাল অবস্থায় বাড়ীতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয় অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তাঁর মোটেই ভাল অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বললেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সবাই বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশ-পরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যে। তখন আমার জন্মই হয় নি।

শারদীয়া মৌচাক, আশ্বিন ১৩৪৯

হাসি

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধুতে বেশ ক'রে র‍্যাগ টেনে নিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলা দেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে—ওহে, তোমরা যা বোঝো করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি.....

দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীক্ষ্ণ শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢুকতেই আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম.....রমেন ততক্ষণে চলে' গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াসা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে র‍্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়েছিল, হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে—দেখ, আমার কিন্তু একটা Uncanny Sensation হচ্ছে, কেন বল তো?

আমি বললাম—কি ভাবের Uncanny? ভূত টুত?

সে র‍্যাগ খুলে ফেলে ইজি-চেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে—তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন.....

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে—বিচিত্র নয়। আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই ছিলেন—সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে পড়ে আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষরাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ক্ষুর বার করে নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে—তারপর কি হোল তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিংরুমের বাথরুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়র কি জন্যে একবার ঠিক ওই ভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার.....

আমরা সকলে আমাদের বাথ-রুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে, লাইনের ও-পারে কেবল স্টেশন-মাস্টারের কোয়াটারটা এবং লেভেল-ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিংরুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চা-এর দোকান। দিনমানে এমন কি.....সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তার পর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই—দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

গল্প ভাল করে জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে—দেখছো? Where there is a will, there is away। বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই? স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন—বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙালী, চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন.....

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে—এই যে মিত্তির-মশায়,—আসুন অসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—ইনিই এখানকার স্টেশনমাস্টার হরিদাসবাবু। আসুন

বসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতলশূন্য বেতের কেদারাটাতে আমাদের সকলের উদ্দেশে অভিবাদনের জন্যে হাত উঁচু করে গরুড়ের মত বসে আছেন। মিত্তির-মশায়ের বয়স পঁতাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে—গোঁপ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কত দিন আছেন মিত্তির-মশায়?

—আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে মেলে না, বাঙালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হোল। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম—তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর.....তা আপনারা কতদূর যাবেন সব?

—আমরা সাইকেলে দিল্লী যাবো বলে বেরিয়েছি, ও-পার থেকে আসছি কি না? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে গিয়ে গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে—ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক এখানে ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেন-ঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদানপ্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিষটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রতীপ্ত করার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমে ভূতটুত নেই তো? এ প্রশ্নের পরে সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথ-রুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হোল এবং কেউ কেউ এমন ভাবের ভান করলেন যে এ-স্টেশনের বাথ-রুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে—যত সব গাঁজাখুরি.....

হরিদাসবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে' গেলেন।

অনেকদিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো-তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পুজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হোল প্রায় একমাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরানো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-

মধু সংগ্রহ করে কিনা পাহারা দেবার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোট ও স্টীমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি!

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্নছবি মুদ্রিত আছে। তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো—শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে-দেশে যাইনি, অনেক-দিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের—বিশেষ ক'রে জ্যোৎস্না-ওঠা সুন্দর-বনের ছবি.....অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড়.....নতুন পাতা-ওঠা গাব-গাছের ও বন্য গোল-গাছের সারি.....খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ, যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল—তাদের একটা বড় লঞ্চ বড়-গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার-পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী—সবাই বাঙালী, সবসুদ্ধ সাত-আটজন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হোল, তারপর একটু গান-বাজনাও হোল। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হোল, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা-ওঠা বনের মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছিল। দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল। জোয়ারের জলে মগ্ন গোল-গাছের আনত শাখাগুলো ভাঁটার পরে একটু একটু করে জল থেকে উঠতে লাগলো.....বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ও-ধারের তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরনের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভেতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এ-সব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম বটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছই-এর ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি-একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন—আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান-মঞ্জরী পড়ছি—বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাঁটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন-গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হোল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার।.....হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হোল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে.....মাটি যেন কাঁপছে.....বোটটা যেন দুলছে!

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—সুমুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে।.....

বিনোদবাবু বললেন—কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

শব্দটা এত ক্রূর ও মর্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো—আল্লা! আল্লা! কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন—কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হোল নৌকোটা সেখান থেকে সরানো যায় কি না। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড়-গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোন মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হোল। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে আর একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি তখন নিস্তব্ধ—চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার! আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার-ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষ রাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক-বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টীমলঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে' সে-দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘরবাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল-গাছের সারি দেখে মনে হয় কোনো সময়ে সে-সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক—আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে জনহীন জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাসভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল।.....তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে।

খুঁটি দেবতা

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে। জোয়ারের

সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাঁটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটাই দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব-স্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরনো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঞ্জা দখলে আসিলেও চরটা প্রজাদের কোন উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলু-খড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারের কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা। ছই-এর মধ্যে কে?.....

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই.....

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দ্যাখো কান্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পূবদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা——

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে! ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধান করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুর যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখা-পড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইস-ম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পূবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?.....

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে

বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন ; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে? তুমি উত্তর দিকটা থেকে দ্যাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনোদিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুনা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না ; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরারা এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়।.....এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজখানি!.....

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে কড়জোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি.....

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক

চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কণ্ঠিকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত ; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে!

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ, চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।.....

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত ; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল ; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়, ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে' চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে' চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা —ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল! মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগাগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া এক-জোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা.....এগারোটা.....বারোটা.....রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা!.....রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?.....উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম.....ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?.....রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি রাতে রাঘবের চোখে একটুকু ঘুম আসিল না পলকের নিমিত্ত—রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে—আজও বোধহয় ঘুম.....

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল! রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোক-জনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা

হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে' ভাববে--আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে' দ্যাখো দিকি? আর সকাল সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। ঘুম যদি না হয়? .....পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধা-কৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা.....এক ঘণ্টা.....এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন.....বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিতেছে কেন?.....না.....এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।.....রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই —কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?.....না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?.....যাহা হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক, এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুট্‌কী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন--তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্। এখনও জন তিনেক বাকী। .....রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।.....এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র.....মিনিট পনেরো দেরী—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন।

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট?.....এ সব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়.....

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?.....ওটা কিসের শব্দ?.....বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?.....সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো

একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথায় শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?.....

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে! রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও সব মাথা গরমের দরুন.....

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর-রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।.....ঘুমান নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারার মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে.....

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা.....

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!.....

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই!.....

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে

শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও, খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি!.....

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটাকার পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপ-বিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি দেবতা সেই হইতে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

পেয়ালা

সামান্য জিনিস। আনা তিনেকের দামের কলাই-করা চায়ের ডিস-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওরা ঢুকল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল ; সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার স্বর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয় ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েছে!

উঠোনে দুখানা গরুর গাড়ী। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপ-তোশকের বাণ্ডিল নামাচ্চে। একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিস—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝরি, হাতা। খানকতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁঠাল কাঠের নতুন জল-চৌকী। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু-ভাঁড় খেজুর গুড়, আরও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন ; কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয়নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা শুরু হয়ে গেল, ওই তো হল মুশকিল! সব পালাতে লাগল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা ছ'টা মড়া ফেলছিল, পুলিস এসে বন্ধ করে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমে বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রিসিক্রী

কাঁচকলা, এখন খোরাকি, গাড়ীভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে বসে। কি ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হ'ল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্‌টা-মানপুর থেকে কে একজন, যদু চক্কোত্তি না কি নাম—একখান ছই-এর গাড়ি পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলে-মেয়ে, বৌ ঝি, সে একেবারে গাড়ি বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ি রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্তিরেই ধরল তাদের একটা ন-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ি খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সামনে, উঃ!

কাকা ভুষি-মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়িতে ফিরে আস্‌চে, কাল সকাল নাগাত পেঁছুবে। গাড়িতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

কাকা খেয়ে উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বললে, এই দ্যাখো জ্যাঠাই-মা, বাবা এনেছেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বললে—বেশ, কেমন, না? মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউবওয়েলের ব্যবসা করি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে-ওখানে বড় ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াতে হয়; বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু-চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওঁর মুখে সাবু ঢেলে দেওয়া হ'ত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারি নে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি? যত সব মেয়েলি কুসংস্কার!

পরের বছর থেকে আমার টিউবওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর-দূরান্তের পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউবওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—

বাকী সময়টুকু যায় আর-বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করে নি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন—সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্তা, কেউ কাউকে মেনে চলতে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা করতে হবে ঠিক এই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছ-মাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম, —এ-মেম্বর ও-মেম্বরকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন ওদিকেও কাজ মিটে গিয়েচে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্বদা শহরে না থাক্‌লে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউবওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখনো অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বলবেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবেন। এরা মরেনি, বোধ হয় মরবেও না কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজভাবেই সব মেনে নেয়, সব অবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউবওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটোছুটি করে, কে-ই বা কষ্ট করে? শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানি নে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হ'ল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাটল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউবওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাই নে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাই নে, শুধু টো টো ক'রে দূরদূরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এস্টিমেট কষা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামে থাকতে, আপনার লোকেদের কাছে বসে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয়তো একটু বসে ভাবতে, হয়তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষী করতে—শুষ্ক টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না।

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছিলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্ছেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে তো অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস করো; আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কামড়েছিল না, ঐ দিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল আমার মনে নেই।

আমি চমকে উঠলুম, বললুম—কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগন কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে, এ খবর আমি কাউকে বলি নি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভালবাসতেন বলেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী শিউশরণের শালীর ছেলে সে—সে-ই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনও পর্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বলছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েছে সে আর ফেরে নি। জান্‌ত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হল যেন একটা ক্রূর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু ...যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু...

পরদিন দুপুর থেকে মনুর অসুখ বাঁকা পথ ধরল, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মনুর মৃত্যুর পরে পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার

সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখনো দ্যাখো নি, তাই ধরতে পার নি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কত বার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোন উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জান্‌তে তুমি এ কথাটা?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলা-পাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে তো? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না তো?

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী? সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজন ধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনও আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাত চেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান দ্যুতিবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনও বর্তমান আছে, তাহা সেই হতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে

একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দূরান্তরের এক অপূর্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকি বাঘে গরুতে নির্বিবাদে একই ঘাটে জল পান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরীবংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বারাকপুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে বারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেই তরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত-গৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সে প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।

ইতিপূর্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রতা ও প্রচুর মকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল-সাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূর দক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিখুঁত ভাবে মকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্তক্রন্দনে নিঃশব্দরাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনও ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বাল-বিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়-স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহিরবাড়ীতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবধূ বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখীমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখী মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোন স্ত্রীলোকের বাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ-রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের সহরের তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজ্যজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্মা দিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ!

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে?...ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্।—কতদূর থেকে আসছে?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিভব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল, না—না, আমি রানী হ'তে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন।

আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথা শেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এমন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল। সেই রমণী কহিল, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার ভাল হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভাল আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তবে আমার অভিশাপ কখনও সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপনারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ঐ অবলার সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রানী শ্রীক্ষীরোদা-সুন্দরীও তাঁহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তো চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাতদিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিতে চলিলেন! অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পর-স্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখ্‌নউ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজি-কুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুরলহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলেন যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়ীতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়ীতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়িতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন।

কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই। দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন!

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার বিভীষিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শঙ্করনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি হইয়া। ইংরেজি শিক্ষার তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অবিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল; তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়ীতে খাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়া বসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোন বন্দিনী বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষহিষ্ণু চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী যেন ঐ ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শঙ্করনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতা সহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন দেবতা আবার যেন চৌধুরী-বংশের নষ্ট-সম্পদ ফিরাইয়া দেন।

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শঙ্করনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, বাছা, পথ ছাড়, আমায় যেতে দে।

শঙ্করনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয় নি?

—না। আমি রক্ত চাই!

—কার রক্ত মা?

—তোর ছেলের।

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শঙ্করনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী, এ কি পরীক্ষা তোর! তখনও তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শঙ্করনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীরপদক্ষেপে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাঁহার পুত্র মাতার স্তন্যপান করিতেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শঙ্করনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল; কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে, এই সান্ত্বনায় পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল?

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন, ওগো, কথা কও, কথা কও! আমার খোকাকে এনে দাও!

শঙ্করনারায়ণ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হৌক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কুলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজও পর্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনও সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও

এমনি ঝড় উঠিয়াছিল ; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ঐ শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছ-টার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।

বৈদ্যনাথ

তিনদিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরনের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না—কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া তেম্‌নি। রাস্তায় রাস্তায় জল বাঁধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো, দোকানে দোকানে সাম্‌নের দিকে তেরপল ফেলা, পথেঘাটে লোকজনও খুব বেশী চলাফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভাল লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম।

বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা,—ও দাদা—দাদা শুনুন—

আমাকেই ডাকিতেছেন নাকি? ফিরিয়াই চাহিয়া দেখিলাম। যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো ষোল বয়স, পরনের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁক্‌ড়া, খালি পা ; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিনতে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও! সেজ মামার ছেলে বোদে! এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আর দেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ্‌ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ি হইতে পলাইয়া হুগলীতে কোন্‌ যাত্রার দলে ঢোকে, বছর খানেক খোঁজখবর ছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিং পত্র পাওয়া যায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কায়েমী সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাটা শুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন। সেযাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়িও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছরখানেক ঘুরিয়া বোদে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়ি আসিল ও সৎমায়ের কাছে জমা রাখিল। অত বড় ছেলে বাড়ি বসিয়া খায় ও দু'তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তার পরদিন এক টাকা। চুল ছাঁটিতে হইবে, শার্ট তৈরী করিতে দিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চারি-পাঁচ টাকা লাগে। তাছাড়া চা, বাবুগিরি, সাবান, কলিকাতায় যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল, বাকীটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত শখের খরচ যোগাইতে ব্যয়িত হয়। সেজ মামার সংসারে অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও দু'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজমামা স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংস করিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজমামার বাড়ির (শ্বশুরবাড়ির গ্রামেই সেজমামা ইদানীং বাস করিয়াছিলেন) কাহার পকেট হইতে টাকা

চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর-দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা—বন্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে। বন্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বন্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজচিস্ কেন? আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা? শ্রীরামপুরে যাস্ নি আর?

শ্রীরামপুরেই মেজমামার শ্বশুরবাড়ি।

বন্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।—না দাদা, সেখানে বাবা বাড়ি ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকা রোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়ায় কে? গেছলুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নৈলে কি আমি না খেয়ে মরবো? মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। এ রকম কোরে ক'দিন কাটে? সতেরোই আষাঢ় বাড়ি থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম—এ ক'দিন ছিলি কোথায়?

—গাড়িতে গাড়িতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লী এক্সপ্রেসে গেছ্লুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুর্‌চি ক'দিন—আমার তো আর টিকিট লাগে না। ধরবে কে? এ গাড়িতে চেকার এল, ও গাড়িতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বল্লুম, গরীব ভিখারী, পয়সা নেই। বল্লে নেমে যাও। নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেনে আবার চড়লুম। গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি।

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর মামার বাড়ি যাস্ নে কেন, শুনেচি তাদের নাকি বেশ অবস্থা ভালো?

—ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ি গেলুম। বড় মামা বল্লে—এখানে কি জন্যে এলি? দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের? তুই আর এখানে আসিস্ নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বন্দিনাথকে কিছু খাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়। মনে কষ্ট হইল—ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটে আশ্রয়-অভাবে আজ দিল্লী, কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মত সবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্যন্ত! বেচারী তবে যায় কোথায়? বলিলেই তো হইল না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুই রাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বাড়ির ছেলের মতন থাকবি, কোন কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বন্দিনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম—পথে যদি দরকার হয় রইল তোর কাছে।

শনিবার রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বন্দিনাথ বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-

যত্ন পাইতেছে। কাপড়-জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে, বন্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ' আনা ছাঁটা, বেশ টেরী কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি, বন্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন্—দিন্ না?...

আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরের মেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট ভাইঝি হয়—তার জিনিস কাড়িয়া লইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে! পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর কাকাকে দে—তোর জন্যে এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেবো'খন। কেমন তো?

পাঁচী আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বন্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বন্দিনাথ বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সকলকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছে হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠে জলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্য বাড়িতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেহ বকুনি, মার-ধর করে—এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বন্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম—ওদের কথায় তোর থাক্‌বার দরকার কি রে বোদে?... ওরা যা খুশি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বন্দিনাথকে বাড়িতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বন্দিনাথ কোথায় দেখ্‌চিনে যে?

শুনিলাম সে বাড়িতে প্রায় থাকে না, দু'বেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র, স্টেশনের কাছে—কোন্ পাঁউরুটির দোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিনরাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল—আমার সে সাবানখানা বন্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি না দিস্ তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া চা খাইতেছি—বন্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে। বন্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক্, দুষ্টুমিই করুক আর যাই করুক, বাসার একটু-আধটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্ছে। বয়েস কম, দুষ্টুমি একটু-আধটু করেই থাকে!

দু'তিন দিন পরে বৌদি আবার কতকগুলি অভিযোগ বন্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওই কথাই আমি বলিলাম। বৌদি বলিলেন—কবে কোন কাজ করে ও? কে বলেছে তোমায় ঠাকুর-পো? শুধু খাওয়া আর পাঁউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এ ছাড়া আর কি কাজ ওর?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তো সেদিনও তুমিই ওকে বাজার করতে দিয়েছিলে, আলু না কি—এর আগেও তো অনেকবার—

বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি! কবে—কৈ আমার তো মনে হয় না, কে বল্লে?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে? আচ্ছা দাঁড়াও, ভজিয়ে দিচ্চি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বন্দিনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বৌদিদি বলিলেন, তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বন্দিনাথকে কখনও কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বন্দিনাথ এটা-ওটা বাড়ির ফরমাশের ছুতায় আমার নিকট হইতে দু' আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ ছোকরা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মশগুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবা বাড়িতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায় কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেনে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখন পর্যন্ত বন্দিনাথ বাড়ি ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ি আসিলাম মাসখানেক পরে।

বন্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজার অল্পই দেরি, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড়-চোপড় কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে? হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশী। বাড়ির ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দসই জিনিস কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে, কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বন্দিনাথ আর্জি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই, জুতা চাই, শার্ট চাই, গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন? থাক এখন, পূজোর পর দেখা যাইবে। দু'জোড়া কাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা শার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই? পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আস্‌চে শনিবার চীনে বাড়ি—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠকখানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার-হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ি?

জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কি চাই?

মড়ুইপোড়া বামুনের মত চেহারা একটা পাকাসটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধ ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয় শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন?

—হ্যাঁ, ঐ যে লম্বা, একহারা কালোমত চেহারা, ছোক্‌রা, ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে। বলিলাম—হ্যাঁ, কি করেচে শুনি?

—কি আর করবে, সর্বনাশ করেছে মশাই। আমাদের ঐ ইস্টিশানের মোড়ে রুটি-

বিস্কুটের কারখানা আর দোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন। আমার নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরামরতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করি, পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচে বলছিলেন?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বন্দিনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে নাকি পৃথক হইবে। রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ি আছে, তাহারই ভাগে পড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে। রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেন্ডারদের কাছে যাইত—এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোন অবিশ্বাস করিত না। ইদানীং রতন তাহারই উপর কেনা-বেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত। গত কল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে; বন্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এ বন্দিনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনো রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যেই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বন্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা-কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বন্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বন্দিনাথ, তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বন্দিনাথ পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া বিদায় হইল। এর পরে বন্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেনে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাচা গলায় বন্দিনাথ। ব্যাপার কি? সেজমামা ও মামীমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়া আসিলাম, তবে বন্দিনাথের গলায় কাচা কিসের? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই বন্দিনাথ আমার গাড়ির দরজাতে আসিয়া পৌঁছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে, সম্প্রতি তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি।

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ! কি বিপদ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

একদিন বড় মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড়মামা বলিলেন—ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এল। তোমার মামীমা বল্লেন, বোদে তুই তো এলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সা নেই দেখ্‌ছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকীর বালা সামলে রাখো। তোমার মামীমা তখ্‌খুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলেন। খুব

সকালে বন্দিনাথ চলে গেল, আমি তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হোলে দেখি, আমার বাঁধানো হুঁকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ্ খোঁজ্—আর খোঁজ্!...কার কীর্তি বুঝতে বাকী রইল না। সেই থেকে আর তাকে দেখিনি। ছোক্‌রাটা এমন করে উচ্ছন্ন গেল! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি?

পুজোর পরে সেজোমামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরের জমিদার কাছারী হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বন্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেল্ হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটে আমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বন্দিনাথ ভাল হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বন্দিনাথকে বাড়ির সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই-তিন বাসায় থাকিল, একদিন সকালে বন্দিনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বৌদিদি আসিয়া বলিলেন,—বোদে, এই বাটি রইলো আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস্ তো! বন্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বন্দিনাথ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশী নয়।

বন্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলকাতায়, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্তি—খালি পা, বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরনে ততোধিক ময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল, হ্যাঁরে বোদে, বাটিটা কি করলি রে?

এই একবৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়া ছিলাম। বন্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'-একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লেখক

রবিবার। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রে একটু ঘুমুবার উদ্যোগ করবো ভাবচি—এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—সীতানাথবাবু বাড়ী আছেন?

কে আবার রবিবার দুপুরে বিরক্ত করতে এল?

ছেলেকে ডেকে বল্লুম—নিয়ে আয় এখানে, আমি আর উঠতে পারচিনে। একটু পরে ছেলের পিছু পিছু চশমা চোখে ছিপছিপে ফরসা চেহারার একটি ছোকরা ঘরে ঢুকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে বলল—আপনারই নাম সীতানাথ বাবু—?

বললুম—বসুন, কোথা থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, এই আপনার কাছেই এলাম। আজ সকালে—ওই ডাক্তারখানায় বসে ছিলেন, আমি আর দাদা নাইতে যাচ্ছি, দাদা বললেন—আপনি একজন লেখক। তখন তেল মেখেছিলুম, সে অবস্থায় আপনার কাছে যেতে সাহস করিনি। শুনলুম, আপনি শনিরবিবারে এখানে আসেন, আজই আবার কলকাতা চলে যাবেন ওবেলা। তাই এখন দেখা করতে এলুম।

আসার উদ্দেশ্য শুনে মনটা প্রসন্ন হ'ল না। নিশ্চয়ই লেখা চাইতে এসেচে। এ পাড়াগাঁয়ের টাউনে কোন কাগজের উৎপাত ছিল না তো জানি—তবে কি এখানেও কাগজ বার হ'ল?

ছোকরা বিনয়ে সংকুচিত হয়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এতক্ষণ সে একবারও আমার মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটুখানি চুপ করে থেকে ছেলেটি বললে—আপনার কাছে এলাম, যদি মনে কিছু না করেন তাহলে বলি।

—বলুন না?

—আমাকে একটু করে লেখা শেখাবেন? আমি এবার বাংলা নিয়ে বি-এ পাস করেচি। এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেচি। আমার দাদা এখানকার সাবরেজিস্ট্রার। আমার বড় ইচ্ছে আমি লেখক হই। কিছু কিছু লিখেছিলামও, সেগুলো এনেচি সঙ্গে করে—আপনার সময় হবে দেখবার?

আমার সম্মতি পেয়ে ছোকরা একখানা খাতা ভয়ে ভয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—আই-এ পড়বার সময় লিখেছিলুম! চার-পাঁচটা ছোট গল্প, কতকগুলো কবিতা আর গান আছে।

ও দেখি আমার মুখের দিকে আগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমি কি মত দিই তাই শোনবার জন্যে। বললুম—মন্দ হয়নি, বেশ লাগল—তবে আপনার গানগুলো—ভালোই হয়েচে!

ছোকরা উৎসাহে ও আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেচে?...আচ্ছা, গল্পগুলো? ওগুলোর মধ্যে কিছু দেখলেন?

বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে বললুম—বেশ প্রেমিস্ আছে। আপনার বয়েস কম, লিখতে লিখতে হবে।

ছেলেটি যেন আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পেলে না। বললে, দেখুন আমার অনেক-দিন থেকে সাধ আমি একজন লেখক হবো। আমি বি-এতে বাংলা নিয়েছিলুম ব'লে বাড়ীতে সবাই বকে। আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা বড় বড় চাকরি করে—তারা ভালো ইংরেজী জানে। তারা দাদার কাছে চিঠি লিখলে—ওকে এখন বাংলা ভুলতে বলো। বাংলা শিখে জীবনে কি হবে? এখন একটু ইংরিজির দিকে মন দিতে বলো, যদি কিছু উন্নতি করতে চায়। আমি এ সব লিখি ব'লে বাড়ীর কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি আবার বাড়ীর ছোট ছেলে কিনা। আমি যা লিখি দাদারা দেখতে চায়, লিখতে দেখলে বকাবকি করে। বলে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। ও-সব লিখে মিথ্যে সময় নষ্ট করচে।

আমি মনে মনে তাদের খুব দোষী করতে পারলাম না একথা বলার জন্যে।

ছেলেটি আপনমনেই ব'লে যেতে লাগল—এখানে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম, গেজেট যেদিন বার হয়েচে, সেই দিনই চাকরি হ'ল আমার। এখানে এসে একা একা বেড়াই ; এক-জনও এমন কেউ নেই যে, দুটো ভালো কথা বলে, কি সৎচর্চা করে। সাহিত্য বিষয়ে কেউ খবরও রাখে না। বড় ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা। আপনার সন্ধান পেয়ে ভাবলুম ওঁর কাছে যাই, উনি আমায় লেখা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারবেন। তাই এলাম। কারো কাছে উৎসাহ না পেয়ে আমি এমন দমে গিয়েছি, আজ এক বছর লিখিই নি।

তারপর ছোকরা আমায় বেশ বোঝাবার চেষ্টা করলে, সে বর্তমান সাহিত্যের খবর রাখে বা সে সাধারণ মানুষের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, শ' টলস্টয়, তরুণ-সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা—ইত্যাদি হু হু করে মুখস্থ বিদ্যার মতো বলে গেল।

—আচ্ছা, তরুণ-সাহিত্যেকদের মধ্যে রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আমি বিপদে পড়ে গেলুম, তরুণ সাহিত্যিকদের বই কিছু কিছু পড়লেও রামচন্দ্র

সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ছেলেটি যেমন আগ্রহের সঙ্গে এ-সব কথা পেড়েছে, তাতে বেশ বোঝা যায়, অনেক দিন পরে একটু উচ্চ বিষয়ে চর্চা করতে পেরে ও খুব খুশি। হয়তো এমন শ্রোতা ওর অনেকদিন জোটে নি।

এ অবস্থায় তাকে নিরুৎসাহ করতে না পেরে রামচন্দ্র সরকার সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মত দেবার চেষ্টা করলুম। আমার কথা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে। বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন? ইবসেন বলেছেন—তারপর সে খানিকক্ষণ ধরে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক নাম অনর্গল আবৃত্তি ক'রে, তাদের নানা মত উদ্ধৃত ক'রে নিজের একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলে—তার ভাবে মনে হল এ ধরনের কথা বলতে সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে—কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে বোঝবার চেষ্টা করে আমি তার তর্কের ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কি ভাবচি।

আমি বললাম, এখানে কত দেয় আপনাকে?

—উনত্রিশ টাকা। এখন একরকম কুলিয়ে যায়, দাদার বাসাতে থাকি। কিন্তু দাদা বদলি হ'য়ে গেলে তখন মুশকিল হবে। আমার বাড়ীতে কিছু না দিলে তো চলবেই না—

—কেন, আপনার দাদারা রয়েছেন?

—আমার আপনার দাদা কেউ নেই। ওঁরা সব খুড়তুতো—জেঠতুতো ভাই। আমার বাবা অন্ধ, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর একটি বোন, আমার ছোট, তার এখনও বিয়ে হয়নি। দাদারা সব যে যার পৃথক। এক বাড়ীতে থাকলেও এক অন্নে নেই।

ও বললে—আমার ছেলেবেলা থেকে সাধ যে, আমার লেখা কাগজে বেরোয়। যখন বড় বড় লেখকের লেখা দেখতাম, আমার ইচ্ছে হত একদিন আমিও এই রকম লিখব। আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড ছিল কান্তি বসু—কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা এই মাঘ মাসে! আমায় দেখালে "ভারতবর্ষে" তার একটা গল্প বেরিয়েছে। মনে মনে বললুম, বা রে! আমার এমন কষ্ট হ'ল, ওরা সব লেখক হয়ে গেল, ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে, কত লোক পড়ছে, ভাবুন—কত নাম বেরুবে!

সে খানিকক্ষণ জানলার বাইরে আকাশের দিকে কেমন একটা মুগ্ধ-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললে—আর আমার কিছুই হ'ল না।

ওর আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমার বড় ভালো লাগল। একটু অন্য ধরনের ছেলে বটে—হয়তো বা একটু মাথা খারাপ আছে। ও যতক্ষণ বসেচে, আমি কেবল লক্ষ্য করচি ওর মুখের ভাবের নানা রকম পরিবর্তন। নির্ভরতা, ভয়, শ্রদ্ধা, আশা, আগ্রহ, স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, বিভিন্ন ভাব ওর মুখে কেমন চমৎকার ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ ধরনের লোকের এ রকম হয় না। পাথর-গড়া মুখের মতো তাদের মুখ হয়—দৃঢ়, অপরিবর্তনীয়—ভাব-প্রবণতার বালাই তাদের নেই। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—আপনি এর পরে নিশ্চয়ই ভালো লিখতে পারবেন। এরই মধ্যে বেশ লেখা বেরিয়েচে আপনার হাত থেকে। এখন আপনার তো বয়েস কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে আপনার সামনে—আমার তো মনে হয়, কালে আপনি একজন ভালো লেখক হবেন—আপনার লেখা পড়ে আমরা এক সময় আনন্দ পাব।

ছোকরা সলজ্জ হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—কি যে বলেন! আপনারা আনন্দ পাবেন আমার লেখা থেকে!...আচ্ছা, আপনার মনে হয় সত্যি আমার কিছু হবে?

—কেন হবে না? না হবার কিছু দেখলুম না—খুব হবে।

—কান্তি বসু আমারই ক্লাসফ্রেন্ড, আমারই মতো বয়েস—ও এরই মধ্যে নাম করে ফেলেচে। আচ্ছা, নাম করতে কতদিন যায়? নাম করবার নিয়ম কি?

আমার দুপুরের বিশ্রামটুকু একেবারেই মাটি হ'ল দেখছি। কি করব উপায় নেই—

একে দু'চার কথায় বিদায় দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এর কথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, আবার কোথা থেকে নাম করবার নিয়ম এনে ফেললে। অথচ কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল ওর ওপর, ভালো মনে কথার জবাব না দিয়েও পারলুম না। বললাম—তার কি কোন নিয়ম আছে, তা নেই। দু'চারটে ভালো লেখা বেরুতে বেরুতে ক্রমশঃ নাম বেরোয়! লোকে আপনার লেখা প'ড়ে যদি খুশি হয়, তবে নাম বেরুতে আর কি দেরি হবে?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে আনন্দসুরে বললে—অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে কোন লেখকের সঙ্গে আলাপ করি। কলকাতায় থাকতে একবার দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেবব্রত বাবুর 'অপরিণত' বইটা সবে বেরিয়েচে—সারা রাত ধরে জেগে বইখানা পড়লাম, এমন ভালো লাগল আর এমন একটা ইনস্পিরেশন্ পেলাম—তার পরদিন আমিও একখানা ওই রকম নভেল লিখব ভাবলাম। আট-দশ চ্যাপ্টার লিখেও ফেললাম। কান্তিকে দেখাতে গেলাম, সে বললে এর প্লট, ভাব, ভাষা, সব নাকি দেবব্রত বাবুর বইখানার মতো হচ্চে। আমার ঐ এক দোষ—যখন যে বই পড়ি, লিখতে বসলে সেই বইখানার মতো প্লট আর ভাষা হ'য়ে যায়। তা সেদিন দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি ওপর থেকে বলে পাঠালেন তিনি বড় ব্যস্ত।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার একটা গান আবার উল্টে পড়তে লাগলাম। সে হাসি-হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ও গানটা সম্বন্ধে আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি, অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শুনলে—জীবনে বোধ হ'ল এই সর্বপ্রথম নিজের লেখার প্রশংসা শুনচে। কথাবার্তার মধ্যেও একবার ঘরের চারিধারে আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে—আমি কোন লেখকের এত কাছে ব'সে কখনো গল্প করিনি। এত বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি।

আর মিনিট কুড়ি পরে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠল—ভাবলে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাছে বিরক্ত হই।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি ভেবে আবার বসল, ভয়ে ভয়ে বললে—একটা কথা বলব? কথাটা বলতে সাহস হয় না। অত কম টাকায় কি আপনি রাজী হবেন? আমি আপনাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিলে, আমাকে লেখা শিখিয়ে দেবেন?

ওর এই কথাটায় কেমন একটা কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। মাত্র ঊনত্রিশ টাকা মাইনে থেকে আমায় দশ টাকা দিতে রাজী—বাকি উনিশ টাকাতেই এখানকার ও বাড়ীর খরচ চালাতে রাজী—লেখক হবার এতই সাধ।

আমি তাকে বললাম—তার কোন টাকাকড়ি লাগবে না। আমি সব ছুটিতে এখানে আসিনে, যখন আসব, তখন আমার দ্বারা যতদূর উপকার হয়, খুশির সঙ্গে করব।

সে মহা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—তা হ'লে আমার হবে? না হবার কিছু দেখলেন কি?

—হবে নিশ্চয়ই, না হবার কিছুই দেখিনি। তবে সাধনা চাই।

ভগবান আমায় যেন ক্ষমা করেন—এই মিথ্যে বলবার জন্যে। আমি কেমন ক'রে ওর মুখের উপর বলবো যে, ওর লেখার মধ্যে কিছুই পাইনি—ওর গল্প, কবিতা নিতান্ত বাজে হয়েচে, বিশেষ কোনো ক্ষমতার অঙ্কুরও তার লেখার মধ্যে কোথাও নেই! মিথ্যা যেখানে মানুষকে সুখী করে, সেখানে নিষ্ঠুর সত্য ব'লে কিইবা লাভ?

পাঁচুমামার বিয়ে

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দাদার উনিশ, আমার সতেরো। অবস্থা আমাদের ছিল দিব্বি সচ্ছল, বড় বড় পাঁচ গোলা ধান তখন বাড়ীতে, এক একটা গোলায় দু পৌটি আড়াই পৌটি ধান মজুত। জমিজমার আয়ও বার্ষিক হাজার দুই টাকার কম নয়, এ বাদে ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা ও মায়ের গায়ের সোনার গহনাও বেশ ছিল। আর ছিল গ্রামের মধ্যে প্রচুর মান, খাতির রবরবা নাম-ডাক।

রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় লোয়ার প্রাইমারী পড়বার সময় ইতিহাসে পড়েছিলাম, কে একজন বাংলার সুলতানের পুত্র "পিতার মৃতুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজকোষে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তিন লক্ষ হস্তী, পাঁচ লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ পদাতিক ও বিশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য আছে"...অতএব তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে বসলেন। আমাদেরও হলো তেমনি অবস্থা।

মা ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ, ঠাকুরমা পিতৃহীন নাতিদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ, সুতরাং আমাদের মাথার ওপর কড়া শাসন করবার বা রাশ টেনে ধরবার তো কেউ ছিল না—এ অবস্থায় আমাদের মুণ্ডু ঘুরে যাবে, এ আর বিচিত্র কি?

দাদাই অগ্রজের অধিকারে পথ দেখালেন প্রথম। আগে মুণ্ডু ঘুরে গেল তাঁরই।

সে ইতিহাস রীতিমত বিচিত্র।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে বন্দিপুর গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতেন, তাঁকে পাঁচুমামা বলে আমরা ডাকতুম। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি দু-একবার আমাদের বাড়ী যাতায়াত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর যাতায়াত, বিশেষ করে দাদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল।

পাঁচুমামা দাদার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়। কাজেই আমি পাঁচুমামাকে খুব সমীহ

করে চলতুম। পাঁচুমামাও আমার চেয়ে দাদার সঙ্গে বেশী করে মিশতো। একবার পাঁচু-মামা এসে দাদাকে সঙ্গে করে বন্দিপুর নিয়ে গেল।

বন্দিপুর থেকে দিন পনেরো পরে ফিরে এসে দাদা ঠাকুরমাকে বল্লেন, ঠাক্‌মা, আমার দুশো টাকা বড় দরকার এখুনি। কলাই মুগের ব্যবসা করছি, পাঁচুমামা সস্তায় মাল বাঁধাই করছে, চাষাদের দিতে হবে—টাকাটা এখুনি চাই। মোটা লাভ হবে দু'মাস পরে। ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা কত ছিল তা মা'র জানা ছিল না, তবে নগদ টাকা যে মন্দ ছিল না—এটা দাদাও জানতেন, আমিও জানতাম। ঠাকুরমা টাকাটা দিয়ে দিলেন, দাদা টাকা নিয়ে মাল খরিদ করতে চলে গেলেন।

দিন কুড়ি পরে পাঁচুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা আবার এসে শ' দুই টাকা চাইলেন। মাল যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। পাঁচুমামার বাড়ী মাল গোলাজাত করা হচ্ছে, টাকার দরকার সেজন্যেই।

পাঁচুমামাও দাদার কথা সমর্থন করলেন। মাল সস্তার মুখে বেশী পরিমাণে খরিদ করে রাখতে পারলেই লাভ। টাকাটার দরকার বটে।

ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন—কত মাল কেনা হলো?

পাঁচুমামা বল্লে—তা দুশো মণের ওপর। এই টাকাটা পেলে আরও দুশো মণ খরিদ করা হবে। মণ পিছু আট আনা করে ধরলেও দুশো টাকা লাভ।

দিলেন টাকা ঠাকুরমা।

দাদা ও পাঁচুমামা টাকা নিয়ে চলে গেল—এরপরে মাস খানেক তাদের আর কোন পাত্তা রইল না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে একখানা চিঠিও লেখালেন—তারও উত্তর এল না।

চিঠির উত্তরের বদলে আরও দিন দশেক পরে এলেন পাঁচুমামার এক ভগ্নিপতি নারাণ-বাবু। নারাণবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি, বন্দিপুরে তাঁরও বাড়ী। আমি তাঁকে কখনও আমাদের বাড়ী আসতে দেখিনি।

নারাণবাবুকে হঠাৎ আসতে দেখে বাড়ীসুদ্ধ সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। দাদা ভালো আছেন তো? ব্যাপার কি?

নারাণবাবু হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠান্ডা হয়ে ঠাকুরমাকে বল্লেন—মা, আপনি পটলকে কত টাকা দিয়েছেন এ পর্যন্ত?

—চারশো টাকা।

নারাণবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—এত টাকা কেন দিলেন? কি বলে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে?

ঠাকুরমা বল্লেন,—কেন বলো তো বাবা এসব কথা জিগ্যেস করছো? সে তো মুগ কলাই-এর ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়েছে। কেন, পাঁচুও তো সেবার এসে ওই কথাই বলে গেল।

নারাণবাবু রাগে জ্বলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—পাজী বদমাইস্, ছুঁচো!...সেই রাস্কেলটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অত বড় বদমাইশ কি আর আছে নাকি? সেই তো পটলাকে ভালমানুষ পেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ওই জন্যেই আমার সামনে বেরোয় না। ব্যবসা না মুণ্ডু। টাকা নিয়ে দুলে-পাড়ায় রাজি দুলেনী বলে এক মাগী আছে, তারই ওখানে দুজনে যাতায়াত করে—এর মধ্যে বোধ হয় সব টাকাই তার পাদপদ্মে ঢেলেছে। ব্যবসা!

মা আর ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দাদা যে এমন ব্যাপার করতে পারে এ সবারই ধারণার অতীত।

নারাণবাবু বল্লেন—আমিই কি আগে ছাই জানতাম। জানলে এমনতরো হয়? আমার

সামনে তো দুজনের কেউ-ই বড় একটা আসে না, পরম্পরে শুনলাম এই ব্যাপার চলছে। শুনলাম খুব টাকা ওড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া শাড়ী আসছে রানাঘাটের বাজার থেকে মাগীর জন্যে। আজ খাবার, কাল খাগড়াই বাসন। বোধ হয় মদও ধরেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে একবার কথাটা জিগ্যেস করা দরকার যে, আপনি টাকা দিয়েছেন কিনা। তাই আজ এলুম।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার বহুকষ্টে উপার্জন করা পয়সা—ছেলেরা সব মূর্খ ও নাবালক—যা কিছু আছে, সংসারের অসময়ে কাজে লাগবে বলেই আছে। এখনও আমার দুই বোনের বিয়ে দিতে বাকী! এ অবস্থায় বিধবার পুঁজি সামান্য টাকার মধ্যে চারশো টাকা এক দুলে মাগীর পেছনে এভাবে ওড়ানো?

সমস্ত রাত পরামর্শ করার পরে ধার্য হলো যে, পরদিন সকালে নারাণবাবু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বন্দিপুরে এবং কালই দাদাকে আমি ঠাকুরমার অসুখ হয়েছে এই কথা বলে বাড়ী ফিরিয়ে আনব।

বন্দিপুর যেতে হয় মদনপুর স্টেশনে নেমে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রোশ দুই হেঁটে তো বিকেলে বন্দিপুর পেঁছানো গেল। বাড়ী থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলুম। পাঁচুমামা বাড়ীতে নেই, দাদাও নেই—শুনলাম তারা কানসোনার বাজারে গিয়েছে।

আমি পাঁচুমামার বাড়ীর সামনে একটা বেলগাছতলায় বসে আছি, কে একজন মোটা-সোটা কুচকুচে কালো স্ত্রীলোক সামনের ঘর দিয়ে মেটে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল—নারাণবাবু তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, ওই বেটি সেই রাজি দুলেনী—ওরই পাদপদ্মে তোমার দাদা সব টাকা ঘুচিয়েচে।

একটু পরে দাদা ও পাঁচুমামা বাড়ী ফিরল। আমাদের দেখে দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল, তারপর দাদা জিগ্যেস করলে—কিরে নগা, কি মনে করে?

নারাণবাবু বল্লেন—ও এসেছে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে। তোমার ঠাকুরমার বড় অসুখ যে!

—অসুখ? কি অসুখ?

দাদা আমার মুখের দিকে চাইলে। দাদার হঠাৎ-ভয়-পাওয়া হঠাৎ-ম্লান মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। বড় কষ্ট হলো, একবার মনে হলো, সত্য কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু তা হলে দাদা যদি বাড়ী না যায়?

সেই রাত্রেই দাদাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী এসে দাদা খুব বকুনি খেলে ঠাকুরমা ও মায়ের কাছে। তার উত্তরে সে নারাণ-বাবুকে গালমন্দ দিয়ে যা-তা বলে গেল। কে বলেছে সে সর্ষে কেনে নি? এখনও বিশ মণ সর্ষে ঘরে মজুত রয়েছে—আর সব মাল চাষাদের ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলেই,—রাজি দুলেনী কে? রাজি দুলেনীকে দাদা চেনেও না। নারাণবাবুর মত কুটিল, ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় আর নেই। তিনি টাকা চেয়েছিলেন, দাদা দেয়নি, তাই তিনি দাদার বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যে রটনা করে বেড়াচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুরমা দাদার এসব কথা কিছু বিশ্বাস করলেন না। মাস খানেক পরে পাঁচুমামা আবার একদিন এসে হাজির আমাদের বাড়ীতে। ঠাকুরমা বল্লেন—পেঁচো শোন। হতভাগা, আমার যে এক রাশ টাকা চেয়ে পাঠালি পটলাকে দিয়ে ব্যবসা করবি বলে, কই ব্যবসার হিসেব দেখা তো আমায়? দেখি কোথায় গেল এতগুলো টাকা!

পাঁচুমামার মুখে চিরদিন তুবড়ি ছোটে। হাত পা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিলে, টাকা ডোবানো তো দূরের কথা—আর মাস দুই পরে ঐ চারশো টাকার অন্ততঃ দেড়শোটি টাকা লাভ দাঁড়াবে। তখন লাভে মূলে একসঙ্গে টাকাটা এনে দেবে এখন। পাঁচুর অদৃষ্ট খারাপ, সে যার জন্য চুরি করে—সেই মাকি পাঁচুকে চোর বলে। যাক্, তার জন্যে সে

দুঃখিত নয়—আসল টাকাটা কোন রকমে ঠাকুরমায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ততদিন পর্যন্ত রাত্রে ঘুম নেই তার।

পাঁচুমামার বক্তৃতায় ঠাকুরমার বিশ্বাস ফিরে এল। ফলে পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে রয়েই গেল। দাদাকে এর আগেই সে কষ্ট করেছিল, এবার আমার পিছনে লাগল এবং অদ্ভুতভাবে সাফল্য অর্জন করল। এমন কি, কিছুদিন পরে আমারই মনে হলো, আমি দাদাকে বুঝি ছাড়িয়েই যাই।

তখন আমার বিবাহ হয়নি—দাদার সবে হয়েছে। আমি নানা ছুতোয় ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর পাঁচুমামার পরামর্শ মত খরচ করি। মহকুমা শহর ছিল নিকটেই। নানা ছুতোনাতায় মহকুমা গিয়ে আমি আর পাঁচুমামা প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফিরতুম না। ধাপে ধাপে শেষে এতদূর পর্যন্ত নেমেছিলুম।

পাঁচুমামাকে সত্যি আমি অদ্ভুতকর্মা মানুষ বলে ভাবতাম। যেমন জানে ব্যবসা, তেমনি রাখে দুনিয়ার খবর ; যেমনি বোঝে মোকদ্দমা, তেমনি পারে ফুর্তি করতে। পাঁচুমামার হাতে টাকাগুলি তুলে দিয়ে বলতাম, এর মধ্যে থেকে যা যা দরকার খরচ করো।

যত টাকাই দিই, তিন-চার দিনের মধ্যে সব খরচ করে ফেলে আবার আমার কাছে চাইতেন। বলতেননগা, বুড়ীর হাতে মোটা টাকা আছে। তা তোমার দ্বারা কিছু যে হবার নয়, আমি বুড়ীর নাতি হলে দেখতিস।

মামার কাছে কখনো টাকার হিসেব নিইনি—অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল আমার পাঁচুমামার ওপরে। কিভাবে ও কোথায় সে সব টাকা ব্যয় হতো, সে কথা আর বলব না—তবে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ শো টাকা পাখীর মত উড়ে গেল বেমালুম। ঠাকুরমা হাত গোটালেন, মায়ের গহনা বন্ধক পড়তে লাগল। এই অবস্থায় পাঁচুমামা একদিন তেওটা বন্দিপুরে বিশেষ কাজ আছে বলে চলে গেলেন, আর এলেন না।

মাস দশেক পরে একদিন শীতের রাত্রে মুড়িসুড়ি দিয়ে দালানে বসে আছি, এমন সময় পাঁচুমামা আমাদের বাড়ী এসে আবার হাজির।

আমায় বল্লেন—এই যে, ভাল আছিস নগা? পটলা কোথায়?

বল্লুম—দাদা ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ী গিয়েছে বোধ হয়। তার পরে, এতদিন কোথায় ছিলে মামা? এসো বসো—বড্ড শীত।

পাঁচুমামা দরজা ভেজিয়ে আমার কাছে এসে বসল। বলল—শোন্, একটা কথা বলতে এলুম তোদের। কাল এখানে এক ভদ্রলোক আসবে সকালের গাড়ীতে। যদি তোদের কিছু জিগ্যেস করে তবে বলবি, তোদের এখানকার বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পাঁচ আনা অংশ আছে। বলতে পারবি তো? পটলা কোথায় গেল—তাকে কথাটা শিখিয়ে রাখি।

কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লুম—কি, কি ব্যাপার মামা? কে আসবে?

ব্যাপার যা শুনলাম তা সংক্ষেপে এই। পাঁচুমামার বিবাহ, কাল তাকে দেখতে আসবেন মেয়ের বাপ নিজে। আসলে তো পাঁচুমামার কিছু নেই তেওটা-বন্দিপুরে, যা ছিল তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে অনেককাল। কিছু না দেখালে মেয়ে দেবেই বা কেন? মেয়ের বাপের নাম হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে, মদনপুরের কাছেই কি গাঁয়ে বাড়ী, গরীব অবস্থার লোক। তিনটি মেয়ে তাঁর, মেয়ে তিনটি অপরূপ সুন্দরী—এইটি বড়। পাঁচুমামা এই মেয়েটিকে দেখে নাকি পাগল হয়েছেন, বিয়ে যে কোন উপায়ে হোক হওয়াই চাই।

রাত্রে দাদা ফিরলে দাদাকে বলা হলো সব কথা। দাদা বল্লে—পাঁচ আনা অংশ কেন

আছে যদি জিগ্যেস করে?

—তবে বলবে তোমার বাপ আমার বাবার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল—সেই দেনার দায়ে সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে দায়।

আমরা রাজী। কিন্তু ভদ্রলোক যদি গাঁয়ের আর কাউকে জিগ্যেস করেন? তবেই তো মিথ্যে কথা ফাঁক হয়ে যাবে। পাঁচুমামা সেকথাও ভেবে এসেছেন। গ্রামের যে ক'জন লোক আমাদের পয়সায় ফূর্তি করেন, যেমন হারু সান্ন্যাল, ওপাড়ার আশু চক্কত্তি, এ'দের বয়েস আমাদের চেয়ে বেশী—এ'দেরও কথাটা বলে রাখতে হবে। আমরা বল্লে কেউ 'না' বলতে পারবে না। কাল মেয়ের বাপের সামনে তাঁদের হাজির করতে হবে। তাঁরাও আমাদের কথায় সায় দেবেন।

পরদিন সকালে আমাদের দলের লোক যাঁরা, তাঁদের একথা বলা হলো। তাঁরা সকলেই রাজী হলেন, না হয়ে উপায় ছিল না।

দুটোর কিছু আগে মেয়ের বাপ হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এলেন। ছেলে দেখে পছন্দ করলেন। তারপর ছেলের কি আছে না আছে সে কথা উঠল।

পাঁচুমামা বল্লে, আমাদের জমিজমার সে পাঁচ আনার মালিক। আমরা তাতে সায় দিলাম। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে নিতান্ত সরল, গ্রাম্য লোক এবং ভাবে মনে হলো নিতান্ত গরীব। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারের কিছু বোঝেন না। কেবল একবার জিগ্যেস করলেন—আপনারা তো ভাগ্নে, ভাগ্নের সম্পত্তিতে আপনাদের মামার অংশ কি করে এল?

এর উত্তরে বাক্‌পটু পাঁচুমামা একটি যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বল্লে, আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম—আমাদেরই মনে হলো, পাঁচুমামা যা বলছে তাই বুঝি সত্যি। কবে আমার বাবা পাঁচুর বাবার কাছে টাকা ধার করেছিলেন, সুদে আসলে তা কত টাকা দাঁড়ায়, তারই বদলে আমার বাবা পাঁচুর বাবাকে পাঁচ আনা সম্পত্তির উপস্বত্ব দিয়ে যান।

যে কোন বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক হলে এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতো, কিন্তু হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের মনে কোন সন্দেহ জাগল না। আমাদের এখানে আহারাদি করে বৈকালের দিকে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলে গেলেন। যাবার আগে পাত্র আশীর্বাদের দিনস্থির করেই গেলেন।

উভয় পক্ষের আশীর্বাদের পরে বিবাহের দিন স্থির হলো। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই বরযাত্রী গেলাম। বলা বাহুল্য, পাঁচুমামার চালচুলো পর্যন্ত ছিল না—জমিজমা থাকা তো দূরের কথা—সুতরাং আমাদের বাড়ী থেকেই বর বিয়ে করতে রওনা হলো এবং কথা হলো যে বউ নিয়ে আবার পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসবে।

কনের বাপের বাড়ী একখানা মাত্র খড়ের ঘর, তারই দাওয়ায় সম্প্রদানের আসর, কারণ বর্ষাকাল, বৃষ্টি যখন তখন আসতে পারে। বরযাত্রী থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল কিছু দূরে এক প্রতিবেশীর চন্ডীমন্ডপে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, সবসুদ্ধ জন পনেরো। বাড়ীর ভিতরের উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই তলায় আমরা বসে গেলাম। লগ্ন ছিল বেশী রাত্রে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া তার আগেই শেষ করে দেওয়ানো হলো।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের অবস্থা কত খারাপ তা বোঝা গেল একটু পরেই। তিনি নগদ বরপণ স্বরূপ একুশটি মাত্র টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এখন বিবাহ সভায় দেখা গেল তিনি মাত্র এগারোটি টাকা থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। বরকর্তা ছিলেন আমাদের গ্রামের দাশু চক্রবর্তী, প্রবীণ লোক বলে তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছি। কর্তা সাজিয়ে নইলে পাঁচুমামার তরফ থেকে বরকর্তা হবার কোন মানুষ নেই তো!

দাশু চক্রবর্তী আমাদের উপদেশ মত বল্লেন—একুশ টাকার কথা ছিল, এগারো টাকা

কেন? বাকী টাকা না দিলে বর সভাস্থ করবার অনুমতি দেব না।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বল্লেন—আর যোগাড় করতে পারিনি—ওই নিয়ে আমায় মাপ করতে হচ্ছে বেহাই মশায়। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলব, ঘরের চালে দেবার জন্যে খড় কিনে রেখেছিলাম—সেই খড় বেচে ফেলে দিয়ে তবে ওই এগারো টাকা যোগাড় করেছি। সামনে বর্ষা আসছে, ঘরের মধ্যে এসে দেখুন চাল ফুটো—আলো আসছে। ঘর সারাবার আর কোন সঞ্চয় নেই। আর টাকা হলেও এই জষ্টি মাসে খড় পাব কোথায়?

এর পরে আমরা তর্ক চালাতাম, ছাড়তাম না। তোমার চালে খড় নেই তা আমাদের কিরে বাপু? মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, আগে থেকে তোড়জোড় করনি কেন? রইল তোমার বিয়ে-থাওয়া—আমরা বর সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এসব কথা বলা চলতো, কিন্তু পাঁচুমামা দেখি ছট্‌ফট্‌ করছে—তার ইচ্ছে নয় টাকার জন্যে আমরা বিয়ে ভেঙে দিই বা কোন বাধা সৃষ্টি করি। সে আমায় ডেকে কানে কানে বল্লে, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! তার চোখমুখের করুণ ভাব দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। সে কেবল ভাবছে, তার বিয়েটা বুঝি আমরা পাঁচজনে মিলে ভেস্তে দিলাম। যাই হোক, পাঁচুমামার অবস্থা দেখে আমরা আর বেশীদূর ব্যাপার গড়াতে দিলাম না; বর সভাস্থ করা হলো। মেয়েকে যখন আনা হলো, মেয়ের রূপ দেখে আমরা তো অবাক। এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে পাঁচুমামার বিয়ে হচ্ছে তা তো জানতাম না! কি গায়ের রং—কি সুন্দর গড়নপিটন, আর তেমনি মুখশ্রী! অমন রূপের ডালি মেয়ে কালেভদ্রে চোখে পড়ে। তাই পাঁচুমামা ক্ষেপে উঠেছে এই বিয়ের জন্যে—তাই এত জুয়োচুরি, এত আটঘাট বাঁধা, এত দুর্ভাবনা—পাছে এমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়!

মনে মনে ভাবলাম—পাঁচুমামার অদৃষ্টটা দেখছি বেজায় ভালো। নইলে এমন মেয়ে ওর জোটে! ওর চাল নেই, চুলো নেই, তিন কুলে কেউ নেই—অজমূর্খ, গাঁজা খায়, নেশাভাঙ্গ করে, কোন্ বদ্‌মাইশিটা ওর বাকী আছে জিগ্যেস করি। আমার দাদাকে আর আমাকে তো ও-ই নষ্ট করেছে! তার ওপর পাঁচুমামা ঘোর জুয়াচোর আর ঘোর মিথ্যা-বাদী। লোককে ঠকাতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই। এই বিয়েই তো করছে জুয়োচুরি করে। আমাদের বিষয়ে ওর পাঁচ আনা অংশ আছে না ছাই আছে। সত্যি কথা জানলে বিয়ে দিত মেয়ের বাপ? বিশেষ করে যখন এমন সুন্দরী মেয়ে!

যাক্, সে সব কথায় দরকার কি আমাদের। বিয়ে-থাওয়া মিটে গেল, বরকনে আমাদের বাড়ী এসে উঠল। বৌভাত কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না একথা ছিল আগে থেকেই। কারণ আমাদের এখানে বৌভাত করতে গেলে আমাদের নামডাকের উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বৌভাত করতে হয়—নইলে আমাদের নিন্দে হবে। সে খরচ দেয় কে, কাজেই ঠাকুরমা বলেছিলেন—বৌ এখানে তুলে তারপর তুমি পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যেও। সেখানে কাজকর্ম ক'রো গিয়ে। এখানে ওসব হবে না।

পাঁচুমামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল।

আমার মা ছিলেন বড় খাঁটি লোক। তিনি জানতেন না যে পাঁচুমামা বিয়ের আগে কি জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের বিষয়ে তার পাঁচ আনা অংশ থাকা নিয়ে।

মা বল্লেন—পাঁচুর বৌটি যেন হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা,—কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্ট ভাল নয়। আমার জ্ঞাতি ভাই হলেও আমি বলছি—ওরকম পাত্রে অমন রূপের ডালি মেয়ে কি দেখে যে বুড়ো দিল, সে-ই জানে। ওই বাঁদরের গলায় ওই মুক্তোর মালা!

মা জানতেন না এর মধ্যে আসল কথাটা কি! পাত্রীর বাবার কোন দোষ ছিল না, যত সব জুয়োচোরের পাল্লায় পড়ে সরল বৃদ্ধ তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে হাত-পা বেঁধে

জলে ফেলে দিয়েছেন। সে জল যে কত গভীর জল, প্রথম থেকেই তা বুঝতে নববধূ বা তার বাপ, কারও বাকী রইল না। পাঁচুমামা বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ী বন্দিপুরে চলে গেল বটে—কিন্তু বৌভাত হলো না সেখানে। পয়সা কোথায় পাঁচুমামার যে বৌভাত হবে?

বন্দিপুর বড় কখনো যেতাম না—এখান থেকে পাঁচুমামা চলে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর অনেক দিন ওদের দেখা হল না—বিয়ে করার পরে এখানে আসাটা যেন পাঁচু-মামার কমে গেল। দাদা মাঝে মাঝে যেত বন্দিপুরে—এসে গল্প করত, পাঁচুমামার সংসার অতি কষ্টে চলছে। নতুন বৌয়ের গায়ে এক আধখানা গহনা যা তার বাবা দিয়েছিলেন, এরই মধ্যে পাঁচুমামা বেচে ফেলেছে। বৌটি কিন্তু খুব ভালো, সে ইচ্ছে করে গহনা খুলে দিয়েছে—ইত্যাদি।

বছর তিন-চার কাটল। তারপর একদিন খবর এল পাঁচুমামা মারা গিয়েছে। আগে থেকে নেশা-ভাঙ্ খায়, লিভার ছিল খারাপ, নেফ্রাইটিস্ হয়ে মারা পড়েছে, চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু হয়নি।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে আমি বাইরের উঠানে একগাছা ছিপ চাঁচতে বসেছি—দাদা বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরমা নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছেন—এমন সময় আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে এবং তাঁর বিধবা মেয়ে।

আমি ছুটে কাছে এলুম—পাঁচুমামার বিধবা স্ত্রীকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম, বাঁড়ুয্যে মশায়কেও করলুম। রূপসী বটে এই বিধবা মেয়েটি। মেয়ে না অগ্নিশিখা! বিয়ের সময়েও তো এতটা রূপ দেখিনি মামীমার! আমি মামীমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে মার কাছে রেখে হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বসলাম।

তিনি বল্লেন—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, তার আর চারা নেই। মেয়েটার এই সবে উনিশ বছর বয়েস—ওর মুখের দিকে তো চাইতে পারা যায় না। এখন এমন অবস্থা যে দিন চলে না, পাঁচু একটি পয়সা রেখে যায়নি যে মেয়েটা একদিন সেখানে হাঁড়ি চড়িয়ে খায়। ধার দেনা করে কোন রকমে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ সেরে শুদ্ধ করিয়েছি দাদা। ভাবলাম, আগে তো মেয়েটাকে শুদ্ধ করি, তারপর পাঁচুর বিষয়ের যে অংশ আছে এখানে, তা থেকে দেনা শোধের কথা ভাবা যাবে পরে। তাই আজ এলাম মেয়েটাকে নিয়ে। ওরও তো ঘোর দুরবস্থা। বন্দিপুরে একবেলা খায় এমন অবস্থা নেই। পরনে কাপড় ছিল না, দেনা করে একখানা সরুপাড় কাপড় কিনে দিয়েছিলাম শ্রাদ্ধের পরে, তাই পরে এসেছে। আমার তো অবস্থা সবই জানো—এখন দুই মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী, এক পাল কুপুষ্যি—তাদেরই খেতে দিতে পারিনে, তা আবার বিধবা মেয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি বা কোথায়, খেতে বা দিই কি? এখন বিষয়ের পাঁচুর যা অংশ এখানে আছে—তা থেকে মেয়েটার একটা হিল্লে তো হোক। দেনাটা শেষ করে দিয়ে না হয় তার উপস্বত্ব থেকে এখানেই একখানা খড়ের ঘর তুলে দিই ওকে। ও তো মেয়েমানুষ, কিছু বোঝে না—আমি সঙ্গে করে আনলাম। মেয়েও বল্লে—বাবা, চলো সেখানে—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমার একটা ব্যবস্থা করে রেখে এসো। আর তাঁরাও ভাল লোক—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়ের অংশের যা আয় দাঁড়ায়—তা থেকে আমার একটা বিলিব্যবস্থা—আর বন্দিপুরে থেকেই বা কি হবে, সেখানে তো এক ভাঙ্গা খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই—যখন বিষয় এখানে, সম্পত্তি এখানে, তখন এখানেই যা হয় একটা ঘরদোর বেঁধে—

আমি এই লম্বা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটু আশ্চর্য হবার সুরে বল্লুম, কিসের বিষয়? কিসের অংশের কথা বলছেন?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—ওই যে পাঁচুর যে অংশ আছে এখানকার বিষয়ে, তা তো ধরো এখন আমার মেয়েরই অর্শেছে। তোমাদের এত বড় বিষয়ের পাঁচ আনা অংশ কি কম? ওর এক বেলা একমুঠো আলোচালের ভাত আর বছরে চারখানা কাপড় তা থেকে হেসে খেলে চলে যাবে—

আমি বিনীত শান্ত হাসিমুখে ভদ্রতার সুরে বল্লাম—আপনি ভুল করেছেন বাঁড়ুয্যে মশায়, এখানকার বিষয়ে পাঁচুমামার কোন অংশ নেই।

—অ্যাঁ, সে কি কথা?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে প্রথমটা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই—কি ভেবে সামলে নিয়ে চিৎকারের সুরে বল্লেন—অংশ নেই কেমন কথা? বিয়ের আগে তো তোমরাই বলেছিলে পাঁচ আনা অংশ আছে—বলো নি? আর এখন বলছ নেই। আমার মেয়েকে ছেলেমানুষ পেয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার মতলব? বরাবর শুনে আসছি অংশ আছে, আর এখন অংশ নেই বল্লেই হলো?

আমারও রাগ চড়ে গেল মাথায়। আমি বল্লুম—আপনি মিছে চেঁচামেচি করেন কেন? আপনি বিষয় সম্পত্তির কিছুই বোঝেন না তাই ওকথা বলছেন। এ তো শোনাশুনির কথা নয়। দলিল দস্তাবেজের কথা, পড়চা কোবালার কথা। বিষয় সম্পত্তি গাছের ফল নয় যে—যে কুড়িয়ে পায় সে-ই খায়। আমার বাবা যদু চক্কত্তির নামে সাত-খানা গাঁয়ের প্রজা কাঁপত—তিনি কি দুঃখে তেওটা বন্দিপুরের পাঁচু রায়ের বাবার কাছে বিষয়ের পাঁচ আনা বেচতে যাবেন? ও সব ভুলে যান। যা শুনেছেন, ভুল শুনেছেন। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, রেজিস্ট্রি আপিসে দুটাকা ফি জমা দিয়ে খুঁজে দেখুন গিয়ে সেখানে এমন কোন দলিল আছে কিনা। আমরা দলিল গোপন করতে পারি, সেখানে তো গোপন থাকবে না?

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার দু-পাঁচজন জড় হলো। তারাও হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের সরলতা দেখে কোনক্রমে হাসি চেপে রইল। যারা সেবার সাক্ষী দিতে এসেছিল যে পাঁচুমামার বিষয়ের অংশ আছে, তারাই বলে গেল পাঁচুর এখানকার বিষয়ের অংশ আছে এমন কথা কস্মিন্‌কালে তারা শোনেও নি।

সব শুনে হৃষীকেশের বিশ্বাস হলো শেষ পর্যন্ত যে এদের কথাই সত্যি।

তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—তারপরেই হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ডুক্‌রে মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলেন—আমি মেয়েটার সর্বনাশ করেছি নিজের হাতে—তখন কি জানি এমন জুয়োচুরি আমার সঙ্গে সবাই করবে—আমার অমন সোনার প্রতিমে মেয়েটা—আমায় ভালমানুষ পেয়ে—

ভাল হাঙ্গামাতেই পড়া গেল দেখছি সকালবেলা!

বুড়োর কান্না শুনে পাড়ার লোক জড় তো হলোই, বাড়ীর মধ্যে থেকে মা, ঠাকুরমা ছুটে এলেন, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রী পর্যন্ত সেই সঙ্গে ছুটে এলেন দেখতে যে তাঁর বাবাকে বুঝি আমি মারধর করেছি।

সে এক কাণ্ড আর কি!...

ঠাকুরমা তো বুড়োকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর কান্না থামিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক কি সব বোঝালেন-সোজালেন। আমায় ডেকে খুব বকুনি দিলেন; আমি নাকি লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি নে।

আমি বল্লাম—এর-আর কথা কইতে জানাজানি কি, আমি যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তুমিই বলো না কেন, আমাদের বিষয়ে পাঁচুমামার কি পাঁচ আনা অংশ ছিল?

মা শুনে অবাক, তিনি এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। বল্লেন—সে কি কথা! পাঁচুর এদের বিষয়ে অংশ কেন থাকবে? এ কি রকম কথা, এ তো বুঝতে পারছি নে?

ক্রমে তিনি সব শুনলেন। আমার ও দাদার ওপর খুব রাগ করলেন শুনে। বল্লেন—বেশ, আমার ছেলেরা যখন এ জুয়োচুরির মধ্যে আছে, তখন আমি পাঁচুর বৌয়ের ভরণ-পোষণের ভার নিলুম। মেয়েকে এ বাড়ীতে রেখে চলে যান। আজ থেকে ও আমাদের ঘরের লোক।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—জিগ্যেস করে দেখুন আপনার ছেলেকে? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। বিয়ের আগে পাত্র আশীর্বাদের দিন একথা বলেছিল কিনা! আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের দেখে। আমি তো পাঁচুকে দেখে দিই নি। ভাবলাম আপনাদের আত্মীয়, আপনাদের বিষয়ের অংশীদার—তাই আমি সম্বন্ধ করি। তখন কি করে জানব এর মধ্যে এত জুয়োচুরি!

আমি বল্লাম—এ কথা আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলছেন। যদি কেউ বলে মণীন্দ্র নন্দীর জমিদারীতে আমার অংশ আছে—অমনি তার অংশ হয়ে যাবে?

ঠাকুরমা আমায় আবার ধমক দিয়ে চুপ করালেন। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেকে স্নান করতে পাঠালেন, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। যাবার সময়ে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ঠাকরমায়ের হাতে ধরে বল্লেন—আমার মেয়েকে আপনি রেখে দিন। আমার সংসারে একপাল পুষ্যি, খেতে দিতে পারি নে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্বত, আমার মেয়েকে একবেলা একমুঠো আলোচালের ভাত—

মা ও ঠাকুরমা বল্লেন—তার আর কি, বৌমা থাকুন এইখানেই। পাঁচুর বৌ আমাদের তো আর পর নয়, কপালই না হয় পুড়েছে সকাল সকাল।

সেই থেকে পাঁচুমামার স্ত্রী আমাদের সংসারে রয়ে গেলেন। প্রথমে ছিলেন বেশ সুখেই, যতদিন মা ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁরা একে একে গেলেন স্বর্গে। দাদার বিয়ে আগেই হয়েছিল, আমারও বিয়ে হলো। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ওদিকে মারা গেলেন। পাঁচু-মামার স্ত্রীরও আর বাপের বাড়ী যাবার জায়গা রইল না।

নতুন বৌয়ের দল নিজের সুবিধামত সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল। পাঁচুমামার স্ত্রীর এ-সংসারে থাকাটা তারা গোড়া থেকেই অনধিকার-প্রবেশ বলে ধরেছিল, এইবার সামান্য পান থেকে চুন খসলেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে অপমান করা শুরু করলে। এর আর একটা কারণ ছিল। পাঁচুমামার স্ত্রী ছিলেন অসামান্য রূপবতী বিধবা মানুষ, একবেলা খেতেন, একখানা নরুন পাড় কাপড় পরতেন—তাতেই তাঁর রূপ ধরতো না। বয়সের সঙ্গে সে রূপ ম্লান হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বাড়তেই লাগল।

নতুন বৌয়েরা দেখতে অমন সুন্দরী নয় কেউ-ই। তাদের মনে পাঁচুমামার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নানা হিংসে, ঘোর সন্দেহ এসে জুটতে লাগল।

পাঁচুমামার স্ত্রী তো এ বাড়ীতে থাকতেন বিনি মাইনের রাঁধুনী ঝি চাকরাণীর মত। কিন্তু তাঁর ওপর অত্যাচার অবিচার তাতেও কম ছিল না।

আমার সত্যিই কষ্ট হতো পাঁচুমামার স্ত্রীর জন্যে। যে সহানুভূতি পাঁচুমামার ওপর কখনও হয় নি, পাঁচুমামার শ্বশুরের ওপর হয় নি—তা হয়েছিল এই অসহায় বিধবা নারীর ওপর।

কিন্তু আমার কথা কওয়ার কোন উপায় ছিল না। তা হলেই আমার স্ত্রী সন্দেহ করবেন, কেন আমি পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষে এত কথা বলছি। আমার পূর্বেকার রেকর্ড খুব ভাল ছিল না, সুতরাং স্ত্রী পদে পদে আমায় সন্দেহ করতেন, আমিও যে না বুঝতাম এমন নয়। সুতরাং পারিবারিক শান্তিভঙ্গের ভয়ে মুখ বুজেই থাকতাম।

এত সাবধান থেকেও একবার বড় বিপদে পড়ে গেলাম। সে দিনটা একাদশী। দেখি বেলা এগারটায় সময়ে পাঁচুমামার স্ত্রী এক রাশ বাসন মেজে ডোবা থেকে উঠে আসছেন।

আমি বড় বৌ অর্থাৎ আমার বৌদিদিকে বল্লাম,—বৌদিদি, মামীমাকে আজ বাসন মাজতে দিয়েছে কে? আজ একাদশীর দিনটা, তোমরা একটু দেখো শোন না সংসারের কাজের কি হয় না হয়?

বৌদিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লেন—ও সব লোক দেখানো ঢং! কে বললে বাসন মাজতে? অন্যদিন বল্লেও তো কাজ করতে দেখিনে—আর আজ বাসন না মেজে আনলে দরদ কুড়ানো যাবে কি করে? ওসব কি আর বুঝি নে? তা বুঝি।

বৌদিদি কি বোঝেন জানি নে, কিন্তু সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী আমায় বল্লে—ওগো, শোন একটা কথা বলি! কথা রাখবে বলো?

—কি কথা বলো?

—তুমি ওকে বাড়ীতে রাখতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লেম—কাকে গো? ভেঙ্গেই বলো না?

—ওই যে তোমাদের মামীমাকে। ওকে এখুনি তাড়াও।

—কেন, মামীমা কি করেছেন?

—সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে। সে তো তোমাদের আপন মামীমা নয়—বিশেষ কোন সম্পর্কও কিছু না। সামান্য পাতানো সম্পর্ক। আর ওই রূপ, আর ওই বয়েস। তোমাকে আমি চিনি—মিছে অশান্তি কেন সৃষ্টি করবে? সরাও ওকে এখান থেকে। আমি গতিক ভাল দেখছি নে।

বুঝলাম, সেই যে দুপুরবেলা পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে একটা কথা বলেছিলাম বড় বৌয়ের কাছে, তিনিই লাগিয়েছেন সমস্ত কথা ছোট বৌকে। কি বিশ্রী মন এই সব পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষদের! অস্বীকার করি নে যে আমার রেকর্ড ভাল না, আমিই জানি আমি কি বা আমি কি নই। কিন্তু একজন আশ্রিতা অসহায়া তরুণী বিধবা, যার প্রতি সত্যিই আমার সহানুভূতি ও অনুকম্পা, যাঁকে মামীমা বলে ডাকি—তাঁর সম্বন্ধে এই সব—

আমার মন একমুহূর্তে বিরূপ হয়ে উঠলো সংসারের ওপর, স্ত্রীর ওপর, বৌদিদির ওপর, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রীর ওপর।

বল্লাম—বেশ ভালো, আজই যেতে বলছি।

মনে ভাবলাম, এমন করে বলবো যে স্ত্রী পর্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে উঠবে।

পরদিন সকালেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে ডেকে বললাম—আপনার আর এখানে থাকা হবে না। আপনাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বাধছে, আপনি এখুনি আমাদের বাড়ী থেকে অন্যত্র যান।

বড় বৌ বল্লেন—সে কি কথা! কাল গিয়েছে একাদশী, আজ দ্বাদশীর দিন। না খেয়ে কোথায় যাবেন উনি! কাল সারা দিনরাত নিরম্বু উপোস গিয়েছে। সংসারের অকল্যেণ হবে যে!

মনে মনে ভাবলাম—সেইটেই বোঝ। আর একটা গরীব অসহায় মেয়ের যে কি হবে তা মনেও উঠে না। তোমাদের ভালো করেই কল্যাণ করাচ্ছি।

পাঁচুমামার বৌ কথাটি বল্লেন না। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি জানি তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই—বাপের বাড়ী এক গাঁজাখোর বেকার ছোটভাই আছে, সেখানে একমুঠো খাওয়াও জুটবে না এক বেলা। কিন্তু সব জেনেও বড় রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠলাম আজ। একাদশীর পরদিন না খেতে দিয়েই তাড়াবো! করাচ্ছি সংসারের কল্যাণ তোমাদের!

সেই সকালেই চা খেয়ে বসে আছি, পাঁচুমামার বৌ দুটি পান সেজে কাঁসার বাটিতে

আমার সামনে রেখে দিয়ে পুঁটলি বগলে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মুখে কিছু বলিনি, কেবল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্যে আমাদের মুহুরী বৃদ্ধ গোপাল মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম এবং আপদ চুকে গেল ভেবে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পাঁচুমামার বৌয়ের তারপর থেকে আর কোন খবর রাখি নি।

ঠাকুরদা'র গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্পকথা বুঝি, কিন্তু সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক আসল গল্পটা বলিঃ

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ—একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভায় নাম-করা খাইয়ে ছিলেন সেকালের আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বিষ্ণুরাম রায়, সারসার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সেবার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্পবয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে, গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক, তারা কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের পৈতৃক জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

একদিন দাদা এসে বল্লেন—খালপারের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী! দিবি? আমি দাদার নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়—অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম। কে এমন সুপরামর্শ দিয়েচে কি জানি। বল্লাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

—পনেরো টাকা বিঘে।

—জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!

—তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

—আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন, নিজের জমি যা খুশী করবেন, এতে কার কি বলবার আছে—ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য আয় নেই, জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না, এক পয়সা সাহায্যও করলেন না। আমি ভেবে চিন্তে মুস্তফাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে হাজির হোলাম। মুস্তফাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন, তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলাম খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ—কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ী বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে? তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়ের নাতি। তা কি মনে

করে?

—আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে, বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

—টাকা হবে না।

—কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোনো উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার! ধান রোয়া না হ'লে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন।

কাজী সাহেব বল্লেন—আপনাকে এখানে আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন—এমন সময়, বাড়ী ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত, এই পাশেই বাড়ী তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোর বাড়ী থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ওবেলা কথাবার্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

দিব্যি সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্বক ভোজনপর্ব সমাধা হ'ল। কাজী সাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে বল্লেন, কত টাকা হ'লে জমি রোয়া হয়? কত বিঘে জমি? বল্লাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—না। যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙল গোরু কিনুন, পরের লাঙলের ভরসায় চাষ চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয়?

আমি বল্লাম—টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙল গোরু করতে এখন অন্তত শ'খানেক টাকা দরকার।

—আচ্ছা যেদিন আপনি আজকের টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ী ফিরে আসতেই মা সব শুনে বল্লে—খুব ভদ্দর লোক ত্যে ওরা। আমার দুগাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বল্লাম—বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আবার। আমায় বল্লেন—আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা আর ধান কর্জ দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা! যে মহাজন খাতক চেনে না, সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান, দলিল দিতে হবে না।

এই ভাবে সে আষাঢ় মাসে ধান রোয়া আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিনটাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল একমণ পাওয়া যায়, পাকি ওজনের গাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোল সের টাকায়। সে সব এখন বল্লে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বল্লে—বাবা ঠাকুর, গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের

দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোর-ডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল, মা পীতাম্বরকে তুলসী গাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারেও কোথাও না যায়।

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গা পার হলাম। পীতাম্বর বল্লে, বাবাঠাকুর, এখান থেকে কোশ-চারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধ্যে পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস। বল্লাম, খুব।

পীতাম্বর বল্লে—তবে চলুন বাবা ঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে। পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘণ্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবাঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুল্লে। মনে হলো সেটা কোনো গৃহস্থের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ীর লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বল্লাম—দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কিনা। এমন বাড়ীতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

—বাবু এ রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না। এরা বোধহয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দুজনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা ছোট বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম—আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়সের খিদে! আধসের চিঁড়ে আর আধসের দই, পোয়াটাক গুড় ও এক ছড়া কলা এক একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরের মহৎ দোষ ছিল তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না। মুদীর দোকানে আহারান্তে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদীর দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উপর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বল্লে—বাবাঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কিনা তাই ভাবচি—

—কেন?

—বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে একসময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবাঠাকুর বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা।

--গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নিই।

--কিন্তু বাবাঠাকুর, কোন রকমে যেন জানতে দেবেন না যে আমাদের কাছে টাকা আছে। সিজে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দু'তিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ী গেলাম--কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম--রাত্রে কিছু খাবো না বল্লাম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়--একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বল্লেন, কে?

--আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী এখানে নয়।

--এখানে কি মনে করে?

--বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

--তোমরা?

--আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

--কি ব্রাহ্মণ। উপাধি কি?

--রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে--এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো!

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেই পুরানো আমলের বাড়ীর চেহারা দেখে কেমন ভয় ভয় হ'ল। নির্জন বাড়ীটায় কেউ যেন কোথাও নেই--এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন ক'রে পুঁতে রাখে, তবে লাস সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দুমহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারীকণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হ'ল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে না। চটাওঠা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা গজিয়ে রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হ'ল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

পীতাম্বর চাপা গলায় বল্লে--বাবাঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বল্লাম--বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বল্লে--তোমার সঙ্গের লোকটি কি জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব।

আমি বল্লাম--যাও পীতাম্বর--

পীতাম্বর দেখি আমায় চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম--যাও না--বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অতবড় বাড়ীর মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্বোধ নই আমি। খুব সতর্ক হয়ে রইলাম--নিজের দশ হাতের মধ্যে কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্চিনে--কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমুর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসচে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই

তো? উঠে দাঁড়ালে তবুও ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বল্লে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল্লে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে' জেলা।

—বাপের নাম কি?

—ভূষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বল্লে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল-টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটলে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হ'ল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপাশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

বিছানায় সবে শুয়েচি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ী। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সংকুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বল্লেন—না না থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হ'ল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বল্লেন, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—কেমন, পছন্দ হয়?

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—সে কথা এখন কেন! বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি। কি ব্যাপার এদের? নরবলি-টলি দেবে না তো আমায়? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বল্লাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবা ঠাকুর। একটা কথা বলবো?

—কি?

—কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজ খবর নিলেন। আপনার বাড়ী কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে—সে অনেক কথা। এ জায়গা ভাল নয়, এখুনি এখান থেকে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আহারাদি ক'রে নাও, ওবেলা হবে এখন সে সব—

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হ'ল। বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বল্লে—বাবা ঠাকুর, বড় বিপদ।

—কি রে?

—এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

—সত্যি?

—দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো।

কথাটি কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রির অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বল্লেন—বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন!

আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—খাবো না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না!

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—মা বলে ডেকেচ তো? তা হ'লেই হয়ে গেল। কর্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বল্লে—সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে—তোমাকে এক্ষুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধহয় তত আশ্চর্য হ'তাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা।

বল্লাম—সে কি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদেরই পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো, —তা হয় না? তা হ'তে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিজে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্যন্ত লোকে থরহরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে। গোঁফদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই?

আমি কাঠের পুতুলের মত বসে রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী ব্যবহারেও তাই।

এর পরে গল্প খুব সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা জগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ' বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেচে।

তখন তামাকের নলটায় একটি জোরে টান দিয়ে বল্লেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়সে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে আমার লাভ কি বলো!

আপিসে পানের আর জর্দার কৌটো দুই-ই ফেলে এসেছেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে পড়লো। ছাতিটা আজ আবার আনেননি, বৃষ্টি হবে না ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছাতি না এনে ভুল করেছেন, মেঘ জমে আছে সেন্ট্রাল এভিনিউর বড় বড় বাড়ীগুলোর মাথায়। পানের কৌটো ফেলা চলে না, টেবিল থেকে কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আবার আপিসে ফিরলেন, ইনচার্জ বাবু তখনও কাজ করছেন একমনে, অথচ কেউ নেই ডিপার্টমেণ্টে, খোশামুদে কোথাকার, মরুক খেটে! দেড়শো টাকা মাইনের মত কাজ দেখানো চাই তো সাহেবদের, নইলে যদি তাড়িয়ে দেয়? দিনকাল ভাল না। তাঁদের যে পঞ্চাশটি টাকা সেই পঞ্চাশটি টাকা। কেউ নেবে না, কেউ বাড়তি দেবেও না! এই যুদ্ধের বাজার। চালানো যে কত দায় হয়ে উঠেছে, সে বোঝে যে চালায়। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে, এক পয়সা উপরি নেই। ওভারটাইম খাটলে একটাকা দৈনিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওভারটাইম ক'দিন হয় মাসে? আপিস থেকে রেশন দেয় তাই রক্ষে নইলে না খেয়ে মরতে হতো সপরিবারে। খিদে পেয়েছে বড়। মোড়ের ওই দোকানখানায় এবার পানের কৌটো নিতে আসবার সময় দেখে এসেছেন বেশ বড় বড় কচুরী ভাজছে। নিশ্চয় চার পয়সায় একখানা। খেতে ইচ্ছে তো হয়, পয়সায় কুলোয় কই? একটা দোকানে বসে আধ পেয়ালা চা দু পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েই আপাতত খিদের শান্তি করলেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

পাশের ওই লাল বাড়ীটা তখন মেস ছিল, পঞ্চাশের দুই ধন্বন্তরি বোসের লেন। গোপীকৃষ্ণবাবু মনে মনে হিসেব করলেন। তেত্রিশ বছর আগের কথা। বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন উনি তখন। সে-সব দিনের কথা—হায়রে হায়, সেই বিপিন, কানু, বিনোদবাবু, শীল, মতি, ক্যাঙলা, ট্যারা শম্ভু, সুশোভন মিত্তির, কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি, কত ভাবের আদান-প্রদান! কত বড় বড় আশা ছিল মনে, বোম্বেতে গিয়ে চাকরি করবো, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, সাহেব হয়ে যাবো, এমন কি পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবো। পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবার বড় শখ ছিল তখন, কে জানে কেন। প্রথম যৌবনের নেশায় ইডেন গার্ডেনে দু-চারটি পার্শী তরুণীকে বেড়াতে দেখবার ফলেই বোধ হয়। আর একটা বড় শখ ছিল, বিলেত যাবার। সেটা অবিশ্যি তখনই একটু দুরাশার মতই ছিল, তবুও নিতান্ত দুরাশা ছিল না। সম্মুখে বিস্তৃত জীবন পড়ে আছে। কেন হবে না, হলেও তো হতে পারে। এখন কিন্তু তার আকাশ-কুসুমত্ব যতটা ফুটে বেরিয়েছে তখন ততটা হয়নি।

ট্যারা শম্ভু (শম্ভুনাথ চক্রবর্তী এম. বি.—হোমিও, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বিনামূল্যে সমাগত দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসা করেন) বৌবাজারের মোড়ে একটা ছোট্ট ঘরে ডিসপেন্সারী ফেঁদে বসে আছেন আজ বহু বৎসর—বিশেষ কিছু হয় বলে মনে হয় না।

গোপীকৃষ্ণবাবু মাঝে মাঝে আপিস ফেরত সেখানে বসে চা খান, চায়ের পয়সা বাঁচে। আজও গেলেন। শম্ভু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় নেই এই একটা সুবিধে। শম্ভু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, গোপীবাবুকে দেখে কাগজ রেখে বললে—এসো, এসো, একটা খবর দেখেছ—জাপানীরা আবার ছ' মাইল—

—আরে ভাই, ওসব রেখে দাও। নিজেরা মরছি নানান তালে, আবার পরের খবর রাখতে গেলে বাঁচি কেমন করে? চা খাওয়া ফিনিশ?

—না, বোসো, চা আনাই।

—কেন, স্টোভ কি হলো?

—পিন পাচ্ছি নে, স্টোভটার কি যে হয়েছে কাল থেকে—চা আনাই। ও মধু—। ডিস্‌পেনসারীর চাকর মধু পাশের দোকান থেকে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল ঘরের কেট্‌লি নিয়ে। দু-পেয়ালা ভর্তি করে কেট্‌লিতে একটু বাড়তি চা রইল, সেটুকু আবার পরে ঢেলে দিলে। চা খেতে খেতে শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু বিদেশ-ভ্রমণের গল্প করেন—অর্থাৎ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, করা উচিত বা করলে ভাল হয় সেকথা বলেন। এটা এঁরা দুজনে প্রায়ই করে থাকেন, দুই বন্ধুরই খুব বেড়ানোর শখ কিন্তু সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন, টাকাপয়সায় কুলোয় না, কোথাও কখনও যাওয়া ঘটে না, বলেই সুখ। শম্ভু ডাক্তার পশ্চিমে গিয়েছে মগরা পর্যন্ত, তাও অনেক কাল আগে, সেখানে ছিল মাসীর বাড়ী। গোপীকৃষ্ণ তার চেয়ে একটু বেশি, বর্ধমান পর্যন্ত। দুই বন্ধুর পশ্চিম-ভ্রমণের এই পর্যন্ত ইতি।

তবে প্রতি বৎসর পুজোর আগে দুজনে বসে বিদেশ-ভ্রমণের প্ল্যান আঁটেন নানারকম—এবার কোথাও যাওয়া যাক—বুঝলে? কত পয়সা তো কতদিকে খরচ হচ্ছে। টাকা চল্লিশ হলে একবার কাশীটা ঘুরে আসা হয়। তখন তর্ক বাধে দুজনে। কাশী না গয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণা। অবশেষে সেদিন ব্যাপার মুলতুবী থাকে। পরদিন আবার শুরু হয় আলোচনা—কি বল, তা হলে ভাগলপুরই ঠিক করা যাক্। পাহাড় কখনও দেখা হয়নি। ভাগলপুরে কি পাহাড় আছে? ঠিক সংবাদ দুজনের কেউ জানেন না। এমনিভাবে পুজো এসে পড়ে, এই একমাসে বহু নাম উচ্চারিত হয় ভ্রমণ সম্পর্কে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে দিল্লী, জয়পুর, বৃন্দাবন, শিলং, এমন কি বীরভূম জেলার নলহাটি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত কোনও বার কোথাও যাওয়া ঘটে না, শম্ভু ডাক্তারের তিন মাসের দোকানভাড়া বাকি পড়তে বাড়ীওয়ালা নালিশের ভয় দেখায়. গোপীকৃষ্ণবাবুর ছোট ছেলে টাইফয়েডে পড়ে—যায় সব ভেস্তে।

বহু বৎসর ধরেই এমন চলেছে। তবুও এঁরা ছাড়বার বা দমবার পাত্র নন। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে পুজোর সময় পর্যন্ত ভ্রমণের সম্বন্ধে আলোচনা এঁদের কামাই নেই। এতে তো পয়সা খরচ হয় না, অথচ টাইমটেবিল ঘেঁটে পাঁচটা দূরের নাম পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আজও গোপীকৃষ্ণবাবু চা খেতে খেতে বললেন—আর মাসখানেক বাকি পুজোর। এবার কিন্তু কোথাও যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঠিক করে ফেলা যাক্ আজই, বুঝলে? টাইমটেবিল আছে তো? টাইমটেবিল তৈরী। যারা কখনও কোথাও বেড়ায় না, তাদের টেবিলে সর্বদা টাইমটেবিল মজুত থাকে। শম্ভু ডাক্তার খাপ থেকে চশমা খুলে টাইম-টেবিলের পাতা ওলটান।

—আচ্ছা, চিত্রকূট জায়গাটা নাকি খুব ভাল! তুমি জানো কিছু?

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়। গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন—হ্যাঁ—তা বেশ ভাল জায়গা।

—ভাড়াটা দেখ হে—এবার ভাই আর অমত করো না। চলো চিত্রকূটই যাওয়া যাক।

গোপীকৃষ্ণবাবু ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, তাঁর মতামতের অভাবেই যে এতকাল ভ্রমণ বন্ধ আছে একথা সত্যি নয়। কিন্তু তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকূটের ভাড়া বেরুলো টাইমটেবিল খুঁজে। শম্ভু ডাক্তার বললেন—ওর ওপর ধরো আরও কুড়িটে টাকা—খাওয়া-দাওয়া—পান-সিগারেট—যুদ্ধের বাজার, বুঝলে না?

—সে তো বটেই।

—তা হলে এবার আর অমত কোরো না। এখন রেডি হওয়া যাক্, কি বলো? পুজো

তো এলো।

দুই বন্ধুতে আরও ঘণ্টা দুই বসে ভ্রমণের নানা পরামর্শ করেন। বাড়ী থেকে খাবার তৈরি করে নেওয়া উচিত। সব জিনিস আক্কা। বেডিং কি কি সঙ্গে নেওয়া যায়? শম্ভু ডাক্তার মুখে মুখে বলতে লেগে গেলেন—ধরো একটা মশারি, বালিশ—

গোপীকৃষ্ণবাবু অধীর ভাবে বললেন—আহা—আহা—মুখে কেন, কাগজে লিখে ফেলো না? কাজ পাকা করা দরকার। মশারি, বালিশ—তারপর? গায়ে দেবার কম্বল—

—কম্বল!

—সুজনি।

একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি ডাক্তারখানা?

শম্ভু ডাক্তার হাতের কলম ফেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা—কি দরকার?

লোকটা বললে—হোমিওপ্যাথিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—হোমিওপ্যাথিক—ভাল হোমিওপ্যাথিক—কার অসুখ?

—অসুখ কারো না। এমনি জিজ্ঞেস করছি—

সে চলে গেল। শম্ভুবাবু আবার এসে টেবিলে বসে কলম ধরলেন, বিরক্তির সুরে বললেন—মিছিমিছি জ্বালায়! যেমন সব কাণ্ড—হ্যাঁ—তারপর বলো, সুজনি—

রাত দশটার সময় ব্যাপারটি অমীমাংসিত ও মুলতুবী রেখে দুই বন্ধু বাড়ী রওনা হন। কথা হয় আগামীকাল আবার বিকেলে একত্র হয়ে পুনরায় আজকার খেই ধরা হবে। চলবে পরামর্শ। বাড়ী ফিরে গোপীকৃষ্ণবাবু আহারাদি করে শয়ন করেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসে না। চিত্রকূট কতদূর না জানি! কত পাহাড় জঙ্গল দিয়ে যাওয়া! অনেক দূরের ট্রেন-জার্নি! কত মজা হবে রাস্তায়! ভাল কথা, এক টিন ভাল সিগারেট নিতে হবে সঙ্গে। কত পয়সা তো কত দিকে যাচ্ছে! জীবনের একটা সুখ। বড় বড় পাহাড় দেখা যাবে পথে। পাহাড়ই কখনও দেখা হয়নি। ছুটির আর কতদিন দেরি? গোপীকৃষ্ণবাবু ক্যালেণ্ডার দেখলেন উঠে। ছাব্বিশ দিন বাকি মোটে। টাকার যোগাড় দেখতে হয় এখন থেকেই।

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর পিত্রালয় কোলাঘাটের কাছে। তাঁর এক শ্যালক মিলিটারিতে কি চাকরি পেয়ে কানপুরে চলে গিয়েছিল, আজ দুদিন যাবৎ চিঠি এসেছে যে সে শ্যালকটি বাড়ী এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া দরকার। গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন। কবে সেখানে যাওয়া হচ্ছে? এবার পুজোর সময়ে কোলাঘাট নিয়ে চল। কতদিন তো যাওয়া হয়নি। ভাইটার সঙ্গে দেখা হবে। গোপীকৃষ্ণবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি এখন তোমার সেই অজ গণ্ডমূর্খ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে সেই ধপ্‌ধপি জায়গায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলেন—হোক গণ্ডমূর্খ, তোমার চেয়ে আর তোমার সেই হোমাপ্যাথি জল-বেচা ডাক্তার বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। সে তবুও আছে কানপুরে—দেড়শো টাকা রোজগার করছে। তুমি বি-এ পাশ করে ষাট টাকায় ঘষছো, আজ সেই আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত। বেলুড়ের ওদিক কখনও মাড়ালে না দুজনে। তোমাদের চেয়ে সে অনেক ভাল।

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। গোপীকৃষ্ণবাবু চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার আপিস থেকে ফেরবার পথে গেলেন শম্ভু ডাক্তারের ওখানে। চা পানের পর আবার দুজনের নিবিড় পরামর্শ শুরু। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তার

একটা নিট হিসেব করে ফেলতে হবে। শম্ভু ডাক্তার বলেন—আশু সান্ডেল কাল এসে-ছিল তুমি যাওয়ার পরে। তার মুখে শুনলাম পথে নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশনে নেমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। চলো না কেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক্।

—পরেশনাথ পাহাড়?

—হ্যাঁ। হাইয়েস্ট হিল অন দি বেঙ্গল প্লেন। সেটা দেখা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভাল। তাই যাওয়া যাবে।

—টাকাটার হিসেব ধরো এবার। যাতায়াতে ধরো—রেলভাড়া, খোরাকী—

—টুকিটাকি জিনিসপত্তর কেনা—

—কিনতে গেলে হাতী কেনা যায়—জিনিস কেনা বাদ দ্যাও। শুধু নিট খরচ যেটা—

এইভাবে সেদিনও কেটে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ-সভা বসে। এদিন কথা ওঠে কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে। মশারি নেওয়া যাবে কি না এ তর্কের সেদিন কোনও মীমাংসা হলো না। শম্ভু ডাক্তার বলেন—যেখানেই যাও, মশা থাক না থাক মশারি সঙ্গে থাকাই ভাল। মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়, ফাইলেরিয়া হয়, আরও কত কি। মশারি নেওয়াটা এসেনশিয়াল। গোপীবাবুর মতে অতদূর পশ্চিমে পাহাড়ের দেশে মশা-ফশা নেই—এ কি আর বাংলাদেশের খানাডোবাভরা পাড়াগাঁ? মিছিমিছি ভারবোঝা বাড়ানো। ট্রাভেল লাইট। একগাদা বোঁচকা-বুঁচকি ঘাড়ে করে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

রাত দশটা। দুই বন্ধু সভা ভঙ্গ করে সেদিনের মত যে যার বাড়ী চলে গেলেন।

আবার পরদিন দুজনে মিললেন। আজকার তর্কের বিষয় খাবার জিনিস কি কি সঙ্গে নেওয়া যাবে। বাড়ীতে লুচি-পরোটা করে নেওয়াই ভাল। খাওয়ার জিনিসের আগুন দর। এক টাকার খাবার খেলে পেট ভরে না। কি কি খাবার নেওয়া যায়? লুচি না পরোটা? আলুর তরকারি নেওয়ার দরকার নেই, বড্ড দাম আলুর। কুমড়োর ছোঁকা আর কচুর ঘণ্ট দিব্যি তরকারি।

আরও কয়েক দিন এই ভাবে কাটাবার পরে পুজো নিকটে এসে পড়লো। গোপী-কৃষ্ণবাবুর মনে আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক যেন থাকে। ছোট মশারিটা সেলাই করে দাও। আর একটা ছোট ঘটী—

দিন সাতেক পরে পুজোর ছুটি হবে। গোপীকৃষ্ণবাবুর ডাক পড়লো একদিন বড়-বাবুর ঘরে। বড়বাবু বললেন—একটা কথা বলি। পুজোর বোনাসের লিস্ট হয়েছে, তাতে কিন্তু আপনার নাম নেই।

—আজ্ঞে, কেন?

—আর-বছর আপনারা ক'জন লিফট্ পেয়েছিলেন। এ বছর আবার তাদের বোনাস দিলে অন্য সবার ওপর অবিচার করা হয়। তাই ঠিক হয়েছে—

—স্যার, এ কেমন যুক্তি হলো? সন্তুষ্ট হয়েই তো আপনারা লিফট্ দিয়েছিলেন, এ বছর তবে এমন কি অপরাধ হলো আমাদের—

বাঙালীর আপিস। যা মনিবের রায়, সেই অনুসারে কাজ হবে। মনিব যা ভাল বোঝেন। যুক্তি-টুক্তি এখানে খাটবে না। হলোও তাই। অন্য সকলে দেড় মাসের মাইনে বোনাস পেয়ে গেল, গোপীকৃষ্ণবাবুর অদৃষ্টে জুটলো শুধু মাইনেটি। সেইদিনই গোপী-বাবু অগ্রিম কিছু টাকার দরখাস্ত করলেন, মঞ্জুর হোল মাত্র পনেরোটি টাকা। তাও বজায় রাখা গেল না, দেশের বাড়ী থেকে চিঠি এসে হাজির, বন্ধ্যা পিসিমা লিখেছেন—চৌকিদারি ট্যাক্স বাকি পড়েছে অনেক দিনের, এবার না দিলে ঘরবাড়ী ক্রোক হবে। পত্রপাঠ আট টাকা তের আনা ছ' কোয়ার্টারের ট্যাক্স বাবদ যেন পাঠানো হয়। গোপী-

কৃষ্ণবাবু প্রথমে রাগ করেছিলেন, যায় যাকগে ক্লোক হয়ে। ভারি তো ভাঙা পৈতৃক বাড়ী, মশা আর জঙ্গলে ভর্তি। কেন, পিসিমা বাঁশ, আম, কাঁঠালের উপস্বত্ব ভোগ করেছেন, চৌকিদারি ট্যাক্সটা তিনি দিতে পারেন না? আমার ঘাড়ে কেন চাপিয়েছেন? আমি কি সেখানে বাস করি? পাঠাবো না টাকা।

পরে তাঁর স্ত্রী বোঝালেন চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি লাভ? তাঁরই দুটি ছেলে, বেঁচে থাকলে ও-সম্পত্তি তাদেরই থাকবে। বুড়ী পিসিমা চোখ বুজবেন আজ বাদে কাল, বাড়ীঘর বজায় রাখবার গরজ তাঁর তত থাকবার কথাও নয়।

শম্ভু ডাক্তারের বৈঠকখানায় গোপীকৃষ্ণবাবু ঢুকলেন একটু মন-মরা ভাবে। দেখলেন শম্ভু ডাক্তারের মনের অবস্থাও তেমন সুবিধে নয়। চা এল, ভ্রমণ বিষয়ে কোনোও কথাই ওঠে না, অন্যান্য কথাই চলে। গোপীবাবু সাহসে ভর করে বল্লেন—তারপর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলে? শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—ভাই, এ মাসে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব গেল ছেলেমেয়ের কাপড়-চোপড় কিনতে। আগে তো ভাবিনি অত টাকা কাপড়ে খরচ হবে, একখানা করে কাপড় কিনতে তেতাল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। আর হাতে টাকা নেই। তবে পাঁচদিন এখনও বাকি, দেখি যদি এর মধ্যে কোনও শক্ত কেস্‌টেস্‌ এসে যায় ভগবানের দয়ায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুও নিজের টানাটানির কথা ব্যক্ত করেন। তবে এখনও পাঁচদিন বাকি ঐ যা ভরসা। যদিও এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র, পাঁচ দিনে গোপীকৃষ্ণবাবু কি আর ত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পাবেন, তা কিছু নয়।

শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—আচ্ছা, চিত্রকূট যদি না-ও হয়—অতদূর—

—টাইমটেবিলে একটা জায়গা বলছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন থেকে ছ' মাইল। সিনারি বেশ বলে লিখেছে—

—আজ আমার শালীও বলছিল, গ্র্যান্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশন থেকে পরেশনাথ পাহাড় যাওয়া যায়। তাই যাবে? খরচ কম হয়।

আবার রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, না পরেশনাথ পাহাড়? কোন্‌টা সস্তা? হিসেব করে টাইমটেবিল পড়ে দেখা গেল তাতেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা খরচ পড়বে জন পিছু। তার কম হবে না।—ও একরকম করে যোগাড় হয়ে যাবে এখন, বললেন শম্ভুবাবু।

আশ্চর্যের বিষয়, রোগী এবং রোগ দুই হঠাৎ কলকাতা শহরে বড্ড কমে গেল। সারা-দিনে আগে তবুও দুটো টাকাও হতো এখন পাঁচ আনার নক্স-ভমিকাও বিক্রি হয় না। রোগী দেখা দূরের কথা, ওষুধ বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ। তার ওপর শম্ভু ডাক্তারের মামাতো ভাই বিধু এসে হাজির, সঙ্গে তার স্ত্রী। দেশে চলছে না আদৌ, এতবড় ডাক্তার পিস্‌তুতো ভাই থাকতে তারা কি না খেয়ে মরবে?

গোপীকৃষ্ণবাবুর অবস্থাও যে ভাল তা নয়। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর ভাইঝি-জামাই দুটো ইলিশ মাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে হাজির। গোপীবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—ওগো শুনছো, জামাইয়ের ও-মাছের টাকা দিয়ে দিও যাবার সময়।

গোপীবাবু রেগে উঠে বললেন—কেন? আমি কি বলেছিলাম আমার বাসায় মাছ কিনে না আনলে আমরা সবাই না খেয়ে মরতে বসেছি? পাঁচ টাকা খরচ করে একজোড়া মাছ না আনলে চলছিল না?

—ছিঃ ও-কথা বলতে নেই। জামাই মানুষ, এনে ফেলেছেন যখন তখন সে দাম দিতেই হবে। সবাই মিলে মাছটা তো খাওয়া হয়েছে? জামাই একা খাননি।

—খাননি তাই কি? আমার সংসারে এক পো খয়রা মাছ কিনলে চলে যায় ছ' আনা

দিয়ে। পাঁচ টাকার মাছ কিনে একদিন খেয়ে আমার লাভটা কি হলো বলতে পার?

যতই উল্টো তর্ক করুন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সুবোধের মত মাছের দামটা জামাতা বাবাজির হাতে গুঁজে দিতে হলো যখন তিনি যাচ্ছেন। মিটে গেল ব্যাপার। আটটা টাকা বুক করে রাখা ছিল, তার মধ্যে ইলিশ মাছের ঠ্যালায় গেল পাঁচটা টাকা অকারণে বেরিয়ে।

শম্ভু ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে দুই বন্ধু কথা বলছেন। এবার কিন্তু ভ্রমণের আলোচনা নয়, কোথাও যাওয়া তাঁদের হবে না দুজনেই বুঝেছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বস্তাপচা আটা ময়দার কথা উঠেছে। ভ্রমণের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বলেননি আজ। কাল ষষ্ঠী।

হঠাৎ গোপীকৃষ্ণবাবু উস্‌খুস্‌ করতে করতে পকেট থেকে একখানা রঙীন কার্ড বের করে বললেন—হ্যাঁ—এই বলছিলাম কি, আমাদের আপিসের বঙ্কু সরকার কাল আপিস বন্ধের দিন এখানা দিয়ে গেল। ওদের গ্রাম লাঙলপোতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে তারই নেমন্তন্ন। রামায়ণ-গান হবে, চণ্ডী হবে দু'রাত। যাবে? বেশি দূর নয়, বারাসত স্টেশনে নেমে দু মাইল। চলো, পুজোর ছুটিটা তবুও কলকাতার বাইরে—আর সে বেশ জায়গা, ছেলে-ছোকরাদের দল মিলে রাস্তা করেচে, ঘাট করেচে, জঙ্গল কেটেচে। একটা পুরনো শিবমন্দির আছে নাকি অনেককালের। তাহলে কাল সকাল সাত-টায় শেয়ালদ' থেকে দত্তপুকুর লোক্যাল ছাড়বে—ওতেই চলো যাওয়া যাক্‌। দেখবার মত জায়গা।

শম্ভু ডাক্তার উৎসাহের সঙ্গে বললেন—বেশ, বেশ, সে বেশ বেড়ানো হবে এখন। চলো তাই, আমি ঠিক সময়ে রেডি হয়ে স্টেশনে হাজির হবো কাল।

পরবর্তী তিনদিন দুই বন্ধুর পরম আনন্দে লাঙলপোতায় কাটে।

সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের নিজেদের তৈরী মেটে রাস্তা, শনিবার সোমবারে হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে রাঙা আলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হলো নবমীর রাত্রে। পরদিন হলো গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা। খাওয়া-দাওয়াও কদিন বেশ হোল। বঙ্কু সরকার অতিথিবৎসল লোক।

খুব খুশী গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার।

বাক্স বদল

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হোত না। সব স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পুজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটরবাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে না গেলে কি চলত না?

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। বাক্স, সুটকেস, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থবেঙ্গল এক্স-প্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি ওঁরা জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হোল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা ভাল বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁর বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পর-

স্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সিট। দুটি মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু'একবার অল্পক্ষণের জন্যে চেয়ে দেখেছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারি আছে বলে এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি!

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ!

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের এখন গেয়ান কি হয়েছে বাবু? খোকাবাবুর নাম কি, ও খোকাবাবু?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু'একটা চাষা-গাঁ।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে ভীষণ কষ্ট হোত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কিনা।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজী বই—'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স'। ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পেঁছিল।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি, বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনও বিয়ে হয়নি! কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটির? বালুরঘাটে কার মেয়ে?

—হিলি! হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার! স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে!

—ওরে, নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পনের কৌটোটা কোথায়? দেখ দেখ, বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে। ব'স্ না চুপ করে, গাড়ী দেখবি তো ইস্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই, তিন, চার—গাড়ীর ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে, ওই লাল সুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি,—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজেই সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পেঁছিল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে ভাটখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়ায় নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু মাইল তফাৎ দিয়ে রাঙাপাড়া রোড দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জন জায়গা। দূরে অনুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মত দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ওকাজ তার পোষায়ও না. সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ী গিয়েছে দু দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হোল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসত।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে—ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমায় নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু দিন, তাড়াতাড়ি যা—। কোন কেস ছিল এ কদিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অন্য কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে!

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু সিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

স্যুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্যুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র? শাড়ী কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ-বেরঙের শাড়ী, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি ; এছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রিম, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, ফাউনটেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না, চিরুনি, আরও কত কি। সর্বনাশ!—কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হোল, তার বোন কমলার স্যুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ী ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন জায়গায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স ; কমলা বাড়ী বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছ-কয়েক সরু সোনার চুড়ি ; নতুনওঠা কাঁচের চুড়িও দু গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসানো, কাজ-করা। একটা মানিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলী স্যুটকেস। পুরুষের নামগন্ধ নেই স্যুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। স্যুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হোল? ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে? মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনও মেয়ে তো ছিল না ; পার্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল ; তাদের মধ্যে এ স্যুটকেস কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের স্যুটকেস।

আচ্ছা, মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে; তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?—তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে-কোনও মেয়ের স্যুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিচ্ছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলিক্ষুরে প্রতুল কখনও কামাবে না, দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মত হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়েনি। কি এখন সে করে?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই স্যুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ি আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায়!

শাড়ী বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ী যা আছে সব জরিপাড় ; আর তাঁতের দামী শাড়ী শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা ; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ী যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ী আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে,

কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ী? আর সাদা ব্লাউজ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ী পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজারকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হোল না। রঙিন শাড়ী পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর হিয়ার অলরেডি! থট ইউ ওন্‌ট বি হিয়ার বিফোর টু-মরো।

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'জ অ্যামিস?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ? ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে,—সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার স্যুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মনিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হোল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন, ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

—ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়্যার জন্য আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালো। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স এই পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে—না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিশি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তার রোমান্স!

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে স্যুটকেস বদল হোল? বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারও সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওর সেই বইখানা 'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্‌স্' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না

কায়স্থ না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়ল স্যুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে স্যুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসল।

চিঠি খান-পনের। একজনেরই হাতের বেশ শৌখিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, C/o সি. আর. পাল, ২২/৬ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ী নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই স্যুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো স্যুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্ছা যাবে! দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই স্যুটকেসের মধ্যে! তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়ের কোন উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ। শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার স্যুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সে স্যুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। স্যুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটি তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অন্তত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের স্যুটকেসটি কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিসে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্যবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার স্যুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার স্যুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, স্যুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনস্যিওর্ড

আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার স্যুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি তা বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী এসে জুটল মাঝখানে। তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে স্যুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের স্যুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও তালের পাটালি পর্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা মনে জাগে বই কি! বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জন জীবনে। তা ছাড়া, কোন্ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ী রওনা হোল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালবাসে। কমলার বিবাহের কথাবার্তা চলছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ী যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হোল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে স্যুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে স্যুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা স্যুটকেস।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কন্ডাকটারকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ী থেকে কোনও লোক আসেনি?

কন্ডাকটার বললে—ডেপুটি সাব? নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা।

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরও বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ যখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর স্যুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জন বাংলোতে —এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীদের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সিটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির? সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্বে মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে,—আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরণ ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে নর্থ-বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব? তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠল প্রায়। বললে—কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পেঁছে দেব বাড়ী, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেলে। কিন্তু মুখে বললে,—আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাটে নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়ীতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্য কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা

আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।...অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার স্যুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য, আমিই ভাটিখালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও! আপনি প্রতুলবাবু! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

—সেবার বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন —না?

প্রতুল হেসে বললে,—হ্যাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স-বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ? আমার দোষ, যতই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

—স্কটিশ চার্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি-এ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু? মামার বাড়ী থাকেন বুঝি?

—না, মামার বাড়ী ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ী করি?

মেয়েটি বললে—গাড়ী করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হোল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেতে চাইলে—সে কথায় তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স-বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ীর মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এলে তাকে

বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো। আপনি অতি মহৎ লোক। এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরমাত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ীর মধ্যে ওর কাকীমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন।

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি-একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বস্ একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই, অনেকদিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহুদিন থেকে। আই-এ-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি-এ পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম-এ পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ীর মধ্যে বলছে এ বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও-বেলা ধীরে সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম. বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা, বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা-জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসার, বাপ-মা-মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব, এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়ার্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স-বদল করবে? অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, ব'লো না! কি কষ্ট সেদিন আমার! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙি, শার্ট! মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝি নে। বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক। কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার! আর বাক্স-বদল হোল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে! বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে, গুড়, পুরনো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো!

প্রতুল বললে—হায়, হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে!

অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না। শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ! তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। অফিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশী কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তার-বাবু? যদি দু'একটা কথাই করো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ্!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার

রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহ দেন নি ; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পুজো করতে যেতেন, আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক্ ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মনুষ্যে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধ'রে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল।

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটে নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো-চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিলখিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপ্পর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়ীতে ছাগল ঢুকে নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুক-পূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজোনো হ'ল, হালুয়া তৈরী হল, পেয়ালায় ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি?...

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি?

—তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরী করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ী তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল! দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ! দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখেনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ী থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময় দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ি পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠ্‌ল; যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ী বেড়িয়ে আম খেয়ে ফুর্তি করতে। সে জষ্টি মাসের দুপুরে রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে একদিন বললে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েচে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ী ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ী থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

এখনই যাবি কেন, বোস আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি— ; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ারমুখী মেয়ে, এই ভর সন্ধেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে!—হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ী আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে

ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন যাচ্চে আসচে। শান্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিন-রাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স্ পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মতান্তর চলচে। হীরু জানত এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে, নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূর্বদিকে শৈলসানুতে, একটি বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্‌চে—পূবদিকে দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যান্ড্‌উইচ্, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্মো-ফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার ক'রে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই।

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় থেকে উদ্ধার করো না—তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেছি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর

উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি···সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন, তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পুজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমার আর ঢোঁক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি। আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গে ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেনেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি করে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ, একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশী হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বোরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি অসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে...হাত-পা নড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেচে...নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি...

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেল। নতুন এম-বি পাস ক'রে জামালপুরে প্র্যাকটিস করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠা-মশাইকে মেয়ে দেখতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হ'ল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দিতে পারবো কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল তো? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বললে—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্যে তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুরমতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা! আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ্, কথা শোন,—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না।.....কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট ক'রে বলবার আগেই আহত লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

এই রকমে কীর্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হল না.....সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বতপ্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিত কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলোকাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইঁটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙ্গা থামের অংশ—বারভুঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে, বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা-কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বন-ভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে.....সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতে থাকে.....তখন খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা ওগো নৌকাযাত্রীরা.....আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম.....দয়া করে আমাদের তোল.....ওগো আমাদের তোল.....

ভয়ে বেশী রাত্রে এ-পথে কেউ নৌকো বাইতে চায় না।

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩১

বউ-চণ্ডীর মাঠ

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকো ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও.....

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল সরে গিয়ে একটু একটু করে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন খোলা হয়েছে? যত শীগ্‌গির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়.....

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিছনের নৌকো থেকে

লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলের সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটি নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল—বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙ্গায় নৌকো লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক শুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম—Tenancy Act কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়.....

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ লতানো গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া কটা ঘাসওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌কিচ্‌ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতার ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বন-মূলোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।.....

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকোখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুল-পুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই? সামনের এটা, না ওই পাশে?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হ'ল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন? আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হ'তেও তো পাঁচ ছয় মাস.....

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী.....

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পুজো দিতে আসে, বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নইলে মেয়েদের একটু অসুবিধে.....

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত শুরু ক'রে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করেছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরণের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চক্কত্তি মশাই? আপনাদের কি কোন.....

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই, বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোক এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাঁদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাঁদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ব'লে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী দলের সামনেও ঘোমটা দেয়; সকলে বললে, যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁষ নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্যই এ রকম করে! ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে কোন পুরুষ-মানুষ দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সেদিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়, সে জনেজনের পায় প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝ মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ করে দিল। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোন দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ী সুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল; সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম ক'রে আর পাঠিও না.....তোমাদের পায়ে পড়ি।.....

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হয়ে গেল।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গবে—নইলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাগ লাগে?.....ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে

গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায়নি। তখন সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে ; পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্য কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়াচাড়া চলল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠান্ডা হ'ল। এই মাঠের পুবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইত—ম'জে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরীদের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্যন্ত বংশে একজন কে ছিল, উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর-আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।.....কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠছে।.....সমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে সাদা কাপড় প'রে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে—তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে।.....মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলেভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু ক'রে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে.....তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে।.....

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উলো-চন্ডীতলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামবধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চন্ডীর পুজো দিতে আসে। বউ-চন্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতির স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পুজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পুজো মানত করবার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন।.....

চক্রবর্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুর্ সুর্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে দূরে একটা পুরনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকোর গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্য-বধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ

ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।.....পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন অপরাজিতা ফুলের রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়.....ছাতিম বনের পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হু-হু ক'রে হাওয়া বয়.....সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পূব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত!.....

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল—সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা দেওয়া ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা-কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত!.....

বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪

আরক

লাহোর মিউজিয়ামে যখন চাকরী করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত "দেশবন্ধু" কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে তিনপুরুষ পূর্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুরে যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দু'পেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূম-পানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বল্লাম—মিঃ সিং, আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত?

মিঃ সিং গম্ভীর সুরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হ'ত না। সে বড় আশ্চর্য ঘটনা।

—আমি বল্লাম—কি রকম?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় সৌখীন মানুষ ছিলেন—আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংহের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ!—এক দম। কেন তিনি উন্মাদ হ'লেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সে কথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিংহ তাঁর অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্তি করতে। তাঁর দু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া! একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তা'তে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর খেয়াল হ'ল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাঁকে সেখানেই বালুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদা চেয়ে দেখলেন বালুর চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরণের কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি—চক্রাকারে ঘুরচে! কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল ওরা যেই হোক্, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা দু'জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনি নি। হয়তো এ'দের মত্ত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনও নি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে এ'কেবে'কে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশী উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হ'ত

ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে' বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হ'ল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে না—শুধু বল্লে জায়গাটা ভালো নয়! ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে,—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আড়ৎ ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারী করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এ সব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈচৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরণের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সে রাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন! ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেবো—

—মাপ করবেন, হুজুর। এক শো রুপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখি নে—এই হাতে তীরে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্যতাপে চক্ চক্ করচে। জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময় ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মত তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন, হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পূবের পাহাড় ডিঙিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা

দ্বিতীয়ার। দুদিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি রহস্যময় হয়ে উঠেচে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হ'লেও তাঁর যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্না-লোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মত পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দু'শো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি। এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা, বা আরও হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্যের মত গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েচেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিষ্টার ব্যানার্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বল্‌চি বানিয়ে, অন্তত এটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মত নয়—অনেক বড় অনেক—অনেক বড়। হাঁসের মত তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হ'ল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মত চেহারা বিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা। পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামলো এবং হাঁসের মত সাঁতার দিয়ে, তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত চকিত, দুঃসাহসী, আরকসেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্‌ করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মত সুঠাম ধরনে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না। কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব দেহগন্ধে ভরপুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে।

সেখান থেকে পেঁছিলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল ভৈজি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বলেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেন নি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্যহংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

এদিন তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরী নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি নে ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চল্লেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্যহংসের মত সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পেঁছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজি ঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভাল হতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভাল অবস্থায় বাড়ীতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয় অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তাঁর মোটেই ভাল অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বললেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সবাই বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশ-পরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যে। তখন আমার জন্মই হয় নি।

শারদীয়া মৌচাক, আশ্বিন ১৩৪৯

হাসি

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধুতে বেশ ক'রে র‍্যাগ টেনে নিয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলা দেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে—ওহে, তোমরা যা বোঝো করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি.....

দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীক্ষ্ণ শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢুকতেই আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম.....রমেন ততক্ষণে চলে' গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াসা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে র‍্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়েছিল, হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে—দেখ, আমার কিন্তু একটা Uncanny Sensation হচ্ছে, কেন বল তো?

আমি বললাম—কি ভাবের Uncanny? ভূত টুত?

সে র‍্যাগ খুলে ফেলে ইজি-চেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে—তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন.....

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে—বিচিত্র নয়। আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই ছিলেন—সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে পড়ে আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষরাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ক্ষুর বার করে নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে—তারপর কি হোল তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিংরুমের বাথরুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়র কি জন্যে একবার ঠিক ওই ভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার.....

আমরা সকলে আমাদের বাথ-রুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে, লাইনের ও-পারে কেবল স্টেশন-মাস্টারের কোয়াটারটা এবং লেভেল-ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিংরুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চা-এর দোকান। দিনমানে এমন কি.....সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তার পর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই—দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

গল্প ভাল করে জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে—দেখছো? Where there is a will, there is away। বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই? স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন—বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙালী, চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন.....

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে—এই যে মিত্তির-মশায়,—আসুন অসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—ইনিই এখানকার স্টেশনমাস্টার হরিদাসবাবু। আসুন

বসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতলশূন্য বেতের কেদারাটাতে আমাদের সকলের উদ্দেশে অভিবাদনের জন্যে হাত উঁচু করে গরুড়ের মত বসে আছেন। মিত্তির-মশায়ের বয়স পঁতাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে—গোঁপ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কত দিন আছেন মিত্তির-মশায়?

—আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে মেলে না, বাঙালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হোল। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম—তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর.....তা আপনারা কতদূর যাবেন সব?

—আমরা সাইকেলে দিল্লী যাবো বলে বেরিয়েছি, ও-পার থেকে আসছি কি না? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে গিয়ে গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে—ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক এখানে ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেন-ঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদানপ্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিষটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রতীপ্ত করার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমে ভূতটুত নেই তো? এ প্রশ্নের পরে সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথ-রুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হোল এবং কেউ কেউ এমন ভাবের ভান করলেন যে এ-স্টেশনের বাথ-রুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে—যত সব গাঁজাখুরি.....

হরিদাসবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে' গেলেন।

অনেকদিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো-তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পুজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হোল প্রায় একমাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরানো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-

মধু সংগ্রহ করে কিনা পাহারা দেবার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোট ও স্টীমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি!

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্নছবি মুদ্রিত আছে। তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো—শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে-দেশে যাইনি, অনেক-দিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের—বিশেষ ক'রে জ্যোৎস্না-ওঠা সুন্দর-বনের ছবি.....অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড়.....নতুন পাতা-ওঠা গাব-গাছের ও বন্য গোল-গাছের সারি.....খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ, যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল—তাদের একটা বড় লঞ্চ বড়-গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার-পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী—সবাই বাঙালী, সবসুদ্ধ সাত-আটজন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হোল, তারপর একটু গান-বাজনাও হোল। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হোল, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা-ওঠা বনের মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছিল। দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল। জোয়ারের জলে মগ্ন গোল-গাছের আনত শাখাগুলো ভাঁটার পরে একটু একটু করে জল থেকে উঠতে লাগলো.....বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ও-ধারের তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরনের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভেতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এ-সব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম বটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছই-এর ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি-একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন—আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান-মঞ্জরী পড়ছি—বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাঁটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন-গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হোল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার।.....হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হোল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে.....মাটি যেন কাঁপছে.....বোটটা যেন দুলছে!

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—সুমুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে।.....

বিনোদবাবু বললেন—কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

শব্দটা এত ক্রূর ও মর্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো—আল্লা! আল্লা! কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন—কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হোল নৌকোটা সেখান থেকে সরানো যায় কি না। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড়-গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোন মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হোল। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে আর একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি তখন নিস্তব্ধ—চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার! আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার-ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষ রাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক-বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টীমলঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে' সে-দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘরবাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল-গাছের সারি দেখে মনে হয় কোনো সময়ে সে-সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক—আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে জনহীন জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাসভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল।.....তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে।

খুঁটি দেবতা

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে। জোয়ারের

সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাঁটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটাই দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব-স্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরনো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঞ্জা দখলে আসিলেও চরটা প্রজাদের কোন উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলু-খড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারের কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা। ছই-এর মধ্যে কে?.....

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই.....

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দ্যাখো কান্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পূবদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা——

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে! ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধান করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুর যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখা-পড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইস-ম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পূবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?.....

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে

বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন ; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে? তুমি উত্তর দিকটা থেকে দ্যাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনোদিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুনা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না ; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরারা এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়।.....এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজখানি!.....

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে কড়জোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি.....

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক

চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কণ্ঠিকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত ; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে!

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ, চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।.....

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত ; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল ; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়, ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে' চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে' চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা —ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল! মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগাগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া এক-জোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা.....এগারোটা.....বারোটা.....রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা!.....রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?.....উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম.....ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?.....রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি রাতে রাঘবের চোখে একটুকু ঘুম আসিল না পলকের নিমিত্ত—রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুরু গুরু করে—আজও বোধহয় ঘুম.....

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল! রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোক-জনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা

হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে' ভাববে--আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে' দ্যাখো দিকি? আর সকাল সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। ঘুম যদি না হয়? .....পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধা-কৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা.....এক ঘণ্টা.....এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন.....বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিতেছে কেন?.....না.....এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।.....রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই —কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?.....না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?.....যাহা হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক, এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুট্‌কী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন--তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্। এখনও জন তিনেক বাকী। .....রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।.....এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র.....মিনিট পনেরো দেরী—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন।

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট?.....এ সব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়.....

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?.....ওটা কিসের শব্দ?.....বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?.....সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো

একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথায় শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?.....

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে! রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও সব মাথা গরমের দরুন.....

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর-রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।.....ঘুমান নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারার মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে.....

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা.....

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!.....

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই!.....

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে

শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও, খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি!.....

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটাকার পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপ-বিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি দেবতা সেই হইতে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

পেয়ালা

সামান্য জিনিস। আনা তিনেকের দামের কলাই-করা চায়ের ডিস-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওরা ঢুকল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল ; সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার স্বর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয় ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েছে!

উঠোনে দুখানা গরুর গাড়ী। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপ-তোশকের বাণ্ডিল নামাচ্চে। একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিস—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝরি, হাতা। খানকতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁঠাল কাঠের নতুন জল-চৌকী। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু-ভাঁড় খেজুর গুড়, আরও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন ; কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয়নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা শুরু হয়ে গেল, ওই তো হল মুশকিল! সব পালাতে লাগল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা ছ'টা মড়া ফেলছিল, পুলিস এসে বন্ধ করে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমে বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রিসিক্রী

কাঁচকলা, এখন খোরাকি, গাড়ীভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে বসে। কি ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হ'ল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্‌টা-মানপুর থেকে কে একজন, যদু চক্কোত্তি না কি নাম—একখান ছই-এর গাড়ি পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলে-মেয়ে, বৌ ঝি, সে একেবারে গাড়ি বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ি রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্তিরেই ধরল তাদের একটা ন-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ি খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সামনে, উঃ!

কাকা ভুষি-মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়িতে ফিরে আস্‌চে, কাল সকাল নাগাত পেঁছুবে। গাড়িতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

কাকা খেয়ে উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বললে, এই দ্যাখো জ্যাঠাই-মা, বাবা এনেছেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বললে—বেশ, কেমন, না? মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউবওয়েলের ব্যবসা করি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে-ওখানে বড় ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াতে হয়; বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু-চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওঁর মুখে সাবু ঢেলে দেওয়া হ'ত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারি নে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি? যত সব মেয়েলি কুসংস্কার!

পরের বছর থেকে আমার টিউবওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর-দূরান্তের পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউবওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—

বাকী সময়টুকু যায় আর-বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করে নি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন—সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্তা, কেউ কাউকে মেনে চলতে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা করতে হবে ঠিক এই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছ-মাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম, —এ-মেম্বর ও-মেম্বরকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন ওদিকেও কাজ মিটে গিয়েচে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্বদা শহরে না থাক্‌লে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউবওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখনো অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বলবেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবেন। এরা মরেনি, বোধ হয় মরবেও না কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজভাবেই সব মেনে নেয়, সব অবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউবওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটোছুটি করে, কে-ই বা কষ্ট করে? শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানি নে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হ'ল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাটল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউবওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাই নে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাই নে, শুধু টো টো ক'রে দূরদূরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এস্টিমেট কষা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামে থাকতে, আপনার লোকেদের কাছে বসে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয়তো একটু বসে ভাবতে, হয়তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষী করতে—শুষ্ক টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না।

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছিলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্ছেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে তো অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস করো; আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কামড়েছিল না, ঐ দিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল আমার মনে নেই।

আমি চমকে উঠলুম, বললুম—কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগন কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে, এ খবর আমি কাউকে বলি নি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভালবাসতেন বলেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী শিউশরণের শালীর ছেলে সে—সে-ই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনও পর্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বলছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েছে সে আর ফেরে নি। জান্‌ত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হল যেন একটা ক্রূর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু ...যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু...

পরদিন দুপুর থেকে মনুর অসুখ বাঁকা পথ ধরল, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মনুর মৃত্যুর পরে পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার

সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখনো দ্যাখো নি, তাই ধরতে পার নি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কত বার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোন উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জান্‌তে তুমি এ কথাটা?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলা-পাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে তো? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না তো?

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী? সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজন ধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনও আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাত চেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান দ্যুতিবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনও বর্তমান আছে, তাহা সেই হতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে

একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দূরান্তরের এক অপূর্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকি বাঘে গরুতে নির্বিবাদে একই ঘাটে জল পান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরীবংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বারাকপুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে বারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেই তরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত-গৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সে প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।

ইতিপূর্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রতা ও প্রচুর মকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল-সাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূর দক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিখুঁত ভাবে মকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্তক্রন্দনে নিঃশব্দরাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনও ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বাল-বিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়-স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহিরবাড়ীতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবধূ বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখীমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখী মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোন স্ত্রীলোকের বাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ-রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের সহরের তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজ্যজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্মা দিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ!

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে?...ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্।—কতদূর থেকে আসছে?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিভব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল, না—না, আমি রানী হ'তে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন।

আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথা শেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এমন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল। সেই রমণী কহিল, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার ভাল হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভাল আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তবে আমার অভিশাপ কখনও সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপনারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ঐ অবলার সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রানী শ্রীক্ষীরোদা-সুন্দরীও তাঁহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তো চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাতদিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিতে চলিলেন! অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পর-স্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখ্‌নউ, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজি-কুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুরলহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলেন যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়ীতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়ীতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়িতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন।

কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই। দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন!

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার বিভীষিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শঙ্করনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি হইয়া। ইংরেজি শিক্ষার তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অবিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল; তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়ীতে খাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়া বসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোন বন্দিনী বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষহিষ্ণু চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী যেন ঐ ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শঙ্করনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতা সহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন দেবতা আবার যেন চৌধুরী-বংশের নষ্ট-সম্পদ ফিরাইয়া দেন।

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শঙ্করনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, বাছা, পথ ছাড়, আমায় যেতে দে।

শঙ্করনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয় নি?

—না। আমি রক্ত চাই!

—কার রক্ত মা?

—তোর ছেলের।

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শঙ্করনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী, এ কি পরীক্ষা তোর! তখনও তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শঙ্করনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীরপদক্ষেপে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাঁহার পুত্র মাতার স্তন্যপান করিতেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শঙ্করনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল; কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে, এই সান্ত্বনায় পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল?

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন, ওগো, কথা কও, কথা কও! আমার খোকাকে এনে দাও!

শঙ্করনারায়ণ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হৌক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কুলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজও পর্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনও সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও

এমনি ঝড় উঠিয়াছিল ; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ঐ শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছ-টার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।

বৈদ্যনাথ

তিনদিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরনের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না—কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া তেম্‌নি। রাস্তায় রাস্তায় জল বাঁধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো, দোকানে দোকানে সাম্‌নের দিকে তেরপল ফেলা, পথেঘাটে লোকজনও খুব বেশী চলাফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভাল লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম।

বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা,—ও দাদা—দাদা শুনুন—

আমাকেই ডাকিতেছেন নাকি? ফিরিয়াই চাহিয়া দেখিলাম। যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো ষোল বয়স, পরনের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁক্‌ড়া, খালি পা ; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিনতে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও! সেজ মামার ছেলে বোদে! এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আর দেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ্‌ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ি হইতে পলাইয়া হুগলীতে কোন্‌ যাত্রার দলে ঢোকে, বছর খানেক খোঁজখবর ছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিং পত্র পাওয়া যায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কায়েমী সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাটা শুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন। সেযাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়িও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছরখানেক ঘুরিয়া বোদে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়ি আসিল ও সৎমায়ের কাছে জমা রাখিল। অত বড় ছেলে বাড়ি বসিয়া খায় ও দু'তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তার পরদিন এক টাকা। চুল ছাঁটিতে হইবে, শার্ট তৈরী করিতে দিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চারি-পাঁচ টাকা লাগে। তাছাড়া চা, বাবুগিরি, সাবান, কলিকাতায় যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল, বাকীটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত শখের খরচ যোগাইতে ব্যয়িত হয়। সেজ মামার সংসারে অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও দু'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজমামা স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংস করিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজমামার বাড়ির (শ্বশুরবাড়ির গ্রামেই সেজমামা ইদানীং বাস করিয়াছিলেন) কাহার পকেট হইতে টাকা

চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর-দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা—বন্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে। বন্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বন্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজচিস্ কেন? আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা? শ্রীরামপুরে যাস্ নি আর?

শ্রীরামপুরেই মেজমামার শ্বশুরবাড়ি।

বন্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।—না দাদা, সেখানে বাবা বাড়ি ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকা রোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়ায় কে? গেছলুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নৈলে কি আমি না খেয়ে মরবো? মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। এ রকম কোরে ক'দিন কাটে? সতেরোই আষাঢ় বাড়ি থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম—এ ক'দিন ছিলি কোথায়?

—গাড়িতে গাড়িতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লী এক্সপ্রেসে গেছ্লুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুর্‌চি ক'দিন—আমার তো আর টিকিট লাগে না। ধরবে কে? এ গাড়িতে চেকার এল, ও গাড়িতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বল্লুম, গরীব ভিখারী, পয়সা নেই। বল্লে নেমে যাও। নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেনে আবার চড়লুম। গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি।

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর মামার বাড়ি যাস্ নে কেন, শুনেচি তাদের নাকি বেশ অবস্থা ভালো?

—ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ি গেলুম। বড় মামা বল্লে—এখানে কি জন্যে এলি? দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের? তুই আর এখানে আসিস্ নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বন্দিনাথকে কিছু খাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়। মনে কষ্ট হইল—ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটে আশ্রয়-অভাবে আজ দিল্লী, কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মত সবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্যন্ত! বেচারী তবে যায় কোথায়? বলিলেই তো হইল না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুই রাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বাড়ির ছেলের মতন থাকবি, কোন কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বন্দিনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম—পথে যদি দরকার হয় রইল তোর কাছে।

শনিবার রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বন্দিনাথ বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-

যত্ন পাইতেছে। কাপড়-জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে, বন্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ' আনা ছাঁটা, বেশ টেরী কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি, বন্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন্—দিন্ না?...

আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরের মেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট ভাইঝি হয়—তার জিনিস কাড়িয়া লইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে! পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর কাকাকে দে—তোর জন্যে এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেবো'খন। কেমন তো?

পাঁচী আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বন্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বন্দিনাথ বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সকলকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছে হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠে জলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্য বাড়িতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেহ বকুনি, মার-ধর করে—এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বন্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম—ওদের কথায় তোর থাক্‌বার দরকার কি রে বোদে?... ওরা যা খুশি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বন্দিনাথকে বাড়িতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বন্দিনাথ কোথায় দেখ্‌চিনে যে?

শুনিলাম সে বাড়িতে প্রায় থাকে না, দু'বেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র, স্টেশনের কাছে—কোন্ পাঁউরুটির দোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিনরাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল—আমার সে সাবানখানা বন্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি না দিস্ তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া চা খাইতেছি—বন্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে। বন্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক্, দুষ্টুমিই করুক আর যাই করুক, বাসার একটু-আধটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্ছে। বয়েস কম, দুষ্টুমি একটু-আধটু করেই থাকে!

দু'তিন দিন পরে বৌদি আবার কতকগুলি অভিযোগ বন্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওই কথাই আমি বলিলাম। বৌদি বলিলেন—কবে কোন কাজ করে ও? কে বলেছে তোমায় ঠাকুর-পো? শুধু খাওয়া আর পাঁউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এ ছাড়া আর কি কাজ ওর?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তো সেদিনও তুমিই ওকে বাজার করতে দিয়েছিলে, আলু না কি—এর আগেও তো অনেকবার—

বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি! কবে—কৈ আমার তো মনে হয় না, কে বল্লে?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে? আচ্ছা দাঁড়াও, ভজিয়ে দিচ্চি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বন্দিনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বৌদিদি বলিলেন, তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বন্দিনাথকে কখনও কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বন্দিনাথ এটা-ওটা বাড়ির ফরমাশের ছুতায় আমার নিকট হইতে দু' আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ ছোকরা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মশগুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবা বাড়িতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায় কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেনে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখন পর্যন্ত বন্দিনাথ বাড়ি ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ি আসিলাম মাসখানেক পরে।

বন্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজার অল্পই দেরি, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড়-চোপড় কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে? হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশী। বাড়ির ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দসই জিনিস কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে, কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বন্দিনাথ আর্জি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই, জুতা চাই, শার্ট চাই, গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন? থাক এখন, পূজোর পর দেখা যাইবে। দু'জোড়া কাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা শার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই? পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আস্‌চে শনিবার চীনে বাড়ি—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠকখানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার-হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ি?

জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কি চাই?

মড়ুইপোড়া বামুনের মত চেহারা একটা পাকাসটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধ ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয় শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন?

—হ্যাঁ, ঐ যে লম্বা, একহারা কালোমত চেহারা, ছোক্‌রা, ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে। বলিলাম—হ্যাঁ, কি করেচে শুনি?

—কি আর করবে, সর্বনাশ করেছে মশাই। আমাদের ঐ ইস্টিশানের মোড়ে রুটি-

বিস্কুটের কারখানা আর দোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন। আমার নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরামরতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করি, পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচে বলছিলেন?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বন্দিনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে নাকি পৃথক হইবে। রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ি আছে, তাহারই ভাগে পড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে। রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেন্ডারদের কাছে যাইত—এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোন অবিশ্বাস করিত না। ইদানীং রতন তাহারই উপর কেনা-বেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত। গত কল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে; বন্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এ বন্দিনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনো রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যেই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বন্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা-কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বন্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বন্দিনাথ, তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বন্দিনাথ পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া বিদায় হইল। এর পরে বন্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেনে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাচা গলায় বন্দিনাথ। ব্যাপার কি? সেজমামা ও মামীমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়া আসিলাম, তবে বন্দিনাথের গলায় কাচা কিসের? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই বন্দিনাথ আমার গাড়ির দরজাতে আসিয়া পৌঁছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে, সম্প্রতি তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি।

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ! কি বিপদ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

একদিন বড় মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড়মামা বলিলেন—ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এল। তোমার মামীমা বল্লেন, বোদে তুই তো এলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সা নেই দেখ্‌ছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকীর বালা সামলে রাখো। তোমার মামীমা তখ্‌খুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলেন। খুব

সকালে বন্দিনাথ চলে গেল, আমি তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হোলে দেখি, আমার বাঁধানো হুঁকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ্ খোঁজ্—আর খোঁজ্!...কার কীর্তি বুঝতে বাকী রইল না। সেই থেকে আর তাকে দেখিনি। ছোক্‌রাটা এমন করে উচ্ছন্ন গেল! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি?

পুজোর পরে সেজোমামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরের জমিদার কাছারী হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বন্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেল্ হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটে আমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বন্দিনাথ ভাল হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বন্দিনাথকে বাড়ির সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই-তিন বাসায় থাকিল, একদিন সকালে বন্দিনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বৌদিদি আসিয়া বলিলেন,—বোদে, এই বাটি রইলো আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস্ তো! বন্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বন্দিনাথ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশী নয়।

বন্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলকাতায়, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্তি—খালি পা, বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরনে ততোধিক ময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল, হ্যাঁরে বোদে, বাটিটা কি করলি রে?

এই একবৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়া ছিলাম। বন্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'-একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লেখক

রবিবার। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রে একটু ঘুমুবার উদ্যোগ করবো ভাবচি—এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—সীতানাথবাবু বাড়ী আছেন?

কে আবার রবিবার দুপুরে বিরক্ত করতে এল?

ছেলেকে ডেকে বল্লুম—নিয়ে আয় এখানে, আমি আর উঠতে পারচিনে। একটু পরে ছেলের পিছু পিছু চশমা চোখে ছিপছিপে ফরসা চেহারার একটি ছোকরা ঘরে ঢুকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে বলল—আপনারই নাম সীতানাথ বাবু—?

বললুম—বসুন, কোথা থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, এই আপনার কাছেই এলাম। আজ সকালে—ওই ডাক্তারখানায় বসে ছিলেন, আমি আর দাদা নাইতে যাচ্ছি, দাদা বললেন—আপনি একজন লেখক। তখন তেল মেখেছিলুম, সে অবস্থায় আপনার কাছে যেতে সাহস করিনি। শুনলুম, আপনি শনিরবিবারে এখানে আসেন, আজই আবার কলকাতা চলে যাবেন ওবেলা। তাই এখন দেখা করতে এলুম।

আসার উদ্দেশ্য শুনে মনটা প্রসন্ন হ'ল না। নিশ্চয়ই লেখা চাইতে এসেচে। এ পাড়াগাঁয়ের টাউনে কোন কাগজের উৎপাত ছিল না তো জানি—তবে কি এখানেও কাগজ বার হ'ল?

ছোকরা বিনয়ে সংকুচিত হয়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এতক্ষণ সে একবারও আমার মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটুখানি চুপ করে থেকে ছেলেটি বললে—আপনার কাছে এলাম, যদি মনে কিছু না করেন তাহলে বলি।

—বলুন না?

—আমাকে একটু করে লেখা শেখাবেন? আমি এবার বাংলা নিয়ে বি-এ পাস করেচি। এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেচি। আমার দাদা এখানকার সাবরেজিস্ট্রার। আমার বড় ইচ্ছে আমি লেখক হই। কিছু কিছু লিখেছিলামও, সেগুলো এনেচি সঙ্গে করে—আপনার সময় হবে দেখবার?

আমার সম্মতি পেয়ে ছোকরা একখানা খাতা ভয়ে ভয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—আই-এ পড়বার সময় লিখেছিলুম! চার-পাঁচটা ছোট গল্প, কতকগুলো কবিতা আর গান আছে।

ও দেখি আমার মুখের দিকে আগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমি কি মত দিই তাই শোনবার জন্যে। বললুম—মন্দ হয়নি, বেশ লাগল—তবে আপনার গানগুলো—ভালোই হয়েচে!

ছোকরা উৎসাহে ও আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেচে?...আচ্ছা, গল্পগুলো? ওগুলোর মধ্যে কিছু দেখলেন?

বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে বললুম—বেশ প্রেমিস্ আছে। আপনার বয়েস কম, লিখতে লিখতে হবে।

ছেলেটি যেন আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পেলে না। বললে, দেখুন আমার অনেক-দিন থেকে সাধ আমি একজন লেখক হবো। আমি বি-এতে বাংলা নিয়েছিলুম ব'লে বাড়ীতে সবাই বকে। আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা বড় বড় চাকরি করে—তারা ভালো ইংরেজী জানে। তারা দাদার কাছে চিঠি লিখলে—ওকে এখন বাংলা ভুলতে বলো। বাংলা শিখে জীবনে কি হবে? এখন একটু ইংরিজির দিকে মন দিতে বলো, যদি কিছু উন্নতি করতে চায়। আমি এ সব লিখি ব'লে বাড়ীর কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি আবার বাড়ীর ছোট ছেলে কিনা। আমি যা লিখি দাদারা দেখতে চায়, লিখতে দেখলে বকাবকি করে। বলে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। ও-সব লিখে মিথ্যে সময় নষ্ট করচে।

আমি মনে মনে তাদের খুব দোষী করতে পারলাম না একথা বলার জন্যে।

ছেলেটি আপনমনেই ব'লে যেতে লাগল—এখানে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম, গেজেট যেদিন বার হয়েচে, সেই দিনই চাকরি হ'ল আমার। এখানে এসে একা একা বেড়াই ; এক-জনও এমন কেউ নেই যে, দুটো ভালো কথা বলে, কি সৎচর্চা করে। সাহিত্য বিষয়ে কেউ খবরও রাখে না। বড় ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা। আপনার সন্ধান পেয়ে ভাবলুম ওঁর কাছে যাই, উনি আমায় লেখা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারবেন। তাই এলাম। কারো কাছে উৎসাহ না পেয়ে আমি এমন দমে গিয়েছি, আজ এক বছর লিখিই নি।

তারপর ছোকরা আমায় বেশ বোঝাবার চেষ্টা করলে, সে বর্তমান সাহিত্যের খবর রাখে বা সে সাধারণ মানুষের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, শ' টলস্টয়, তরুণ-সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা—ইত্যাদি হু হু করে মুখস্থ বিদ্যার মতো বলে গেল।

—আচ্ছা, তরুণ-সাহিত্যেকদের মধ্যে রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আমি বিপদে পড়ে গেলুম, তরুণ সাহিত্যিকদের বই কিছু কিছু পড়লেও রামচন্দ্র

সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ছেলেটি যেমন আগ্রহের সঙ্গে এ-সব কথা পেড়েছে, তাতে বেশ বোঝা যায়, অনেক দিন পরে একটু উচ্চ বিষয়ে চর্চা করতে পেরে ও খুব খুশি। হয়তো এমন শ্রোতা ওর অনেকদিন জোটে নি।

এ অবস্থায় তাকে নিরুৎসাহ করতে না পেরে রামচন্দ্র সরকার সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মত দেবার চেষ্টা করলুম। আমার কথা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে। বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন? ইবসেন বলেছেন—তারপর সে খানিকক্ষণ ধরে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক নাম অনর্গল আবৃত্তি ক'রে, তাদের নানা মত উদ্ধৃত ক'রে নিজের একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলে—তার ভাবে মনে হল এ ধরনের কথা বলতে সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে—কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে বোঝবার চেষ্টা করে আমি তার তর্কের ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কি ভাবচি।

আমি বললাম, এখানে কত দেয় আপনাকে?

—উনত্রিশ টাকা। এখন একরকম কুলিয়ে যায়, দাদার বাসাতে থাকি। কিন্তু দাদা বদলি হ'য়ে গেলে তখন মুশকিল হবে। আমার বাড়ীতে কিছু না দিলে তো চলবেই না—

—কেন, আপনার দাদারা রয়েছেন?

—আমার আপনার দাদা কেউ নেই। ওঁরা সব খুড়তুতো—জেঠতুতো ভাই। আমার বাবা অন্ধ, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর একটি বোন, আমার ছোট, তার এখনও বিয়ে হয়নি। দাদারা সব যে যার পৃথক। এক বাড়ীতে থাকলেও এক অন্নে নেই।

ও বললে—আমার ছেলেবেলা থেকে সাধ যে, আমার লেখা কাগজে বেরোয়। যখন বড় বড় লেখকের লেখা দেখতাম, আমার ইচ্ছে হত একদিন আমিও এই রকম লিখব। আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড ছিল কান্তি বসু—কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা এই মাঘ মাসে! আমায় দেখালে "ভারতবর্ষে" তার একটা গল্প বেরিয়েছে। মনে মনে বললুম, বা রে! আমার এমন কষ্ট হ'ল, ওরা সব লেখক হয়ে গেল, ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে, কত লোক পড়ছে, ভাবুন—কত নাম বেরুবে!

সে খানিকক্ষণ জানলার বাইরে আকাশের দিকে কেমন একটা মুগ্ধ-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললে—আর আমার কিছুই হ'ল না।

ওর আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমার বড় ভালো লাগল। একটু অন্য ধরনের ছেলে বটে—হয়তো বা একটু মাথা খারাপ আছে। ও যতক্ষণ বসেচে, আমি কেবল লক্ষ্য করচি ওর মুখের ভাবের নানা রকম পরিবর্তন। নির্ভরতা, ভয়, শ্রদ্ধা, আশা, আগ্রহ, স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, বিভিন্ন ভাব ওর মুখে কেমন চমৎকার ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ ধরনের লোকের এ রকম হয় না। পাথর-গড়া মুখের মতো তাদের মুখ হয়—দৃঢ়, অপরিবর্তনীয়—ভাব-প্রবণতার বালাই তাদের নেই। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—আপনি এর পরে নিশ্চয়ই ভালো লিখতে পারবেন। এরই মধ্যে বেশ লেখা বেরিয়েচে আপনার হাত থেকে। এখন আপনার তো বয়েস কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে আপনার সামনে—আমার তো মনে হয়, কালে আপনি একজন ভালো লেখক হবেন—আপনার লেখা পড়ে আমরা এক সময় আনন্দ পাব।

ছোকরা সলজ্জ হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—কি যে বলেন! আপনারা আনন্দ পাবেন আমার লেখা থেকে!...আচ্ছা, আপনার মনে হয় সত্যি আমার কিছু হবে?

—কেন হবে না? না হবার কিছু দেখলুম না—খুব হবে।

—কান্তি বসু আমারই ক্লাসফ্রেন্ড, আমারই মতো বয়েস—ও এরই মধ্যে নাম করে ফেলেচে। আচ্ছা, নাম করতে কতদিন যায়? নাম করবার নিয়ম কি?

আমার দুপুরের বিশ্রামটুকু একেবারেই মাটি হ'ল দেখছি। কি করব উপায় নেই—

একে দু'চার কথায় বিদায় দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এর কথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, আবার কোথা থেকে নাম করবার নিয়ম এনে ফেললে। অথচ কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল ওর ওপর, ভালো মনে কথার জবাব না দিয়েও পারলুম না। বললাম—তার কি কোন নিয়ম আছে, তা নেই। দু'চারটে ভালো লেখা বেরুতে বেরুতে ক্রমশঃ নাম বেরোয়! লোকে আপনার লেখা প'ড়ে যদি খুশি হয়, তবে নাম বেরুতে আর কি দেরি হবে?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে আনন্দসুরে বললে—অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে কোন লেখকের সঙ্গে আলাপ করি। কলকাতায় থাকতে একবার দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেবব্রত বাবুর 'অপরিণত' বইটা সবে বেরিয়েচে—সারা রাত ধরে জেগে বইখানা পড়লাম, এমন ভালো লাগল আর এমন একটা ইনস্পিরেশন্ পেলাম—তার পরদিন আমিও একখানা ওই রকম নভেল লিখব ভাবলাম। আট-দশ চ্যাপ্টার লিখেও ফেললাম। কান্তিকে দেখাতে গেলাম, সে বললে এর প্লট, ভাব, ভাষা, সব নাকি দেবব্রত বাবুর বইখানার মতো হচ্চে। আমার ঐ এক দোষ—যখন যে বই পড়ি, লিখতে বসলে সেই বইখানার মতো প্লট আর ভাষা হ'য়ে যায়। তা সেদিন দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি ওপর থেকে বলে পাঠালেন তিনি বড় ব্যস্ত।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার একটা গান আবার উল্টে পড়তে লাগলাম। সে হাসি-হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ও গানটা সম্বন্ধে আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি, অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শুনলে—জীবনে বোধ হ'ল এই সর্বপ্রথম নিজের লেখার প্রশংসা শুনচে। কথাবার্তার মধ্যেও একবার ঘরের চারিধারে আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে—আমি কোন লেখকের এত কাছে ব'সে কখনো গল্প করিনি। এত বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি।

আর মিনিট কুড়ি পরে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠল—ভাবলে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাছে বিরক্ত হই।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি ভেবে আবার বসল, ভয়ে ভয়ে বললে—একটা কথা বলব? কথাটা বলতে সাহস হয় না। অত কম টাকায় কি আপনি রাজী হবেন? আমি আপনাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিলে, আমাকে লেখা শিখিয়ে দেবেন?

ওর এই কথাটায় কেমন একটা কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। মাত্র ঊনত্রিশ টাকা মাইনে থেকে আমায় দশ টাকা দিতে রাজী—বাকি উনিশ টাকাতেই এখানকার ও বাড়ীর খরচ চালাতে রাজী—লেখক হবার এতই সাধ।

আমি তাকে বললাম—তার কোন টাকাকড়ি লাগবে না। আমি সব ছুটিতে এখানে আসিনে, যখন আসব, তখন আমার দ্বারা যতদূর উপকার হয়, খুশির সঙ্গে করব।

সে মহা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—তা হ'লে আমার হবে? না হবার কিছু দেখলেন কি?

—হবে নিশ্চয়ই, না হবার কিছুই দেখিনি। তবে সাধনা চাই।

ভগবান আমায় যেন ক্ষমা করেন—এই মিথ্যে বলবার জন্যে। আমি কেমন ক'রে ওর মুখের উপর বলবো যে, ওর লেখার মধ্যে কিছুই পাইনি—ওর গল্প, কবিতা নিতান্ত বাজে হয়েচে, বিশেষ কোনো ক্ষমতার অঙ্কুরও তার লেখার মধ্যে কোথাও নেই! মিথ্যা যেখানে মানুষকে সুখী করে, সেখানে নিষ্ঠুর সত্য ব'লে কিইবা লাভ?

পাঁচুমামার বিয়ে

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দাদার উনিশ, আমার সতেরো। অবস্থা আমাদের ছিল দিব্বি সচ্ছল, বড় বড় পাঁচ গোলা ধান তখন বাড়ীতে, এক একটা গোলায় দু পৌটি আড়াই পৌটি ধান মজুত। জমিজমার আয়ও বার্ষিক হাজার দুই টাকার কম নয়, এ বাদে ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা ও মায়ের গায়ের সোনার গহনাও বেশ ছিল। আর ছিল গ্রামের মধ্যে প্রচুর মান, খাতির রবরবা নাম-ডাক।

রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় লোয়ার প্রাইমারী পড়বার সময় ইতিহাসে পড়েছিলাম, কে একজন বাংলার সুলতানের পুত্র "পিতার মৃতুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজকোষে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তিন লক্ষ হস্তী, পাঁচ লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ পদাতিক ও বিশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য আছে"...অতএব তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে বসলেন। আমাদেরও হলো তেমনি অবস্থা।

মা ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ, ঠাকুরমা পিতৃহীন নাতিদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ, সুতরাং আমাদের মাথার ওপর কড়া শাসন করবার বা রাশ টেনে ধরবার তো কেউ ছিল না—এ অবস্থায় আমাদের মুণ্ডু ঘুরে যাবে, এ আর বিচিত্র কি?

দাদাই অগ্রজের অধিকারে পথ দেখালেন প্রথম। আগে মুণ্ডু ঘুরে গেল তাঁরই।

সে ইতিহাস রীতিমত বিচিত্র।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে বন্দিপুর গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতেন, তাঁকে পাঁচুমামা বলে আমরা ডাকতুম। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি দু-একবার আমাদের বাড়ী যাতায়াত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর যাতায়াত, বিশেষ করে দাদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল।

পাঁচুমামা দাদার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়। কাজেই আমি পাঁচুমামাকে খুব সমীহ

করে চলতুম। পাঁচুমামাও আমার চেয়ে দাদার সঙ্গে বেশী করে মিশতো। একবার পাঁচু-মামা এসে দাদাকে সঙ্গে করে বন্দিপুর নিয়ে গেল।

বন্দিপুর থেকে দিন পনেরো পরে ফিরে এসে দাদা ঠাকুরমাকে বল্লেন, ঠাক্‌মা, আমার দুশো টাকা বড় দরকার এখুনি। কলাই মুগের ব্যবসা করছি, পাঁচুমামা সস্তায় মাল বাঁধাই করছে, চাষাদের দিতে হবে—টাকাটা এখুনি চাই। মোটা লাভ হবে দু'মাস পরে। ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা কত ছিল তা মা'র জানা ছিল না, তবে নগদ টাকা যে মন্দ ছিল না—এটা দাদাও জানতেন, আমিও জানতাম। ঠাকুরমা টাকাটা দিয়ে দিলেন, দাদা টাকা নিয়ে মাল খরিদ করতে চলে গেলেন।

দিন কুড়ি পরে পাঁচুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা আবার এসে শ' দুই টাকা চাইলেন। মাল যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। পাঁচুমামার বাড়ী মাল গোলাজাত করা হচ্ছে, টাকার দরকার সেজন্যেই।

পাঁচুমামাও দাদার কথা সমর্থন করলেন। মাল সস্তার মুখে বেশী পরিমাণে খরিদ করে রাখতে পারলেই লাভ। টাকাটার দরকার বটে।

ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন—কত মাল কেনা হলো?

পাঁচুমামা বল্লে—তা দুশো মণের ওপর। এই টাকাটা পেলে আরও দুশো মণ খরিদ করা হবে। মণ পিছু আট আনা করে ধরলেও দুশো টাকা লাভ।

দিলেন টাকা ঠাকুরমা।

দাদা ও পাঁচুমামা টাকা নিয়ে চলে গেল—এরপরে মাস খানেক তাদের আর কোন পাত্তা রইল না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে একখানা চিঠিও লেখালেন—তারও উত্তর এল না।

চিঠির উত্তরের বদলে আরও দিন দশেক পরে এলেন পাঁচুমামার এক ভগ্নিপতি নারাণ-বাবু। নারাণবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি, বন্দিপুরে তাঁরও বাড়ী। আমি তাঁকে কখনও আমাদের বাড়ী আসতে দেখিনি।

নারাণবাবুকে হঠাৎ আসতে দেখে বাড়ীসুদ্ধ সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। দাদা ভালো আছেন তো? ব্যাপার কি?

নারাণবাবু হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠান্ডা হয়ে ঠাকুরমাকে বল্লেন—মা, আপনি পটলকে কত টাকা দিয়েছেন এ পর্যন্ত?

—চারশো টাকা।

নারাণবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—এত টাকা কেন দিলেন? কি বলে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে?

ঠাকুরমা বল্লেন,—কেন বলো তো বাবা এসব কথা জিগ্যেস করছো? সে তো মুগ কলাই-এর ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়েছে। কেন, পাঁচুও তো সেবার এসে ওই কথাই বলে গেল।

নারাণবাবু রাগে জ্বলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—পাজী বদমাইস্, ছুঁচো!...সেই রাস্কেলটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অত বড় বদমাইশ কি আর আছে নাকি? সেই তো পটলাকে ভালমানুষ পেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ওই জন্যেই আমার সামনে বেরোয় না। ব্যবসা না মুণ্ডু। টাকা নিয়ে দুলে-পাড়ায় রাজি দুলেনী বলে এক মাগী আছে, তারই ওখানে দুজনে যাতায়াত করে—এর মধ্যে বোধ হয় সব টাকাই তার পাদপদ্মে ঢেলেছে। ব্যবসা!

মা আর ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দাদা যে এমন ব্যাপার করতে পারে এ সবারই ধারণার অতীত।

নারাণবাবু বল্লেন—আমিই কি আগে ছাই জানতাম। জানলে এমনতরো হয়? আমার

সামনে তো দুজনের কেউ-ই বড় একটা আসে না, পরম্পরে শুনলাম এই ব্যাপার চলছে। শুনলাম খুব টাকা ওড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া শাড়ী আসছে রানাঘাটের বাজার থেকে মাগীর জন্যে। আজ খাবার, কাল খাগড়াই বাসন। বোধ হয় মদও ধরেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে একবার কথাটা জিগ্যেস করা দরকার যে, আপনি টাকা দিয়েছেন কিনা। তাই আজ এলুম।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার বহুকষ্টে উপার্জন করা পয়সা—ছেলেরা সব মূর্খ ও নাবালক—যা কিছু আছে, সংসারের অসময়ে কাজে লাগবে বলেই আছে। এখনও আমার দুই বোনের বিয়ে দিতে বাকী! এ অবস্থায় বিধবার পুঁজি সামান্য টাকার মধ্যে চারশো টাকা এক দুলে মাগীর পেছনে এভাবে ওড়ানো?

সমস্ত রাত পরামর্শ করার পরে ধার্য হলো যে, পরদিন সকালে নারাণবাবু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বন্দিপুরে এবং কালই দাদাকে আমি ঠাকুরমার অসুখ হয়েছে এই কথা বলে বাড়ী ফিরিয়ে আনব।

বন্দিপুর যেতে হয় মদনপুর স্টেশনে নেমে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রোশ দুই হেঁটে তো বিকেলে বন্দিপুর পেঁছানো গেল। বাড়ী থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলুম। পাঁচুমামা বাড়ীতে নেই, দাদাও নেই—শুনলাম তারা কানসোনার বাজারে গিয়েছে।

আমি পাঁচুমামার বাড়ীর সামনে একটা বেলগাছতলায় বসে আছি, কে একজন মোটা-সোটা কুচকুচে কালো স্ত্রীলোক সামনের ঘর দিয়ে মেটে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল—নারাণবাবু তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, ওই বেটি সেই রাজি দুলেনী—ওরই পাদপদ্মে তোমার দাদা সব টাকা ঘুচিয়েচে।

একটু পরে দাদা ও পাঁচুমামা বাড়ী ফিরল। আমাদের দেখে দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল, তারপর দাদা জিগ্যেস করলে—কিরে নগা, কি মনে করে?

নারাণবাবু বল্লেন—ও এসেছে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে। তোমার ঠাকুরমার বড় অসুখ যে!

—অসুখ? কি অসুখ?

দাদা আমার মুখের দিকে চাইলে। দাদার হঠাৎ-ভয়-পাওয়া হঠাৎ-ম্লান মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। বড় কষ্ট হলো, একবার মনে হলো, সত্য কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু তা হলে দাদা যদি বাড়ী না যায়?

সেই রাত্রেই দাদাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী এসে দাদা খুব বকুনি খেলে ঠাকুরমা ও মায়ের কাছে। তার উত্তরে সে নারাণ-বাবুকে গালমন্দ দিয়ে যা-তা বলে গেল। কে বলেছে সে সর্ষে কেনে নি? এখনও বিশ মণ সর্ষে ঘরে মজুত রয়েছে—আর সব মাল চাষাদের ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলেই,—রাজি দুলেনী কে? রাজি দুলেনীকে দাদা চেনেও না। নারাণবাবুর মত কুটিল, ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় আর নেই। তিনি টাকা চেয়েছিলেন, দাদা দেয়নি, তাই তিনি দাদার বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যে রটনা করে বেড়াচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুরমা দাদার এসব কথা কিছু বিশ্বাস করলেন না। মাস খানেক পরে পাঁচুমামা আবার একদিন এসে হাজির আমাদের বাড়ীতে। ঠাকুরমা বল্লেন—পেঁচো শোন। হতভাগা, আমার যে এক রাশ টাকা চেয়ে পাঠালি পটলাকে দিয়ে ব্যবসা করবি বলে, কই ব্যবসার হিসেব দেখা তো আমায়? দেখি কোথায় গেল এতগুলো টাকা!

পাঁচুমামার মুখে চিরদিন তুবড়ি ছোটে। হাত পা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিলে, টাকা ডোবানো তো দূরের কথা—আর মাস দুই পরে ঐ চারশো টাকার অন্ততঃ দেড়শোটি টাকা লাভ দাঁড়াবে। তখন লাভে মূলে একসঙ্গে টাকাটা এনে দেবে এখন। পাঁচুর অদৃষ্ট খারাপ, সে যার জন্য চুরি করে—সেই মাকি পাঁচুকে চোর বলে। যাক্, তার জন্যে সে

দুঃখিত নয়—আসল টাকাটা কোন রকমে ঠাকুরমায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ততদিন পর্যন্ত রাত্রে ঘুম নেই তার।

পাঁচুমামার বক্তৃতায় ঠাকুরমার বিশ্বাস ফিরে এল। ফলে পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে রয়েই গেল। দাদাকে এর আগেই সে কষ্ট করেছিল, এবার আমার পিছনে লাগল এবং অদ্ভুতভাবে সাফল্য অর্জন করল। এমন কি, কিছুদিন পরে আমারই মনে হলো, আমি দাদাকে বুঝি ছাড়িয়েই যাই।

তখন আমার বিবাহ হয়নি—দাদার সবে হয়েছে। আমি নানা ছুতোয় ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর পাঁচুমামার পরামর্শ মত খরচ করি। মহকুমা শহর ছিল নিকটেই। নানা ছুতোনাতায় মহকুমা গিয়ে আমি আর পাঁচুমামা প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফিরতুম না। ধাপে ধাপে শেষে এতদূর পর্যন্ত নেমেছিলুম।

পাঁচুমামাকে সত্যি আমি অদ্ভুতকর্মা মানুষ বলে ভাবতাম। যেমন জানে ব্যবসা, তেমনি রাখে দুনিয়ার খবর ; যেমনি বোঝে মোকদ্দমা, তেমনি পারে ফুর্তি করতে। পাঁচুমামার হাতে টাকাগুলি তুলে দিয়ে বলতাম, এর মধ্যে থেকে যা যা দরকার খরচ করো।

যত টাকাই দিই, তিন-চার দিনের মধ্যে সব খরচ করে ফেলে আবার আমার কাছে চাইতেন। বলতেননগা, বুড়ীর হাতে মোটা টাকা আছে। তা তোমার দ্বারা কিছু যে হবার নয়, আমি বুড়ীর নাতি হলে দেখতিস।

মামার কাছে কখনো টাকার হিসেব নিইনি—অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল আমার পাঁচুমামার ওপরে। কিভাবে ও কোথায় সে সব টাকা ব্যয় হতো, সে কথা আর বলব না—তবে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ শো টাকা পাখীর মত উড়ে গেল বেমালুম। ঠাকুরমা হাত গোটালেন, মায়ের গহনা বন্ধক পড়তে লাগল। এই অবস্থায় পাঁচুমামা একদিন তেওটা বন্দিপুরে বিশেষ কাজ আছে বলে চলে গেলেন, আর এলেন না।

মাস দশেক পরে একদিন শীতের রাত্রে মুড়িসুড়ি দিয়ে দালানে বসে আছি, এমন সময় পাঁচুমামা আমাদের বাড়ী এসে আবার হাজির।

আমায় বল্লেন—এই যে, ভাল আছিস নগা? পটলা কোথায়?

বল্লুম—দাদা ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ী গিয়েছে বোধ হয়। তার পরে, এতদিন কোথায় ছিলে মামা? এসো বসো—বড্ড শীত।

পাঁচুমামা দরজা ভেজিয়ে আমার কাছে এসে বসল। বলল—শোন্, একটা কথা বলতে এলুম তোদের। কাল এখানে এক ভদ্রলোক আসবে সকালের গাড়ীতে। যদি তোদের কিছু জিগ্যেস করে তবে বলবি, তোদের এখানকার বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পাঁচ আনা অংশ আছে। বলতে পারবি তো? পটলা কোথায় গেল—তাকে কথাটা শিখিয়ে রাখি।

কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লুম—কি, কি ব্যাপার মামা? কে আসবে?

ব্যাপার যা শুনলাম তা সংক্ষেপে এই। পাঁচুমামার বিবাহ, কাল তাকে দেখতে আসবেন মেয়ের বাপ নিজে। আসলে তো পাঁচুমামার কিছু নেই তেওটা-বন্দিপুরে, যা ছিল তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে অনেককাল। কিছু না দেখালে মেয়ে দেবেই বা কেন? মেয়ের বাপের নাম হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে, মদনপুরের কাছেই কি গাঁয়ে বাড়ী, গরীব অবস্থার লোক। তিনটি মেয়ে তাঁর, মেয়ে তিনটি অপরূপ সুন্দরী—এইটি বড়। পাঁচুমামা এই মেয়েটিকে দেখে নাকি পাগল হয়েছেন, বিয়ে যে কোন উপায়ে হোক হওয়াই চাই।

রাত্রে দাদা ফিরলে দাদাকে বলা হলো সব কথা। দাদা বল্লে—পাঁচ আনা অংশ কেন

আছে যদি জিগ্যেস করে?

—তবে বলবে তোমার বাপ আমার বাবার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল—সেই দেনার দায়ে সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে দায়।

আমরা রাজী। কিন্তু ভদ্রলোক যদি গাঁয়ের আর কাউকে জিগ্যেস করেন? তবেই তো মিথ্যে কথা ফাঁক হয়ে যাবে। পাঁচুমামা সেকথাও ভেবে এসেছেন। গ্রামের যে ক'জন লোক আমাদের পয়সায় ফূর্তি করেন, যেমন হারু সান্ন্যাল, ওপাড়ার আশু চক্কত্তি, এ'দের বয়েস আমাদের চেয়ে বেশী—এ'দেরও কথাটা বলে রাখতে হবে। আমরা বল্লে কেউ 'না' বলতে পারবে না। কাল মেয়ের বাপের সামনে তাঁদের হাজির করতে হবে। তাঁরাও আমাদের কথায় সায় দেবেন।

পরদিন সকালে আমাদের দলের লোক যাঁরা, তাঁদের একথা বলা হলো। তাঁরা সকলেই রাজী হলেন, না হয়ে উপায় ছিল না।

দুটোর কিছু আগে মেয়ের বাপ হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এলেন। ছেলে দেখে পছন্দ করলেন। তারপর ছেলের কি আছে না আছে সে কথা উঠল।

পাঁচুমামা বল্লে, আমাদের জমিজমার সে পাঁচ আনার মালিক। আমরা তাতে সায় দিলাম। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে নিতান্ত সরল, গ্রাম্য লোক এবং ভাবে মনে হলো নিতান্ত গরীব। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারের কিছু বোঝেন না। কেবল একবার জিগ্যেস করলেন—আপনারা তো ভাগ্নে, ভাগ্নের সম্পত্তিতে আপনাদের মামার অংশ কি করে এল?

এর উত্তরে বাক্‌পটু পাঁচুমামা একটি যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বল্লে, আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম—আমাদেরই মনে হলো, পাঁচুমামা যা বলছে তাই বুঝি সত্যি। কবে আমার বাবা পাঁচুর বাবার কাছে টাকা ধার করেছিলেন, সুদে আসলে তা কত টাকা দাঁড়ায়, তারই বদলে আমার বাবা পাঁচুর বাবাকে পাঁচ আনা সম্পত্তির উপস্বত্ব দিয়ে যান।

যে কোন বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক হলে এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতো, কিন্তু হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের মনে কোন সন্দেহ জাগল না। আমাদের এখানে আহারাদি করে বৈকালের দিকে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলে গেলেন। যাবার আগে পাত্র আশীর্বাদের দিনস্থির করেই গেলেন।

উভয় পক্ষের আশীর্বাদের পরে বিবাহের দিন স্থির হলো। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই বরযাত্রী গেলাম। বলা বাহুল্য, পাঁচুমামার চালচুলো পর্যন্ত ছিল না—জমিজমা থাকা তো দূরের কথা—সুতরাং আমাদের বাড়ী থেকেই বর বিয়ে করতে রওনা হলো এবং কথা হলো যে বউ নিয়ে আবার পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসবে।

কনের বাপের বাড়ী একখানা মাত্র খড়ের ঘর, তারই দাওয়ায় সম্প্রদানের আসর, কারণ বর্ষাকাল, বৃষ্টি যখন তখন আসতে পারে। বরযাত্রী থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল কিছু দূরে এক প্রতিবেশীর চন্ডীমন্ডপে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, সবসুদ্ধ জন পনেরো। বাড়ীর ভিতরের উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই তলায় আমরা বসে গেলাম। লগ্ন ছিল বেশী রাত্রে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া তার আগেই শেষ করে দেওয়ানো হলো।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের অবস্থা কত খারাপ তা বোঝা গেল একটু পরেই। তিনি নগদ বরপণ স্বরূপ একুশটি মাত্র টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এখন বিবাহ সভায় দেখা গেল তিনি মাত্র এগারোটি টাকা থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। বরকর্তা ছিলেন আমাদের গ্রামের দাশু চক্রবর্তী, প্রবীণ লোক বলে তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছি। কর্তা সাজিয়ে নইলে পাঁচুমামার তরফ থেকে বরকর্তা হবার কোন মানুষ নেই তো!

দাশু চক্রবর্তী আমাদের উপদেশ মত বল্লেন—একুশ টাকার কথা ছিল, এগারো টাকা

কেন? বাকী টাকা না দিলে বর সভাস্থ করবার অনুমতি দেব না।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বল্লেন—আর যোগাড় করতে পারিনি—ওই নিয়ে আমায় মাপ করতে হচ্ছে বেহাই মশায়। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলব, ঘরের চালে দেবার জন্যে খড় কিনে রেখেছিলাম—সেই খড় বেচে ফেলে দিয়ে তবে ওই এগারো টাকা যোগাড় করেছি। সামনে বর্ষা আসছে, ঘরের মধ্যে এসে দেখুন চাল ফুটো—আলো আসছে। ঘর সারাবার আর কোন সঞ্চয় নেই। আর টাকা হলেও এই জষ্টি মাসে খড় পাব কোথায়?

এর পরে আমরা তর্ক চালাতাম, ছাড়তাম না। তোমার চালে খড় নেই তা আমাদের কিরে বাপু? মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, আগে থেকে তোড়জোড় করনি কেন? রইল তোমার বিয়ে-থাওয়া—আমরা বর সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এসব কথা বলা চলতো, কিন্তু পাঁচুমামা দেখি ছট্‌ফট্‌ করছে—তার ইচ্ছে নয় টাকার জন্যে আমরা বিয়ে ভেঙে দিই বা কোন বাধা সৃষ্টি করি। সে আমায় ডেকে কানে কানে বল্লে, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! তার চোখমুখের করুণ ভাব দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। সে কেবল ভাবছে, তার বিয়েটা বুঝি আমরা পাঁচজনে মিলে ভেস্তে দিলাম। যাই হোক, পাঁচুমামার অবস্থা দেখে আমরা আর বেশীদূর ব্যাপার গড়াতে দিলাম না; বর সভাস্থ করা হলো। মেয়েকে যখন আনা হলো, মেয়ের রূপ দেখে আমরা তো অবাক। এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে পাঁচুমামার বিয়ে হচ্ছে তা তো জানতাম না! কি গায়ের রং—কি সুন্দর গড়নপিটন, আর তেমনি মুখশ্রী! অমন রূপের ডালি মেয়ে কালেভদ্রে চোখে পড়ে। তাই পাঁচুমামা ক্ষেপে উঠেছে এই বিয়ের জন্যে—তাই এত জুয়োচুরি, এত আটঘাট বাঁধা, এত দুর্ভাবনা—পাছে এমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়!

মনে মনে ভাবলাম—পাঁচুমামার অদৃষ্টটা দেখছি বেজায় ভালো। নইলে এমন মেয়ে ওর জোটে! ওর চাল নেই, চুলো নেই, তিন কুলে কেউ নেই—অজমূর্খ, গাঁজা খায়, নেশাভাঙ্গ করে, কোন্ বদ্‌মাইশিটা ওর বাকী আছে জিগ্যেস করি। আমার দাদাকে আর আমাকে তো ও-ই নষ্ট করেছে! তার ওপর পাঁচুমামা ঘোর জুয়াচোর আর ঘোর মিথ্যা-বাদী। লোককে ঠকাতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই। এই বিয়েই তো করছে জুয়োচুরি করে। আমাদের বিষয়ে ওর পাঁচ আনা অংশ আছে না ছাই আছে। সত্যি কথা জানলে বিয়ে দিত মেয়ের বাপ? বিশেষ করে যখন এমন সুন্দরী মেয়ে!

যাক্, সে সব কথায় দরকার কি আমাদের। বিয়ে-থাওয়া মিটে গেল, বরকনে আমাদের বাড়ী এসে উঠল। বৌভাত কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না একথা ছিল আগে থেকেই। কারণ আমাদের এখানে বৌভাত করতে গেলে আমাদের নামডাকের উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বৌভাত করতে হয়—নইলে আমাদের নিন্দে হবে। সে খরচ দেয় কে, কাজেই ঠাকুরমা বলেছিলেন—বৌ এখানে তুলে তারপর তুমি পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যেও। সেখানে কাজকর্ম ক'রো গিয়ে। এখানে ওসব হবে না।

পাঁচুমামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল।

আমার মা ছিলেন বড় খাঁটি লোক। তিনি জানতেন না যে পাঁচুমামা বিয়ের আগে কি জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের বিষয়ে তার পাঁচ আনা অংশ থাকা নিয়ে।

মা বল্লেন—পাঁচুর বৌটি যেন হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা,—কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্ট ভাল নয়। আমার জ্ঞাতি ভাই হলেও আমি বলছি—ওরকম পাত্রে অমন রূপের ডালি মেয়ে কি দেখে যে বুড়ো দিল, সে-ই জানে। ওই বাঁদরের গলায় ওই মুক্তোর মালা!

মা জানতেন না এর মধ্যে আসল কথাটা কি! পাত্রীর বাবার কোন দোষ ছিল না, যত সব জুয়োচোরের পাল্লায় পড়ে সরল বৃদ্ধ তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে হাত-পা বেঁধে

জলে ফেলে দিয়েছেন। সে জল যে কত গভীর জল, প্রথম থেকেই তা বুঝতে নববধূ বা তার বাপ, কারও বাকী রইল না। পাঁচুমামা বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ী বন্দিপুরে চলে গেল বটে—কিন্তু বৌভাত হলো না সেখানে। পয়সা কোথায় পাঁচুমামার যে বৌভাত হবে?

বন্দিপুর বড় কখনো যেতাম না—এখান থেকে পাঁচুমামা চলে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর অনেক দিন ওদের দেখা হল না—বিয়ে করার পরে এখানে আসাটা যেন পাঁচু-মামার কমে গেল। দাদা মাঝে মাঝে যেত বন্দিপুরে—এসে গল্প করত, পাঁচুমামার সংসার অতি কষ্টে চলছে। নতুন বৌয়ের গায়ে এক আধখানা গহনা যা তার বাবা দিয়েছিলেন, এরই মধ্যে পাঁচুমামা বেচে ফেলেছে। বৌটি কিন্তু খুব ভালো, সে ইচ্ছে করে গহনা খুলে দিয়েছে—ইত্যাদি।

বছর তিন-চার কাটল। তারপর একদিন খবর এল পাঁচুমামা মারা গিয়েছে। আগে থেকে নেশা-ভাঙ্ খায়, লিভার ছিল খারাপ, নেফ্রাইটিস্ হয়ে মারা পড়েছে, চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু হয়নি।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে আমি বাইরের উঠানে একগাছা ছিপ চাঁচতে বসেছি—দাদা বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরমা নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছেন—এমন সময় আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যে এবং তাঁর বিধবা মেয়ে।

আমি ছুটে কাছে এলুম—পাঁচুমামার বিধবা স্ত্রীকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম, বাঁড়ুয্যে মশায়কেও করলুম। রূপসী বটে এই বিধবা মেয়েটি। মেয়ে না অগ্নিশিখা! বিয়ের সময়েও তো এতটা রূপ দেখিনি মামীমার! আমি মামীমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে মার কাছে রেখে হৃষীকেশ বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বসলাম।

তিনি বল্লেন—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, তার আর চারা নেই। মেয়েটার এই সবে উনিশ বছর বয়েস—ওর মুখের দিকে তো চাইতে পারা যায় না। এখন এমন অবস্থা যে দিন চলে না, পাঁচু একটি পয়সা রেখে যায়নি যে মেয়েটা একদিন সেখানে হাঁড়ি চড়িয়ে খায়। ধার দেনা করে কোন রকমে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ সেরে শুদ্ধ করিয়েছি দাদা। ভাবলাম, আগে তো মেয়েটাকে শুদ্ধ করি, তারপর পাঁচুর বিষয়ের যে অংশ আছে এখানে, তা থেকে দেনা শোধের কথা ভাবা যাবে পরে। তাই আজ এলাম মেয়েটাকে নিয়ে। ওরও তো ঘোর দুরবস্থা। বন্দিপুরে একবেলা খায় এমন অবস্থা নেই। পরনে কাপড় ছিল না, দেনা করে একখানা সরুপাড় কাপড় কিনে দিয়েছিলাম শ্রাদ্ধের পরে, তাই পরে এসেছে। আমার তো অবস্থা সবই জানো—এখন দুই মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী, এক পাল কুপুষ্যি—তাদেরই খেতে দিতে পারিনে, তা আবার বিধবা মেয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি বা কোথায়, খেতে বা দিই কি? এখন বিষয়ের পাঁচুর যা অংশ এখানে আছে—তা থেকে মেয়েটার একটা হিল্লে তো হোক। দেনাটা শেষ করে দিয়ে না হয় তার উপস্বত্ব থেকে এখানেই একখানা খড়ের ঘর তুলে দিই ওকে। ও তো মেয়েমানুষ, কিছু বোঝে না—আমি সঙ্গে করে আনলাম। মেয়েও বল্লে—বাবা, চলো সেখানে—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমার একটা ব্যবস্থা করে রেখে এসো। আর তাঁরাও ভাল লোক—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়ের অংশের যা আয় দাঁড়ায়—তা থেকে আমার একটা বিলিব্যবস্থা—আর বন্দিপুরে থেকেই বা কি হবে, সেখানে তো এক ভাঙ্গা খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই—যখন বিষয় এখানে, সম্পত্তি এখানে, তখন এখানেই যা হয় একটা ঘরদোর বেঁধে—

আমি এই লম্বা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটু আশ্চর্য হবার সুরে বল্লুম, কিসের বিষয়? কিসের অংশের কথা বলছেন?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—ওই যে পাঁচুর যে অংশ আছে এখানকার বিষয়ে, তা তো ধরো এখন আমার মেয়েরই অর্শেছে। তোমাদের এত বড় বিষয়ের পাঁচ আনা অংশ কি কম? ওর এক বেলা একমুঠো আলোচালের ভাত আর বছরে চারখানা কাপড় তা থেকে হেসে খেলে চলে যাবে—

আমি বিনীত শান্ত হাসিমুখে ভদ্রতার সুরে বল্লাম—আপনি ভুল করেছেন বাঁড়ুয্যে মশায়, এখানকার বিষয়ে পাঁচুমামার কোন অংশ নেই।

—অ্যাঁ, সে কি কথা?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে প্রথমটা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই—কি ভেবে সামলে নিয়ে চিৎকারের সুরে বল্লেন—অংশ নেই কেমন কথা? বিয়ের আগে তো তোমরাই বলেছিলে পাঁচ আনা অংশ আছে—বলো নি? আর এখন বলছ নেই। আমার মেয়েকে ছেলেমানুষ পেয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার মতলব? বরাবর শুনে আসছি অংশ আছে, আর এখন অংশ নেই বল্লেই হলো?

আমারও রাগ চড়ে গেল মাথায়। আমি বল্লুম—আপনি মিছে চেঁচামেচি করেন কেন? আপনি বিষয় সম্পত্তির কিছুই বোঝেন না তাই ওকথা বলছেন। এ তো শোনাশুনির কথা নয়। দলিল দস্তাবেজের কথা, পড়চা কোবালার কথা। বিষয় সম্পত্তি গাছের ফল নয় যে—যে কুড়িয়ে পায় সে-ই খায়। আমার বাবা যদু চক্কত্তির নামে সাত-খানা গাঁয়ের প্রজা কাঁপত—তিনি কি দুঃখে তেওটা বন্দিপুরের পাঁচু রায়ের বাবার কাছে বিষয়ের পাঁচ আনা বেচতে যাবেন? ও সব ভুলে যান। যা শুনেছেন, ভুল শুনেছেন। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, রেজিস্ট্রি আপিসে দুটাকা ফি জমা দিয়ে খুঁজে দেখুন গিয়ে সেখানে এমন কোন দলিল আছে কিনা। আমরা দলিল গোপন করতে পারি, সেখানে তো গোপন থাকবে না?

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার দু-পাঁচজন জড় হলো। তারাও হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের সরলতা দেখে কোনক্রমে হাসি চেপে রইল। যারা সেবার সাক্ষী দিতে এসেছিল যে পাঁচুমামার বিষয়ের অংশ আছে, তারাই বলে গেল পাঁচুর এখানকার বিষয়ের অংশ আছে এমন কথা কস্মিন্‌কালে তারা শোনেও নি।

সব শুনে হৃষীকেশের বিশ্বাস হলো শেষ পর্যন্ত যে এদের কথাই সত্যি।

তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—তারপরেই হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ডুক্‌রে মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলেন—আমি মেয়েটার সর্বনাশ করেছি নিজের হাতে—তখন কি জানি এমন জুয়োচুরি আমার সঙ্গে সবাই করবে—আমার অমন সোনার প্রতিমে মেয়েটা—আমায় ভালমানুষ পেয়ে—

ভাল হাঙ্গামাতেই পড়া গেল দেখছি সকালবেলা!

বুড়োর কান্না শুনে পাড়ার লোক জড় তো হলোই, বাড়ীর মধ্যে থেকে মা, ঠাকুরমা ছুটে এলেন, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রী পর্যন্ত সেই সঙ্গে ছুটে এলেন দেখতে যে তাঁর বাবাকে বুঝি আমি মারধর করেছি।

সে এক কাণ্ড আর কি!...

ঠাকুরমা তো বুড়োকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর কান্না থামিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক কি সব বোঝালেন-সোজালেন। আমায় ডেকে খুব বকুনি দিলেন; আমি নাকি লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি নে।

আমি বল্লাম—এর-আর কথা কইতে জানাজানি কি, আমি যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তুমিই বলো না কেন, আমাদের বিষয়ে পাঁচুমামার কি পাঁচ আনা অংশ ছিল?

মা শুনে অবাক, তিনি এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। বল্লেন—সে কি কথা! পাঁচুর এদের বিষয়ে অংশ কেন থাকবে? এ কি রকম কথা, এ তো বুঝতে পারছি নে?

ক্রমে তিনি সব শুনলেন। আমার ও দাদার ওপর খুব রাগ করলেন শুনে। বল্লেন—বেশ, আমার ছেলেরা যখন এ জুয়োচুরির মধ্যে আছে, তখন আমি পাঁচুর বৌয়ের ভরণ-পোষণের ভার নিলুম। মেয়েকে এ বাড়ীতে রেখে চলে যান। আজ থেকে ও আমাদের ঘরের লোক।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—জিগ্যেস করে দেখুন আপনার ছেলেকে? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। বিয়ের আগে পাত্র আশীর্বাদের দিন একথা বলেছিল কিনা! আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের দেখে। আমি তো পাঁচুকে দেখে দিই নি। ভাবলাম আপনাদের আত্মীয়, আপনাদের বিষয়ের অংশীদার—তাই আমি সম্বন্ধ করি। তখন কি করে জানব এর মধ্যে এত জুয়োচুরি!

আমি বল্লাম—এ কথা আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলছেন। যদি কেউ বলে মণীন্দ্র নন্দীর জমিদারীতে আমার অংশ আছে—অমনি তার অংশ হয়ে যাবে?

ঠাকুরমা আমায় আবার ধমক দিয়ে চুপ করালেন। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেকে স্নান করতে পাঠালেন, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। যাবার সময়ে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ঠাকরমায়ের হাতে ধরে বল্লেন—আমার মেয়েকে আপনি রেখে দিন। আমার সংসারে একপাল পুষ্যি, খেতে দিতে পারি নে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্বত, আমার মেয়েকে একবেলা একমুঠো আলোচালের ভাত—

মা ও ঠাকুরমা বল্লেন—তার আর কি, বৌমা থাকুন এইখানেই। পাঁচুর বৌ আমাদের তো আর পর নয়, কপালই না হয় পুড়েছে সকাল সকাল।

সেই থেকে পাঁচুমামার স্ত্রী আমাদের সংসারে রয়ে গেলেন। প্রথমে ছিলেন বেশ সুখেই, যতদিন মা ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁরা একে একে গেলেন স্বর্গে। দাদার বিয়ে আগেই হয়েছিল, আমারও বিয়ে হলো। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ওদিকে মারা গেলেন। পাঁচু-মামার স্ত্রীরও আর বাপের বাড়ী যাবার জায়গা রইল না।

নতুন বৌয়ের দল নিজের সুবিধামত সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল। পাঁচুমামার স্ত্রীর এ-সংসারে থাকাটা তারা গোড়া থেকেই অনধিকার-প্রবেশ বলে ধরেছিল, এইবার সামান্য পান থেকে চুন খসলেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে অপমান করা শুরু করলে। এর আর একটা কারণ ছিল। পাঁচুমামার স্ত্রী ছিলেন অসামান্য রূপবতী বিধবা মানুষ, একবেলা খেতেন, একখানা নরুন পাড় কাপড় পরতেন—তাতেই তাঁর রূপ ধরতো না। বয়সের সঙ্গে সে রূপ ম্লান হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বাড়তেই লাগল।

নতুন বৌয়েরা দেখতে অমন সুন্দরী নয় কেউ-ই। তাদের মনে পাঁচুমামার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নানা হিংসে, ঘোর সন্দেহ এসে জুটতে লাগল।

পাঁচুমামার স্ত্রী তো এ বাড়ীতে থাকতেন বিনি মাইনের রাঁধুনী ঝি চাকরাণীর মত। কিন্তু তাঁর ওপর অত্যাচার অবিচার তাতেও কম ছিল না।

আমার সত্যিই কষ্ট হতো পাঁচুমামার স্ত্রীর জন্যে। যে সহানুভূতি পাঁচুমামার ওপর কখনও হয় নি, পাঁচুমামার শ্বশুরের ওপর হয় নি—তা হয়েছিল এই অসহায় বিধবা নারীর ওপর।

কিন্তু আমার কথা কওয়ার কোন উপায় ছিল না। তা হলেই আমার স্ত্রী সন্দেহ করবেন, কেন আমি পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষে এত কথা বলছি। আমার পূর্বেকার রেকর্ড খুব ভাল ছিল না, সুতরাং স্ত্রী পদে পদে আমায় সন্দেহ করতেন, আমিও যে না বুঝতাম এমন নয়। সুতরাং পারিবারিক শান্তিভঙ্গের ভয়ে মুখ বুজেই থাকতাম।

এত সাবধান থেকেও একবার বড় বিপদে পড়ে গেলাম। সে দিনটা একাদশী। দেখি বেলা এগারটায় সময়ে পাঁচুমামার স্ত্রী এক রাশ বাসন মেজে ডোবা থেকে উঠে আসছেন।

আমি বড় বৌ অর্থাৎ আমার বৌদিদিকে বল্লাম,—বৌদিদি, মামীমাকে আজ বাসন মাজতে দিয়েছে কে? আজ একাদশীর দিনটা, তোমরা একটু দেখো শোন না সংসারের কাজের কি হয় না হয়?

বৌদিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লেন—ও সব লোক দেখানো ঢং! কে বললে বাসন মাজতে? অন্যদিন বল্লেও তো কাজ করতে দেখিনে—আর আজ বাসন না মেজে আনলে দরদ কুড়ানো যাবে কি করে? ওসব কি আর বুঝি নে? তা বুঝি।

বৌদিদি কি বোঝেন জানি নে, কিন্তু সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী আমায় বল্লে—ওগো, শোন একটা কথা বলি! কথা রাখবে বলো?

—কি কথা বলো?

—তুমি ওকে বাড়ীতে রাখতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লেম—কাকে গো? ভেঙ্গেই বলো না?

—ওই যে তোমাদের মামীমাকে। ওকে এখুনি তাড়াও।

—কেন, মামীমা কি করেছেন?

—সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে। সে তো তোমাদের আপন মামীমা নয়—বিশেষ কোন সম্পর্কও কিছু না। সামান্য পাতানো সম্পর্ক। আর ওই রূপ, আর ওই বয়েস। তোমাকে আমি চিনি—মিছে অশান্তি কেন সৃষ্টি করবে? সরাও ওকে এখান থেকে। আমি গতিক ভাল দেখছি নে।

বুঝলাম, সেই যে দুপুরবেলা পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে একটা কথা বলেছিলাম বড় বৌয়ের কাছে, তিনিই লাগিয়েছেন সমস্ত কথা ছোট বৌকে। কি বিশ্রী মন এই সব পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষদের! অস্বীকার করি নে যে আমার রেকর্ড ভাল না, আমিই জানি আমি কি বা আমি কি নই। কিন্তু একজন আশ্রিতা অসহায়া তরুণী বিধবা, যার প্রতি সত্যিই আমার সহানুভূতি ও অনুকম্পা, যাঁকে মামীমা বলে ডাকি—তাঁর সম্বন্ধে এই সব—

আমার মন একমুহূর্তে বিরূপ হয়ে উঠলো সংসারের ওপর, স্ত্রীর ওপর, বৌদিদির ওপর, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রীর ওপর।

বল্লাম—বেশ ভালো, আজই যেতে বলছি।

মনে ভাবলাম, এমন করে বলবো যে স্ত্রী পর্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে উঠবে।

পরদিন সকালেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে ডেকে বললাম—আপনার আর এখানে থাকা হবে না। আপনাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বাধছে, আপনি এখুনি আমাদের বাড়ী থেকে অন্যত্র যান।

বড় বৌ বল্লেন—সে কি কথা! কাল গিয়েছে একাদশী, আজ দ্বাদশীর দিন। না খেয়ে কোথায় যাবেন উনি! কাল সারা দিনরাত নিরম্বু উপোস গিয়েছে। সংসারের অকল্যেণ হবে যে!

মনে মনে ভাবলাম—সেইটেই বোঝ। আর একটা গরীব অসহায় মেয়ের যে কি হবে তা মনেও উঠে না। তোমাদের ভালো করেই কল্যাণ করাচ্ছি।

পাঁচুমামার বৌ কথাটি বল্লেন না। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি জানি তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই—বাপের বাড়ী এক গাঁজাখোর বেকার ছোটভাই আছে, সেখানে একমুঠো খাওয়াও জুটবে না এক বেলা। কিন্তু সব জেনেও বড় রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠলাম আজ। একাদশীর পরদিন না খেতে দিয়েই তাড়াবো! করাচ্ছি সংসারের কল্যাণ তোমাদের!

সেই সকালেই চা খেয়ে বসে আছি, পাঁচুমামার বৌ দুটি পান সেজে কাঁসার বাটিতে

আমার সামনে রেখে দিয়ে পুঁটলি বগলে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মুখে কিছু বলিনি, কেবল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্যে আমাদের মুহুরী বৃদ্ধ গোপাল মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম এবং আপদ চুকে গেল ভেবে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পাঁচুমামার বৌয়ের তারপর থেকে আর কোন খবর রাখি নি।

ঠাকুরদা'র গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্পকথা বুঝি, কিন্তু সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক আসল গল্পটা বলিঃ

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ—একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভায় নাম-করা খাইয়ে ছিলেন সেকালের আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বিষ্ণুরাম রায়, সারসার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সেবার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্পবয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে, গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক, তারা কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের পৈতৃক জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

একদিন দাদা এসে বল্লেন—খালপারের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী! দিবি? আমি দাদার নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়—অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম। কে এমন সুপরামর্শ দিয়েচে কি জানি। বল্লাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

—পনেরো টাকা বিঘে।

—জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!

—তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

—আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন, নিজের জমি যা খুশী করবেন, এতে কার কি বলবার আছে—ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য আয় নেই, জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না, এক পয়সা সাহায্যও করলেন না। আমি ভেবে চিন্তে মুস্তফাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে হাজির হোলাম। মুস্তফাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন, তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলাম খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ—কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ী বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে? তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়ের নাতি। তা কি মনে

করে?

—আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে, বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

—টাকা হবে না।

—কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোনো উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার! ধান রোয়া না হ'লে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন।

কাজী সাহেব বল্লেন—আপনাকে এখানে আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন—এমন সময়, বাড়ী ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত, এই পাশেই বাড়ী তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোর বাড়ী থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ওবেলা কথাবার্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

দিব্যি সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্বক ভোজনপর্ব সমাধা হ'ল। কাজী সাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে বল্লেন, কত টাকা হ'লে জমি রোয়া হয়? কত বিঘে জমি? বল্লাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—না। যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙল গোরু কিনুন, পরের লাঙলের ভরসায় চাষ চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয়?

আমি বল্লাম—টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙল গোরু করতে এখন অন্তত শ'খানেক টাকা দরকার।

—আচ্ছা যেদিন আপনি আজকের টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ী ফিরে আসতেই মা সব শুনে বল্লে—খুব ভদ্দর লোক ত্যে ওরা। আমার দুগাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বল্লাম—বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আবার। আমায় বল্লেন—আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা আর ধান কর্জ দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা! যে মহাজন খাতক চেনে না, সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান, দলিল দিতে হবে না।

এই ভাবে সে আষাঢ় মাসে ধান রোয়া আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিনটাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল একমণ পাওয়া যায়, পাকি ওজনের গাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোল সের টাকায়। সে সব এখন বল্লে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বল্লে—বাবা ঠাকুর, গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের

দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোর-ডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল, মা পীতাম্বরকে তুলসী গাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারেও কোথাও না যায়।

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গা পার হলাম। পীতাম্বর বল্লে, বাবাঠাকুর, এখান থেকে কোশ-চারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধ্যে পর্যন্ত হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস। বল্লাম, খুব।

পীতাম্বর বল্লে—তবে চলুন বাবা ঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে। পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘণ্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবাঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুল্লে। মনে হলো সেটা কোনো গৃহস্থের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ীর লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বল্লাম—দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কিনা। এমন বাড়ীতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

—বাবু এ রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না। এরা বোধহয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দুজনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা ছোট বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম—আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়সের খিদে! আধসের চিঁড়ে আর আধসের দই, পোয়াটাক গুড় ও এক ছড়া কলা এক একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরের মহৎ দোষ ছিল তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না। মুদীর দোকানে আহারান্তে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদীর দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উপর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বল্লে—বাবাঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কিনা তাই ভাবচি—

—কেন?

—বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে একসময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবাঠাকুর বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা।

--গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নিই।

--কিন্তু বাবাঠাকুর, কোন রকমে যেন জানতে দেবেন না যে আমাদের কাছে টাকা আছে। সিজে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দু'তিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ী গেলাম--কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম--রাত্রে কিছু খাবো না বল্লাম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়--একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বল্লেন, কে?

--আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী এখানে নয়।

--এখানে কি মনে করে?

--বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

--তোমরা?

--আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

--কি ব্রাহ্মণ। উপাধি কি?

--রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে--এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো!

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেই পুরানো আমলের বাড়ীর চেহারা দেখে কেমন ভয় ভয় হ'ল। নির্জন বাড়ীটায় কেউ যেন কোথাও নেই--এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন ক'রে পুঁতে রাখে, তবে লাস সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দুমহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারীকণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হ'ল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে না। চটাওঠা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা গজিয়ে রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হ'ল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

পীতাম্বর চাপা গলায় বল্লে--বাবাঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বল্লাম--বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বল্লে--তোমার সঙ্গের লোকটি কি জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব।

আমি বল্লাম--যাও পীতাম্বর--

পীতাম্বর দেখি আমায় চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম--যাও না--বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অতবড় বাড়ীর মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্বোধ নই আমি। খুব সতর্ক হয়ে রইলাম--নিজের দশ হাতের মধ্যে কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্চিনে--কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমুর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসচে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই

তো? উঠে দাঁড়ালে তবুও ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বল্লে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল্লে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে' জেলা।

—বাপের নাম কি?

—ভূষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বল্লে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল-টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটলে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হ'ল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপাশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

বিছানায় সবে শুয়েচি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ী। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সংকুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বল্লেন—না না থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হ'ল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বল্লেন, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—কেমন, পছন্দ হয়?

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—সে কথা এখন কেন! বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি। কি ব্যাপার এদের? নরবলি-টলি দেবে না তো আমায়? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বল্লাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবা ঠাকুর। একটা কথা বলবো?

—কি?

—কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজ খবর নিলেন। আপনার বাড়ী কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে—সে অনেক কথা। এ জায়গা ভাল নয়, এখুনি এখান থেকে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আহারাদি ক'রে নাও, ওবেলা হবে এখন সে সব—

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হ'ল। বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বল্লে—বাবা ঠাকুর, বড় বিপদ।

—কি রে?

—এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

—সত্যি?

—দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো।

কথাটি কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রির অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বল্লেন—বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন!

আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—খাবো না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না!

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—মা বলে ডেকেচ তো? তা হ'লেই হয়ে গেল। কর্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বল্লে—সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে—তোমাকে এক্ষুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধহয় তত আশ্চর্য হ'তাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা।

বল্লাম—সে কি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদেরই পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো, —তা হয় না? তা হ'তে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিজে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্যন্ত লোকে থরহরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে। গোঁফদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই?

আমি কাঠের পুতুলের মত বসে রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী ব্যবহারেও তাই।

এর পরে গল্প খুব সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা জগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ' বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেচে।

তখন তামাকের নলটায় একটি জোরে টান দিয়ে বল্লেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়সে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে আমার লাভ কি বলো!

আপিসে পানের আর জর্দার কৌটো দুই-ই ফেলে এসেছেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে পড়লো। ছাতিটা আজ আবার আনেননি, বৃষ্টি হবে না ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছাতি না এনে ভুল করেছেন, মেঘ জমে আছে সেন্ট্রাল এভিনিউর বড় বড় বাড়ীগুলোর মাথায়। পানের কৌটো ফেলা চলে না, টেবিল থেকে কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আবার আপিসে ফিরলেন, ইনচার্জ বাবু তখনও কাজ করছেন একমনে, অথচ কেউ নেই ডিপার্টমেণ্টে, খোশামুদে কোথাকার, মরুক খেটে! দেড়শো টাকা মাইনের মত কাজ দেখানো চাই তো সাহেবদের, নইলে যদি তাড়িয়ে দেয়? দিনকাল ভাল না। তাঁদের যে পঞ্চাশটি টাকা সেই পঞ্চাশটি টাকা। কেউ নেবে না, কেউ বাড়তি দেবেও না! এই যুদ্ধের বাজার। চালানো যে কত দায় হয়ে উঠেছে, সে বোঝে যে চালায়। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে, এক পয়সা উপরি নেই। ওভারটাইম খাটলে একটাকা দৈনিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওভারটাইম ক'দিন হয় মাসে? আপিস থেকে রেশন দেয় তাই রক্ষে নইলে না খেয়ে মরতে হতো সপরিবারে। খিদে পেয়েছে বড়। মোড়ের ওই দোকানখানায় এবার পানের কৌটো নিতে আসবার সময় দেখে এসেছেন বেশ বড় বড় কচুরী ভাজছে। নিশ্চয় চার পয়সায় একখানা। খেতে ইচ্ছে তো হয়, পয়সায় কুলোয় কই? একটা দোকানে বসে আধ পেয়ালা চা দু পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েই আপাতত খিদের শান্তি করলেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

পাশের ওই লাল বাড়ীটা তখন মেস ছিল, পঞ্চাশের দুই ধন্বন্তরি বোসের লেন। গোপীকৃষ্ণবাবু মনে মনে হিসেব করলেন। তেত্রিশ বছর আগের কথা। বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন উনি তখন। সে-সব দিনের কথা—হায়রে হায়, সেই বিপিন, কানু, বিনোদবাবু, শীল, মতি, ক্যাঙলা, ট্যারা শম্ভু, সুশোভন মিত্তির, কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি, কত ভাবের আদান-প্রদান! কত বড় বড় আশা ছিল মনে, বোম্বেতে গিয়ে চাকরি করবো, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, সাহেব হয়ে যাবো, এমন কি পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবো। পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবার বড় শখ ছিল তখন, কে জানে কেন। প্রথম যৌবনের নেশায় ইডেন গার্ডেনে দু-চারটি পার্শী তরুণীকে বেড়াতে দেখবার ফলেই বোধ হয়। আর একটা বড় শখ ছিল, বিলেত যাবার। সেটা অবিশ্যি তখনই একটু দুরাশার মতই ছিল, তবুও নিতান্ত দুরাশা ছিল না। সম্মুখে বিস্তৃত জীবন পড়ে আছে। কেন হবে না, হলেও তো হতে পারে। এখন কিন্তু তার আকাশ-কুসুমত্ব যতটা ফুটে বেরিয়েছে তখন ততটা হয়নি।

ট্যারা শম্ভু (শম্ভুনাথ চক্রবর্তী এম. বি.—হোমিও, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বিনামূল্যে সমাগত দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসা করেন) বৌবাজারের মোড়ে একটা ছোট্ট ঘরে ডিসপেন্সারী ফেঁদে বসে আছেন আজ বহু বৎসর—বিশেষ কিছু হয় বলে মনে হয় না।

গোপীকৃষ্ণবাবু মাঝে মাঝে আপিস ফেরত সেখানে বসে চা খান, চায়ের পয়সা বাঁচে। আজও গেলেন। শম্ভু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় নেই এই একটা সুবিধে। শম্ভু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, গোপীবাবুকে দেখে কাগজ রেখে বললে—এসো, এসো, একটা খবর দেখেছ—জাপানীরা আবার ছ' মাইল—

—আরে ভাই, ওসব রেখে দাও। নিজেরা মরছি নানান তালে, আবার পরের খবর রাখতে গেলে বাঁচি কেমন করে? চা খাওয়া ফিনিশ?

—না, বোসো, চা আনাই।

—কেন, স্টোভ কি হলো?

—পিন পাচ্ছি নে, স্টোভটার কি যে হয়েছে কাল থেকে—চা আনাই। ও মধু—। ডিস্‌পেনসারীর চাকর মধু পাশের দোকান থেকে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল ঘরের কেট্‌লি নিয়ে। দু-পেয়ালা ভর্তি করে কেট্‌লিতে একটু বাড়তি চা রইল, সেটুকু আবার পরে ঢেলে দিলে। চা খেতে খেতে শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু বিদেশ-ভ্রমণের গল্প করেন—অর্থাৎ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, করা উচিত বা করলে ভাল হয় সেকথা বলেন। এটা এঁরা দুজনে প্রায়ই করে থাকেন, দুই বন্ধুরই খুব বেড়ানোর শখ কিন্তু সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন, টাকাপয়সায় কুলোয় না, কোথাও কখনও যাওয়া ঘটে না, বলেই সুখ। শম্ভু ডাক্তার পশ্চিমে গিয়েছে মগরা পর্যন্ত, তাও অনেক কাল আগে, সেখানে ছিল মাসীর বাড়ী। গোপীকৃষ্ণ তার চেয়ে একটু বেশি, বর্ধমান পর্যন্ত। দুই বন্ধুর পশ্চিম-ভ্রমণের এই পর্যন্ত ইতি।

তবে প্রতি বৎসর পুজোর আগে দুজনে বসে বিদেশ-ভ্রমণের প্ল্যান আঁটেন নানারকম—এবার কোথাও যাওয়া যাক—বুঝলে? কত পয়সা তো কতদিকে খরচ হচ্ছে। টাকা চল্লিশ হলে একবার কাশীটা ঘুরে আসা হয়। তখন তর্ক বাধে দুজনে। কাশী না গয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণা। অবশেষে সেদিন ব্যাপার মুলতুবী থাকে। পরদিন আবার শুরু হয় আলোচনা—কি বল, তা হলে ভাগলপুরই ঠিক করা যাক্। পাহাড় কখনও দেখা হয়নি। ভাগলপুরে কি পাহাড় আছে? ঠিক সংবাদ দুজনের কেউ জানেন না। এমনিভাবে পুজো এসে পড়ে, এই একমাসে বহু নাম উচ্চারিত হয় ভ্রমণ সম্পর্কে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে দিল্লী, জয়পুর, বৃন্দাবন, শিলং, এমন কি বীরভূম জেলার নলহাটি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত কোনও বার কোথাও যাওয়া ঘটে না, শম্ভু ডাক্তারের তিন মাসের দোকানভাড়া বাকি পড়তে বাড়ীওয়ালা নালিশের ভয় দেখায়. গোপীকৃষ্ণবাবুর ছোট ছেলে টাইফয়েডে পড়ে—যায় সব ভেস্তে।

বহু বৎসর ধরেই এমন চলেছে। তবুও এঁরা ছাড়বার বা দমবার পাত্র নন। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে পুজোর সময় পর্যন্ত ভ্রমণের সম্বন্ধে আলোচনা এঁদের কামাই নেই। এতে তো পয়সা খরচ হয় না, অথচ টাইমটেবিল ঘেঁটে পাঁচটা দূরের নাম পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আজও গোপীকৃষ্ণবাবু চা খেতে খেতে বললেন—আর মাসখানেক বাকি পুজোর। এবার কিন্তু কোথাও যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঠিক করে ফেলা যাক্ আজই, বুঝলে? টাইমটেবিল আছে তো? টাইমটেবিল তৈরী। যারা কখনও কোথাও বেড়ায় না, তাদের টেবিলে সর্বদা টাইমটেবিল মজুত থাকে। শম্ভু ডাক্তার খাপ থেকে চশমা খুলে টাইম-টেবিলের পাতা ওলটান।

—আচ্ছা, চিত্রকূট জায়গাটা নাকি খুব ভাল! তুমি জানো কিছু?

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়। গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন—হ্যাঁ—তা বেশ ভাল জায়গা।

—ভাড়াটা দেখ হে—এবার ভাই আর অমত করো না। চলো চিত্রকূটই যাওয়া যাক।

গোপীকৃষ্ণবাবু ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, তাঁর মতামতের অভাবেই যে এতকাল ভ্রমণ বন্ধ আছে একথা সত্যি নয়। কিন্তু তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকূটের ভাড়া বেরুলো টাইমটেবিল খুঁজে। শম্ভু ডাক্তার বললেন—ওর ওপর ধরো আরও কুড়িটে টাকা—খাওয়া-দাওয়া—পান-সিগারেট—যুদ্ধের বাজার, বুঝলে না?

—সে তো বটেই।

—তা হলে এবার আর অমত কোরো না। এখন রেডি হওয়া যাক্, কি বলো? পুজো

তো এলো।

দুই বন্ধুতে আরও ঘণ্টা দুই বসে ভ্রমণের নানা পরামর্শ করেন। বাড়ী থেকে খাবার তৈরি করে নেওয়া উচিত। সব জিনিস আক্কা। বেডিং কি কি সঙ্গে নেওয়া যায়? শম্ভু ডাক্তার মুখে মুখে বলতে লেগে গেলেন—ধরো একটা মশারি, বালিশ—

গোপীকৃষ্ণবাবু অধীর ভাবে বললেন—আহা—আহা—মুখে কেন, কাগজে লিখে ফেলো না? কাজ পাকা করা দরকার। মশারি, বালিশ—তারপর? গায়ে দেবার কম্বল—

—কম্বল!

—সুজনি।

একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি ডাক্তারখানা?

শম্ভু ডাক্তার হাতের কলম ফেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা—কি দরকার?

লোকটা বললে—হোমিওপ্যাথিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—হোমিওপ্যাথিক—ভাল হোমিওপ্যাথিক—কার অসুখ?

—অসুখ কারো না। এমনি জিজ্ঞেস করছি—

সে চলে গেল। শম্ভুবাবু আবার এসে টেবিলে বসে কলম ধরলেন, বিরক্তির সুরে বললেন—মিছিমিছি জ্বালায়! যেমন সব কাণ্ড—হ্যাঁ—তারপর বলো, সুজনি—

রাত দশটার সময় ব্যাপারটি অমীমাংসিত ও মুলতুবী রেখে দুই বন্ধু বাড়ী রওনা হন। কথা হয় আগামীকাল আবার বিকেলে একত্র হয়ে পুনরায় আজকার খেই ধরা হবে। চলবে পরামর্শ। বাড়ী ফিরে গোপীকৃষ্ণবাবু আহারাদি করে শয়ন করেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসে না। চিত্রকূট কতদূর না জানি! কত পাহাড় জঙ্গল দিয়ে যাওয়া! অনেক দূরের ট্রেন-জার্নি! কত মজা হবে রাস্তায়! ভাল কথা, এক টিন ভাল সিগারেট নিতে হবে সঙ্গে। কত পয়সা তো কত দিকে যাচ্ছে! জীবনের একটা সুখ। বড় বড় পাহাড় দেখা যাবে পথে। পাহাড়ই কখনও দেখা হয়নি। ছুটির আর কতদিন দেরি? গোপীকৃষ্ণবাবু ক্যালেণ্ডার দেখলেন উঠে। ছাব্বিশ দিন বাকি মোটে। টাকার যোগাড় দেখতে হয় এখন থেকেই।

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর পিত্রালয় কোলাঘাটের কাছে। তাঁর এক শ্যালক মিলিটারিতে কি চাকরি পেয়ে কানপুরে চলে গিয়েছিল, আজ দুদিন যাবৎ চিঠি এসেছে যে সে শ্যালকটি বাড়ী এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া দরকার। গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন। কবে সেখানে যাওয়া হচ্ছে? এবার পুজোর সময়ে কোলাঘাট নিয়ে চল। কতদিন তো যাওয়া হয়নি। ভাইটার সঙ্গে দেখা হবে। গোপীকৃষ্ণবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি এখন তোমার সেই অজ গণ্ডমূর্খ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে সেই ধপ্‌ধপি জায়গায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলেন—হোক গণ্ডমূর্খ, তোমার চেয়ে আর তোমার সেই হোমাপ্যাথি জল-বেচা ডাক্তার বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। সে তবুও আছে কানপুরে—দেড়শো টাকা রোজগার করছে। তুমি বি-এ পাশ করে ষাট টাকায় ঘষছো, আজ সেই আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত। বেলুড়ের ওদিক কখনও মাড়ালে না দুজনে। তোমাদের চেয়ে সে অনেক ভাল।

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। গোপীকৃষ্ণবাবু চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার আপিস থেকে ফেরবার পথে গেলেন শম্ভু ডাক্তারের ওখানে। চা পানের পর আবার দুজনের নিবিড় পরামর্শ শুরু। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তার

একটা নিট হিসেব করে ফেলতে হবে। শম্ভু ডাক্তার বলেন—আশু সান্ডেল কাল এসে-ছিল তুমি যাওয়ার পরে। তার মুখে শুনলাম পথে নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশনে নেমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। চলো না কেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক্।

—পরেশনাথ পাহাড়?

—হ্যাঁ। হাইয়েস্ট হিল অন দি বেঙ্গল প্লেন। সেটা দেখা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভাল। তাই যাওয়া যাবে।

—টাকাটার হিসেব ধরো এবার। যাতায়াতে ধরো—রেলভাড়া, খোরাকী—

—টুকিটাকি জিনিসপত্তর কেনা—

—কিনতে গেলে হাতী কেনা যায়—জিনিস কেনা বাদ দ্যাও। শুধু নিট খরচ যেটা—

এইভাবে সেদিনও কেটে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ-সভা বসে। এদিন কথা ওঠে কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে। মশারি নেওয়া যাবে কি না এ তর্কের সেদিন কোনও মীমাংসা হলো না। শম্ভু ডাক্তার বলেন—যেখানেই যাও, মশা থাক না থাক মশারি সঙ্গে থাকাই ভাল। মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়, ফাইলেরিয়া হয়, আরও কত কি। মশারি নেওয়াটা এসেনশিয়াল। গোপীবাবুর মতে অতদূর পশ্চিমে পাহাড়ের দেশে মশা-ফশা নেই—এ কি আর বাংলাদেশের খানাডোবাভরা পাড়াগাঁ? মিছিমিছি ভারবোঝা বাড়ানো। ট্রাভেল লাইট। একগাদা বোঁচকা-বুঁচকি ঘাড়ে করে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

রাত দশটা। দুই বন্ধু সভা ভঙ্গ করে সেদিনের মত যে যার বাড়ী চলে গেলেন।

আবার পরদিন দুজনে মিললেন। আজকার তর্কের বিষয় খাবার জিনিস কি কি সঙ্গে নেওয়া যাবে। বাড়ীতে লুচি-পরোটা করে নেওয়াই ভাল। খাওয়ার জিনিসের আগুন দর। এক টাকার খাবার খেলে পেট ভরে না। কি কি খাবার নেওয়া যায়? লুচি না পরোটা? আলুর তরকারি নেওয়ার দরকার নেই, বড্ড দাম আলুর। কুমড়োর ছোঁকা আর কচুর ঘণ্ট দিব্যি তরকারি।

আরও কয়েক দিন এই ভাবে কাটাবার পরে পুজো নিকটে এসে পড়লো। গোপী-কৃষ্ণবাবুর মনে আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক যেন থাকে। ছোট মশারিটা সেলাই করে দাও। আর একটা ছোট ঘটী—

দিন সাতেক পরে পুজোর ছুটি হবে। গোপীকৃষ্ণবাবুর ডাক পড়লো একদিন বড়-বাবুর ঘরে। বড়বাবু বললেন—একটা কথা বলি। পুজোর বোনাসের লিস্ট হয়েছে, তাতে কিন্তু আপনার নাম নেই।

—আজ্ঞে, কেন?

—আর-বছর আপনারা ক'জন লিফট্ পেয়েছিলেন। এ বছর আবার তাদের বোনাস দিলে অন্য সবার ওপর অবিচার করা হয়। তাই ঠিক হয়েছে—

—স্যার, এ কেমন যুক্তি হলো? সন্তুষ্ট হয়েই তো আপনারা লিফট্ দিয়েছিলেন, এ বছর তবে এমন কি অপরাধ হলো আমাদের—

বাঙালীর আপিস। যা মনিবের রায়, সেই অনুসারে কাজ হবে। মনিব যা ভাল বোঝেন। যুক্তি-টুক্তি এখানে খাটবে না। হলোও তাই। অন্য সকলে দেড় মাসের মাইনে বোনাস পেয়ে গেল, গোপীকৃষ্ণবাবুর অদৃষ্টে জুটলো শুধু মাইনেটি। সেইদিনই গোপী-বাবু অগ্রিম কিছু টাকার দরখাস্ত করলেন, মঞ্জুর হোল মাত্র পনেরোটি টাকা। তাও বজায় রাখা গেল না, দেশের বাড়ী থেকে চিঠি এসে হাজির, বন্ধ্যা পিসিমা লিখেছেন—চৌকিদারি ট্যাক্স বাকি পড়েছে অনেক দিনের, এবার না দিলে ঘরবাড়ী ক্রোক হবে। পত্রপাঠ আট টাকা তের আনা ছ' কোয়ার্টারের ট্যাক্স বাবদ যেন পাঠানো হয়। গোপী-

কৃষ্ণবাবু প্রথমে রাগ করেছিলেন, যায় যাকগে ক্লোক হয়ে। ভারি তো ভাঙা পৈতৃক বাড়ী, মশা আর জঙ্গলে ভর্তি। কেন, পিসিমা বাঁশ, আম, কাঁঠালের উপস্বত্ব ভোগ করেছেন, চৌকিদারি ট্যাক্সটা তিনি দিতে পারেন না? আমার ঘাড়ে কেন চাপিয়েছেন? আমি কি সেখানে বাস করি? পাঠাবো না টাকা।

পরে তাঁর স্ত্রী বোঝালেন চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি লাভ? তাঁরই দুটি ছেলে, বেঁচে থাকলে ও-সম্পত্তি তাদেরই থাকবে। বুড়ী পিসিমা চোখ বুজবেন আজ বাদে কাল, বাড়ীঘর বজায় রাখবার গরজ তাঁর তত থাকবার কথাও নয়।

শম্ভু ডাক্তারের বৈঠকখানায় গোপীকৃষ্ণবাবু ঢুকলেন একটু মন-মরা ভাবে। দেখলেন শম্ভু ডাক্তারের মনের অবস্থাও তেমন সুবিধে নয়। চা এল, ভ্রমণ বিষয়ে কোনোও কথাই ওঠে না, অন্যান্য কথাই চলে। গোপীবাবু সাহসে ভর করে বল্লেন—তারপর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলে? শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—ভাই, এ মাসে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব গেল ছেলেমেয়ের কাপড়-চোপড় কিনতে। আগে তো ভাবিনি অত টাকা কাপড়ে খরচ হবে, একখানা করে কাপড় কিনতে তেতাল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। আর হাতে টাকা নেই। তবে পাঁচদিন এখনও বাকি, দেখি যদি এর মধ্যে কোনও শক্ত কেস্‌টেস্‌ এসে যায় ভগবানের দয়ায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুও নিজের টানাটানির কথা ব্যক্ত করেন। তবে এখনও পাঁচদিন বাকি ঐ যা ভরসা। যদিও এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র, পাঁচ দিনে গোপীকৃষ্ণবাবু কি আর ত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পাবেন, তা কিছু নয়।

শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—আচ্ছা, চিত্রকূট যদি না-ও হয়—অতদূর—

—টাইমটেবিলে একটা জায়গা বলছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন থেকে ছ' মাইল। সিনারি বেশ বলে লিখেছে—

—আজ আমার শালীও বলছিল, গ্র্যান্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশন থেকে পরেশনাথ পাহাড় যাওয়া যায়। তাই যাবে? খরচ কম হয়।

আবার রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, না পরেশনাথ পাহাড়? কোন্‌টা সস্তা? হিসেব করে টাইমটেবিল পড়ে দেখা গেল তাতেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা খরচ পড়বে জন পিছু। তার কম হবে না।—ও একরকম করে যোগাড় হয়ে যাবে এখন, বললেন শম্ভুবাবু।

আশ্চর্যের বিষয়, রোগী এবং রোগ দুই হঠাৎ কলকাতা শহরে বড্ড কমে গেল। সারা-দিনে আগে তবুও দুটো টাকাও হতো এখন পাঁচ আনার নক্স-ভমিকাও বিক্রি হয় না। রোগী দেখা দূরের কথা, ওষুধ বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ। তার ওপর শম্ভু ডাক্তারের মামাতো ভাই বিধু এসে হাজির, সঙ্গে তার স্ত্রী। দেশে চলছে না আদৌ, এতবড় ডাক্তার পিস্‌তুতো ভাই থাকতে তারা কি না খেয়ে মরবে?

গোপীকৃষ্ণবাবুর অবস্থাও যে ভাল তা নয়। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর ভাইঝি-জামাই দুটো ইলিশ মাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে হাজির। গোপীবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—ওগো শুনছো, জামাইয়ের ও-মাছের টাকা দিয়ে দিও যাবার সময়।

গোপীবাবু রেগে উঠে বললেন—কেন? আমি কি বলেছিলাম আমার বাসায় মাছ কিনে না আনলে আমরা সবাই না খেয়ে মরতে বসেছি? পাঁচ টাকা খরচ করে একজোড়া মাছ না আনলে চলছিল না?

—ছিঃ ও-কথা বলতে নেই। জামাই মানুষ, এনে ফেলেছেন যখন তখন সে দাম দিতেই হবে। সবাই মিলে মাছটা তো খাওয়া হয়েছে? জামাই একা খাননি।

—খাননি তাই কি? আমার সংসারে এক পো খয়রা মাছ কিনলে চলে যায় ছ' আনা

দিয়ে। পাঁচ টাকার মাছ কিনে একদিন খেয়ে আমার লাভটা কি হলো বলতে পার?

যতই উল্টো তর্ক করুন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সুবোধের মত মাছের দামটা জামাতা বাবাজির হাতে গুঁজে দিতে হলো যখন তিনি যাচ্ছেন। মিটে গেল ব্যাপার। আটটা টাকা বুক করে রাখা ছিল, তার মধ্যে ইলিশ মাছের ঠ্যালায় গেল পাঁচটা টাকা অকারণে বেরিয়ে।

শম্ভু ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে দুই বন্ধু কথা বলছেন। এবার কিন্তু ভ্রমণের আলোচনা নয়, কোথাও যাওয়া তাঁদের হবে না দুজনেই বুঝেছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বস্তাপচা আটা ময়দার কথা উঠেছে। ভ্রমণের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বলেননি আজ। কাল ষষ্ঠী।

হঠাৎ গোপীকৃষ্ণবাবু উস্‌খুস্‌ করতে করতে পকেট থেকে একখানা রঙীন কার্ড বের করে বললেন—হ্যাঁ—এই বলছিলাম কি, আমাদের আপিসের বঙ্কু সরকার কাল আপিস বন্ধের দিন এখানা দিয়ে গেল। ওদের গ্রাম লাঙলপোতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে তারই নেমন্তন্ন। রামায়ণ-গান হবে, চণ্ডী হবে দু'রাত। যাবে? বেশি দূর নয়, বারাসত স্টেশনে নেমে দু মাইল। চলো, পুজোর ছুটিটা তবুও কলকাতার বাইরে—আর সে বেশ জায়গা, ছেলে-ছোকরাদের দল মিলে রাস্তা করেচে, ঘাট করেচে, জঙ্গল কেটেচে। একটা পুরনো শিবমন্দির আছে নাকি অনেককালের। তাহলে কাল সকাল সাত-টায় শেয়ালদ' থেকে দত্তপুকুর লোক্যাল ছাড়বে—ওতেই চলো যাওয়া যাক্‌। দেখবার মত জায়গা।

শম্ভু ডাক্তার উৎসাহের সঙ্গে বললেন—বেশ, বেশ, সে বেশ বেড়ানো হবে এখন। চলো তাই, আমি ঠিক সময়ে রেডি হয়ে স্টেশনে হাজির হবো কাল।

পরবর্তী তিনদিন দুই বন্ধুর পরম আনন্দে লাঙলপোতায় কাটে।

সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের নিজেদের তৈরী মেটে রাস্তা, শনিবার সোমবারে হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে রাঙা আলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হলো নবমীর রাত্রে। পরদিন হলো গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা। খাওয়া-দাওয়াও কদিন বেশ হোল। বঙ্কু সরকার অতিথিবৎসল লোক।

খুব খুশী গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার।

বাক্স বদল

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হোত না। সব স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পুজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটরবাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে না গেলে কি চলত না?

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। বাক্স, সুটকেস, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থবেঙ্গল এক্স-প্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি ওঁরা জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হোল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা ভাল বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁর বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পর-

স্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সিট। দুটি মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু'একবার অল্পক্ষণের জন্যে চেয়ে দেখেছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারি আছে বলে এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি!

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ!

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের এখন গেয়ান কি হয়েছে বাবু? খোকাবাবুর নাম কি, ও খোকাবাবু?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু'একটা চাষা-গাঁ।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে ভীষণ কষ্ট হোত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কিনা।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজী বই—'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স'। ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পেঁছিল।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি, বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনও বিয়ে হয়নি! কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটির? বালুরঘাটে কার মেয়ে?

—হিলি! হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার! স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে!

—ওরে, নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পনের কৌটোটা কোথায়? দেখ দেখ, বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে। ব'স্ না চুপ করে, গাড়ী দেখবি তো ইস্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই, তিন, চার—গাড়ীর ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে, ওই লাল সুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি,—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজেই সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পেঁছিল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে ভাটখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়ায় নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু মাইল তফাৎ দিয়ে রাঙাপাড়া রোড দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জন জায়গা। দূরে অনুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মত দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ওকাজ তার পোষায়ও না. সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ী গিয়েছে দু দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হোল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসত।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে—ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমায় নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু দিন, তাড়াতাড়ি যা—। কোন কেস ছিল এ কদিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অন্য কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে!

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু সিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

স্যুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্যুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র? শাড়ী কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ-বেরঙের শাড়ী, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি ; এছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রিম, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, ফাউনটেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না, চিরুনি, আরও কত কি। সর্বনাশ!—কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হোল, তার বোন কমলার স্যুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ী ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন জায়গায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স ; কমলা বাড়ী বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছ-কয়েক সরু সোনার চুড়ি ; নতুনওঠা কাঁচের চুড়িও দু গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসানো, কাজ-করা। একটা মানিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলী স্যুটকেস। পুরুষের নামগন্ধ নেই স্যুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। স্যুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হোল? ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে? মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনও মেয়ে তো ছিল না ; পার্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল ; তাদের মধ্যে এ স্যুটকেস কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের স্যুটকেস।

আচ্ছা, মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে; তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?—তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে-কোনও মেয়ের স্যুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিচ্ছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলিক্ষুরে প্রতুল কখনও কামাবে না, দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মত হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়েনি। কি এখন সে করে?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই স্যুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ি আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায়!

শাড়ী বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ী যা আছে সব জরিপাড় ; আর তাঁতের দামী শাড়ী শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা ; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ী যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ী আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে,

কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ী? আর সাদা ব্লাউজ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ী পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজারকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হোল না। রঙিন শাড়ী পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর হিয়ার অলরেডি! থট ইউ ওন্‌ট বি হিয়ার বিফোর টু-মরো।

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'জ অ্যামিস?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ? ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে,—সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার স্যুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মনিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হোল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন, ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

—ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়্যার জন্য আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালো। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স এই পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে—না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিশি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তার রোমান্স!

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে স্যুটকেস বদল হোল? বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারও সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওর সেই বইখানা 'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্‌স্' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না

কায়স্থ না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়ল স্যুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে স্যুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসল।

চিঠি খান-পনের। একজনেরই হাতের বেশ শৌখিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, C/o সি. আর. পাল, ২২/৬ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ী নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই স্যুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো স্যুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্ছা যাবে! দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই স্যুটকেসের মধ্যে! তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়ের কোন উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ। শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার স্যুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সে স্যুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। স্যুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটি তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অন্তত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের স্যুটকেসটি কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিসে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্যবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার স্যুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার স্যুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, স্যুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনস্যিওর্ড

আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার স্যুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি তা বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী এসে জুটল মাঝখানে। তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে স্যুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের স্যুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও তালের পাটালি পর্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা মনে জাগে বই কি! বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জন জীবনে। তা ছাড়া, কোন্ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ী রওনা হোল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালবাসে। কমলার বিবাহের কথাবার্তা চলছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ী যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হোল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে স্যুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে স্যুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা স্যুটকেস।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কন্ডাকটারকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ী থেকে কোনও লোক আসেনি?

কন্ডাকটার বললে—ডেপুটি সাব? নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা।

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরও বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ যখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর স্যুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জন বাংলোতে —এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীদের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সিটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির? সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্বে মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে,—আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরণ ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে নর্থ-বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব? তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠল প্রায়। বললে—কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পেঁছে দেব বাড়ী, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেলে। কিন্তু মুখে বললে,—আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাটে নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়ীতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্য কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা

আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।...অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার স্যুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য, আমিই ভাটিখালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও! আপনি প্রতুলবাবু! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

—সেবার বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন —না?

প্রতুল হেসে বললে,—হ্যাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স-বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ? আমার দোষ, যতই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

—স্কটিশ চার্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি-এ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু? মামার বাড়ী থাকেন বুঝি?

—না, মামার বাড়ী ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ী করি?

মেয়েটি বললে—গাড়ী করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হোল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেতে চাইলে—সে কথায় তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স-বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ীর মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এলে তাকে

বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো। আপনি অতি মহৎ লোক। এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরমাত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ীর মধ্যে ওর কাকীমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন।

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি-একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বস্ একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই, অনেকদিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহুদিন থেকে। আই-এ-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি-এ পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম-এ পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ীর মধ্যে বলছে এ বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও-বেলা ধীরে সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম. বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা, বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা-জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসার, বাপ-মা-মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব, এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়ার্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স-বদল করবে? অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, ব'লো না! কি কষ্ট সেদিন আমার! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙি, শার্ট! মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝি নে। বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক। কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার! আর বাক্স-বদল হোল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে! বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে, গুড়, পুরনো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো!

প্রতুল বললে—হায়, হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে!

অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না। শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ! তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। অফিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশী কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তার-বাবু? যদি দু'একটা কথাই করো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ্!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার

রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহ দেন নি ; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পুজো করতে যেতেন, আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক্ ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মনুষ্যে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধ'রে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল।

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটে নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো-চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিলখিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপ্পর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়ীতে ছাগল ঢুকে নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুক-পূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজোনো হ'ল, হালুয়া তৈরী হল, পেয়ালায় ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি?...

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি?

—তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরী করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ী তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল! দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ! দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখেনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ী থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময় দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ি পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠ্‌ল; যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ী বেড়িয়ে আম খেয়ে ফুর্তি করতে। সে জষ্টি মাসের দুপুরে রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে একদিন বললে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েচে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ী ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ী থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

এখনই যাবি কেন, বোস আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি— ; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ারমুখী মেয়ে, এই ভর সন্ধেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে!—হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ী আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে

ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন যাচ্চে আসচে। শান্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিন-রাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স্ পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মতান্তর চলচে। হীরু জানত এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে, নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূর্বদিকে শৈলসানুতে, একটি বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্‌চে—পূবদিকে দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যান্ড্‌উইচ্, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্মো-ফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার ক'রে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই।

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় থেকে উদ্ধার করো না—তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেছি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর

উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি···সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন, তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পুজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমার আর ঢোঁক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি। আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গে ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেনেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি করে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ, একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশী হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বোরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি অসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে...হাত-পা নড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেচে...নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি...

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেল। নতুন এম-বি পাস ক'রে জামালপুরে প্র্যাকটিস করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠা-মশাইকে মেয়ে দেখতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হ'ল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দিতে পারবো কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল তো? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বললে—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্যে তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুরমতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা! আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ্, কথা শোন,—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত!

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শকনো লাঠি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাগী এত রাত্রে করে কি? হুস্ হুস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

দ্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও দ্যায় না রাত্তিরে?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি জন্য দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুণের পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্‌গে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সংগে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুণ তাঁকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন, এখানে কি হ'ল? সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বল্লে—আচ্ছা ঠাক্‌মা, শেষ বয়েসে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি। হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে

কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

দ্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাক্‌মা?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাক্‌মা? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম শেখো না। চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্তা—ঠাক্‌মা তুমি কি?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়ীটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন, সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক। শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথকঠাকুর কথকতা শুরু করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দ্যাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু'তিনখানা পান্সিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথকঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হ'ল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে

আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লেন—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুণ লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা।

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্ক ভাব, বিশেষ কোনো কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হোলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দু'টো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মাল্‌দ' ফজলি—মায় ন্যাংড়া পর্যন্ত। আমি তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপ্ন অনেক অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি, কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরণ শোনো না, ভাটপাড়ার ভট্‌চার্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি ব'লে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটা। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্বজন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোনো কথা বল্লেন না। তাঁর ওর কথা একেবারেই ভালো লাগে না। মাগী যেন কী! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না! মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন, তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচ-তলায় ম্লান মুখে ছলছলে চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েচে মুংলী, তেমন দুধ ত আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মত পুষেছিলেন—তিনি

নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখজ্যে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ীমা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ীর চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাকুমা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েছে, কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপুজো করচেন। দ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আরও ওই মাগীর জ্বালায়...

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে—বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন। সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হ'লে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হ'তে হ'লে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্বেই শনিবার সকালের গাড়ীতে কানু এসে হাজির হ'ল। দ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপীনাথপুরে নিয়ে চল্ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর দু'মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুণ দেশের ইস্টিশানে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর

মত? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর-জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাক্‌মাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশী-প্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল্, ন'বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠানের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসী-তলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাক্‌মা, ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

হাবু—নাপিতের ছেলে, সুতরাং রীতিমতো তার বুদ্ধি।

পায়রাগাছির গুনিন রোজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সে নাকি মন্ত্রবলে সাপ হতে পারে, বাঘ হতে পারে, কী না হতে পারে! লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়িতে বড় বড় হবসের চব্‌সের কুলুপ লাগানো আছে—পায়রাগাছির রোজা (ওঝা) এসে কী একটা মন্তর বিড়বিড় করে বলে দু বার তালা ঝমঝম করে নাড়লে, আর তালা সব গেল বেমালুম খুলে। এ কত লোকের স্বচক্ষে দেখা। রায়েদের কলম আমবাগানে বিকেলবেলা কেউ কেউ নাকি দেখেছে রোজা কলমের আম পাড়ছে—হয়তো লোকে ধরতে গিয়ে দেখলে একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে বাগানের উত্তরদিকের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

পায়রাগাছির রোজা! মস্ত বড় নাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এত বড় নাম-করা রোজা যে, তাকে কেউ কখনো দেখেনি। কোথায় যে কখন কীভাবে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না।

হাবুর বড্ড ইচ্ছে সে কিছু মন্তর-তন্তর শেখে। এ তার অনেকদিনের ইচ্ছে। এখন তার বয়স আঠারো-উনিশ। যখন তার বয়স চোদ্দো-পনেরো তখন থেকে সে যেখানেই শুনেছে রোজা গুনিন এসেছে অমনি তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে। একবার তাদের পাশের গ্রামের হাই স্কুলে একজন বড় জাদুকর এসে নানারকম তাসের খেলা, টাকার খেলা দেখালে। একটা তাস বেমালুম গোলাপ ফুল হয়ে গেল, এর মুঠো বাঁধা হাতের টাকা ওর হাতে গেল, এক গ্লাস জল হয়ে গেল মিষ্টি শরবত।

তাদের গাঁয়ের দু-চারজন লোকের সঙ্গে হাবুও গিয়েছিল খেলা দেখতে। একখানা তাসকে তার চোখের সামনে গোলাপ ফুল হতে দেখে সত্যি সে কী আশ্চর্যই না হয়ে গিয়েছিল!

ফেরবার পথে সন্ধে হয়ে এসেছে। ওর কীরকম গা ছমছম করতে লাগল।

কালী স্যাকরা দলের মধ্যে প্রবীণ। হাবু বললে—আচ্ছা, কালী জেঠা, ওসব কী করে করলে?

কালী স্যাকরা একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে বললে—আহা, ওসব তো সোজা !

—সোজা, কালী জেঠা ?

—খুউব সোজা।

—কীরকম সোজা ?

—ওসব মন্তর-তন্তরের কাণ্ড। আমিও ইচ্ছে করলে পারি।

—তুমিও পার ?

—কেন পারব না।

—একদিন করে দেখাবে জেঠা ?

—হুঁ হুঁ, যা। সময় হলে দেখাব। ও কিছুই নয়।

কালী স্যাকরার কথায় কিন্তু হাবুর বিস্ময়বোধ দূর হল না। সে গিয়ে জাদুকরকে পরদিন সকালে পাকড়ালে। সোজাসুজি তাঁকে জানালে সে ওইসব খেলা শিখতে চায়। শাগরেদ হতে সে রাজি আছে। জাদুকর কলকাতার লোক, মাথায় নরম বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়ে থাকেন, হাতে ঘড়ি পরেন, চোখে থাকে চশমা। তিনি নাক উঁচু করে বললেন—ওসব হয় না হে ছোকরা, হয় না। অনেক টাকার খেলা, অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিলে তবে শাগরেদ করি।

হাবু বললে—প্রিমিয়াম কী ?

—প্রিমিয়াম টাকা হে, টাকা পারবে আমায় দিতে ?

মরীয়া হয়ে হাবু বললে—আজ্ঞে কত টাকা ?

—একশো।—পারবে দিতে ?

—আজ্ঞে না। অত টাকা কখনো একসঙ্গে দেখিনি।

—তবে ফিরে যাও। এসব অমনি হয় না।

—কিছু কম করে নিন—

—দুশো করে প্রিমিয়াম নিই, তোমায় একশো বলেছি !

হাবু সেখান থেকে সরে পড়ল। অত টাকার সিকিও দেবার ক্ষমতা নেই তার। জাদুবিদ্যা শেখবার সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে !

কেটে গেল বছর-তিনেক। এই তিন বছরে তার জীবনে নতুন কিছু ঘটল না। এ অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন একরঙা ছবির মতো একঘেয়ে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হাবু দুপুরে মাছ ধরতে গেছে নদীতে, এমন সময়ে দেখলে একটা লোক আমবাগানের ছায়ায় বসে আপন মনে কতকগুলো ঢিল নিয়ে খেলছে। হাবু একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে লোকটা একটা ঢিল হাতে নিয়ে ছুড়ে দিতেই সেটা মস্ত বড় একটা কোলা ব্যাঙ হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে

পালাল। আর একটা ঢিল ছুড়তেই সেটা হয়ে গেল একটা ছেলেদের দুচাকার খেলনাগাড়ি, কিন্তু সে গাড়ি গড়গড় করে গড়িয়ে চোখের বাইরে অদৃশ্য হল, আর একটা ঢিল হিলহিল করতে করতে একটা সাপ হয়ে চলে গেল, একটা ঢিল একমুঠো আবীর হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে মাটি রাঙিয়ে দিলে। হাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে বললে—কী ?

স্তম্ভিত ও ভীত হাবু কোনো কথা না বলে একেবারে লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

গাছতলায় লোকটা নেই।

হাবু বিভ্রান্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। অত বড় আমবাগানের কোথাও সে নেই ! দুমিনিট হাবু দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ সে দেখলে হাত-দশেক দূরে সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

হাবু কাতর কণ্ঠে বললে—আমাকে দয়া করুন।

—কী দয়া ?

—পায়ে ঠেলবেন না এমন করে। আমাকে আপনার চাকর করে রেখে দিন। আমি অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি।

—আমি গরিব লোক, চাকরে আমার কী দরকার। তাছাড়া আমার হাতে অনেক চাকর। এই দেখো—বলেই লোকটা একটা ঢিল গাছের ওপরের ডালের দিকে অবহেলার সঙ্গে ছুড়ে মারতেই ঝরঝর করে একরাশ আম পড়ল। হাবু একেবারে স্তম্ভিত। আম আসে কোথা থেকে এই কার্তিক মাসে ? পাড়াগাঁয়ে কোনো গাছেই এ সময়ে আম তো দূরের কথা, আমের বউলও নেই। পাকা আম ঝুড়ি-খানেক তার সামনে !

লোকটা বললে—খাবার জল ? এই—

যেমন একটা ঢিল ছোড়া,অমনি গাছের গুঁড়ির এক জায়গা একেবারে ফুটো হয়ে কলের মুখে যেমন জল পড়ে, তেমনি জল পড়তে লাগল। লোকটা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে বললে—খাও—ভালো জল।

হাবু কাতর সুরে বললে—আমায় শাগরেদ করে রাখুন !

—কী সর্বনাশ ! শাগরেদ ? আমি ওস্তাদ নই।

—আমায় দয়া করুন।

লোকটা হি হি করে হেসে উঠল। ওকী ! মুখের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল বেগুনি রঙের ছানাওয়ালা প্রজাপতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।...লোকটা কে ?

এর উত্তর লোকটা দিলে। বললে—পায়রাগাছি জানো ? উত্তরদিকে। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা করো।

হাবু হাঁ করে রইল। ইনি তবে পায়রাগাছির সেই গুনিন ! সবাই বলে, উনি 'নুটি মন্তর' জানেন, অর্থাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারেন। আজ সে নিজে তার প্রমাণ পেয়েছে। হাবু হাত জোড় করে বললে—আমায় দয়া করুন।

পায়রাগাছির রোজা এবার নরম সুরে বললে—শেখাতে পারি নুটি মন্তর, কিন্তু ছোকরা, তুমি এ পথে কেন ? এ পথে কেবল তারাই আসতে পারে যাদের বাসনা কামনা ক্ষয় হয়ে গেছে। কত লোভের পথ খুলে যাবে—দেখো। আচ্ছা রোসো, দিচ্ছি তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে।

কিছুদিন কেটে গেল।

হাবু এখন নুটি মন্তর শিখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে সে একজন ভীষণ চোর। সে ঘরে যায়, ভালো ভালো জিনিস সব চুরি করতে ইচ্ছে হয়। খাবারের দোকানে গেলে ইচ্ছে হয় খাবারের হাঁড়ি ফাঁক করে। সে যে চোর, তা সে কখনো জানত না। একদিন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখলে, মস্ত একটা ইলিশ মাছ এনেছেন বন্ধুর বাবা। রোয়াকে সেটা পড়ে আছে, বন্ধুর মা ঘরে ঢুকেছেন বঁটি আনতে। ওর লোভ হল মাছটাকে নিয়ে দৌড় দেয় !

হাবু ভয়ে তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল !

বন্ধুর মা ওকে দেখে বললেন—ওমা, হাবু কোথা দিয়ে এলি ? তোকে তো দেখলাম না দরজা দিয়ে আসতে ? এই মাত্তর তো ঘরে বঁটি আনতে গিয়েছি।

হাবু হেসে চুপ করে রইল।

একদিন আরও গুরুতর ব্যাপার ঘটল। পাড়ার গাঙ্গুলিরা বড়লোক, তাদের বাড়ির ওপরের তলায় খাটে একছড়া দামি সোনার হার কে ফেলে রেখেছে। হাবু কৌতূহলবশত গাঙ্গুলিদের তেতলায় অদৃশ্য অবস্থায় বেড়াতে গিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই হার হাতে নেমে এল। সেও অদৃশ্য, তার কাছে যে জিনিস থাকবে তাও অদৃশ্য।

কেউ কিছু টের পেলে না।

তারপর যখন জানা গেল হার চুরি গিয়েছে, তখন গাঙ্গুলিদের বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। গাঙ্গুলিদের বড় মেয়ের হার সেটা, তার সে কী কান্না ! সবাই মিলে তাকে অপমান উৎপীড়ন করতে লাগল, সে কেন এত অসাবধান, কেন সে হার খাটের ওপর ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সন্দেহ গিয়ে পড়ল

এক বৃদ্ধা দাসীর ওপর। তার ওপর শুরু হল নির্যাতন। পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে লাগল।

কিন্তু হাবুর সবচেয়ে অসহ্য হল গাঙ্গুলিদের মেয়ের সেই হাপুস নয়নে কান্না। মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামীর বনিবনাও নেই। বাপের বাড়ি পড়ে থাকে। এমন মেয়ের কোনো মান থাকে না বাপের বাড়ি। বউদিদিরা একেই তো তাকে দাঁতে পেষেন, তার ওপর সে বাপের দেওয়া হারছড়া খুইয়ে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী।

হাবু অদৃশ্য হয়ে সব দেখছিল, হারও তার পকেটেই ছিল। আর সহ্য করতে না পেরে হারছড়াটা সে বালিশের তলায় রেখে দিলে। সেখান থেকে সেই মেয়েই প্রথম হার আবিষ্কার করলে। তখন কী হাসি তার মুখে।

তা তো হল, কিন্তু হাবু পড়ে গেল মহা বিপদে।

সে চোর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত ? এ কী ভয়ানক প্রলোভনে সে পড়েছে ! পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাকে। মনের বল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লোভ সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম। অদৃশ্য না হয়েও থাকা যায় না, অদৃশ্য হলেও বিপদ। এ কী সর্বনাশা মন্ত্র !

মাসের পর মাস কাটে, এই ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

হাবু ইতিমধ্যে এক বিয়েবাড়ির ভাঁড়ারে ঢুকে সের-খানেক সন্দেশ মেরে দিল। পরক্ষণেই জাগল অনুতাপ—তীব্র অনুতাপ। সে কোথায় নেমে চলেছে দিন দিন ! পায়রাগাছির রোজা এ কী সর্বনাশ তার করে গেল ! কিছুতেই অদৃশ্য হবার প্রলোভন সামলানো যায় না। কিছুতেই ভোলা যায় না নুটি মন্তর। নুটি মন্তর তার জীবনের অভিশাপ।

বছর-খানেক এভাবে কেটে গেল। কত খুঁজলে পায়রাগাছির রোজাকে—কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

একদিন হাবু সেই আমবাগান দিয়ে যেতে যেতে সেই একই গাছের তলায় দেখলে পায়রাগাছির রোজা সেইরকম ঢিল নিয়ে ছুড়ে খেলা করছে। ওর দেহে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। সন্ধান মিলেছে এতদিন পরে। ও ছুটে এগিয়ে কাছে গেল। ঢিল একটা ব্যাঙ হয়ে লাফাতে লাফাতে পালাল। একটা ঢিল সদ্য-কাটা ধাড়ি ছাগলের মুণ্ডু হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখি রোজার মুখের মধ্যে থেকে বের হয়ে উড়ে গেল।

হাবু ছুটতে ছুটতে (পাছে রোজা অদৃশ্য হয়ে যায়) গিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল।

রোজা প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বললে—কী হয়েছে ?

—আমায় বাঁচান।

—কী ব্যাপার ?

—আপনি সব জানেন। আপনি অন্তর্যামী। ওস্তাদজি, নুটি মন্তরের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করুন। আমার চরিত্র গেল, মনের শান্তি গেল—সব গেল। এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

রোজা মৃদু মৃদু হেসে বললে—একবার মন্তর দিলে আর ফেরত হয় ?—হয় না।

হাবু ভয়ে শিউরে উঠল। তবে কি জীবনভোর এই সর্বনেশে মন্তরের ভার বইতে হবে তাকে ? এই অশান্তি,—পদে পদে এই পরীক্ষা সারাজীবন চলবে ?

হাবু পা আঁকড়ে ধরে বললে—বাঁচান আমায়। আমি মরে যাব।

—তবে চাও না নুটি মন্তর ?

—আজ্ঞে না।

রোজা হেসে বললে—তবে যাও, দিলাম না। মোটেই তোমাকে মন্তর দিইনি। পরীক্ষা করছিলাম।

হাবু অবাক। সে কী কথা ! এক বছর ধরে তবে সে কীসের ভার বোঝা বয়ে মরল ?

সে কী বলতে যাচ্ছিল। রোজা হেসে বললে—মোটে সাত মিনিট কেটেছে। এই প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে আমবাগানে। নুটি মন্তর তোমাকে দেওয়া যায় কি না পরীক্ষা করছিলাম। আমি আজ বিশ বছর এই মন্তরের ভার বয়ে আসছি, আর তুমি এর দায়িত্ব সাত মিনিটও নিতে পারলে না ?

হাবু বললে—তবে আমি গাঙ্গুলিদের বাড়ি হার চুরি করিনি ? ময়রার দোকানে খাবার খাইনি চুরি করে ? তবে আমি—

—না। মোটে সাত মিনিট কেটেছে। আমার সামনে ছাড়া তুমি কোথাও যাওনি। এই তো প্রথম তোমার সঙ্গে আমবাগানে...

বলে কী ! হাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়রাগাছির গুনিন হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চামচিকে তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে থেকে পটপট শব্দে বের হয়ে ইতস্তত উড়ে গেল।

গলটন কাকা

রজনীবাবুদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে সেদিন ছোটখাটো একটা সাহিত্যিক বৈঠক ছিল। তর্ক, আলোচনা ও প্রচুর খাওয়াদাওয়ার মধ্যে সন্ধ্যা বেশ ভালোই কাটল। রজনীবাবু বর্তমানে সাত-আটটা বড় কয়লাখনি, বর্ধমান জেলার জমিদারি, সিংভূম জেলার শালবন ও মৌজার মালিক ; এসব বাদে কলকাতায় বাড়ি-জমি তো আছেই নানাস্থানে।

রজনীবাবু বললেন—বসুন, বসুন। বেশি রাত হয়নি এখনও। পৌঁছে দেব এখন গাড়িতে। একটা গল্প বলি। আমার তখন বয়েস নবছর। আমাদের বাড়ি বর্ধমান জেলার বনপাশ স্টেশন থেকে দুক্রোশ দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে। গ্রামের বাইরে অবধি মাঠ, শুধুই ধান হয় সে মাঠে, মাঠের মাঝখানে বড় বড় তালগাছে ঘেরা সেকেলে দিঘি, তার নাম 'গলাকাটা পুকুর'। বহু আগে যখন ওসব দেশের ওইসব তেপান্তর মাঠে নির্বান্ধব পথিকদের গলা কেটে ডাকাতেরা লাশ বেমালুম দিঘির জলে পুঁতে রাখত, তখন থেকে ওই নামে চলে আসছে দিঘিটা।

একবার রোদ-পোড়া মাঠে চৈত্র দুপুরে আমি আর গ্রামের দুটি ছেলে মাছ ধরছি, হঠাৎ একটি ছেলে—তার নাম হরু, রামচন্দ্র সাবুই-এর ছেলে, আজও মনে আছে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ও কে—ওই দ্যাখ—

—কে রে ? কই, কোথায় ?

—ওই তো বসে।

তারপর সবাই মিলে কাছে গিয়ে দেখলাম তালগাছের তলায় এক সাহেব বসে ; তার পরনে অতি জীর্ণ ও মলিন তালি-দেওয়া প্যান্টালুন, তেমনি কোট, তেমনি জুতো।

আমরা কাছে যেতে সাহেব কী একটা বললে, আমরা বুঝতে পারলাম না। যেসময়ের কথা বলছি, তখন একজন সাহেবকে এ অবস্থায় অজ পল্লীগ্রামে দেখা খুব একটা আশ্চর্য বিষয় ছিল। আমরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি, এমন সময় সাহেবটা আবার কী যেন বললে।

হরু বললে, ও খেতে চাইছে ভাই।

আমারও তাই মনে হল।

আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম—আমার সঙ্গে এসো।

সেই সাহেবকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলাম।

বাবা অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি মাইনর স্কুলের সেকেন মাস্টার। আমাদের বাড়িতে দু-তিনটে ধানের গোলা ছিল, চল্লিশ বিঘে ধানের জমি ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, জিনিসপত্রও তখন সস্তা ছিল। সংসার ভালোই চলত, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না।

বাবা সাহেবকে বাইরের ঘরে একটা টুলের ওপর বসালেন। চেয়ার ছিল না আমাদের বাড়ি। ইংরিজিতে কী কথা তার সঙ্গে বললেন। তার পর আমাকে বললেন, বাড়ির মধ্যে দিদিকে গিয়ে বল গে এক বাটি মুড়ি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে। সাহেব খাবে।

আমি কিছু আশ্চর্য হয়েই দিদিকে গিয়ে কথাটা বললাম। আমার মা এসময় খুব পীড়িত, আমার ছোট ভাই বিনয় তখন সবে মাস-খানেক হল জন্মেছে, মার শরীর সেই থেকেই খারাপ! দিদি কাঁসার বড় জামবাটিতে মুড়ি, দুধ আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখে আমার হাতে দিয়ে বললে, কেমন সাহেব রে?

—ভালো সাহেব।

—চল আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আসি।

আমার দিদির নাম ছিল বীণা, আমার সে দিদি মারা গিয়েছে বহুদিন।

বাবার মুখে সব শুনলাম। সাহেব আসছে বরাকর থেকে; গরিব, ওর কেউ কোথাও নেই। বাবার কাছে আশ্রয় চেয়েছে; বাবা বলেছেন, থাকো। তবে আমাদের ঘরে যা জোটে তাই খেতে হবে।

সাহেব তাতেই রাজি হয়েছে।

সেই থেকে সাহেব আমাদের বাড়িই রয়ে গেল। গাঁয়ের লোক দলে দলে আসতে লাগল সাহেবকে দেখতে।

আমরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতাম, ওই তো সায়েব বসে আছে—

বাইরের ঘরে সাহেব থাকত। কৃষাণের জন্যে একটা ছোট তক্তপোশ পাতা ছিল সেখানে অনেকদিন; সেইখানে পুরনো তোশক ও থলের চট, একখানা পুরনো চাদর ও একটা বালিশ, একটা ছোট মশারি দিয়ে সাহেবকে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন বাবা। একখানা লোহার কলাই-করা সান্‌কি আর একটা কলাই-করা গেলাস, এই আমরা দিয়েছিলাম ওকে, তাতে সে ভাত খেত।

সাহেবের নাম ছিল থর্নটন। আমার মুখে ভালো উচ্চারণ হত না, আমি বলতাম থনটনকাকা। কেউ বলত ঠনঠন সাহেব।

আমাদের যা রান্না হত, থনটনকাকাকে তাই দেওয়া হত। দিদি এসে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, থনটনকাকা খেতে জানে না, মাছের ঝোল আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখেছে!

ওর কথা শুনে আমি গেলাম দেখতে। সে এক কাণ্ডই করেছে সাহেব। ডাল খায়নি, অথচ মাছের ঝোলে তালের গুড় দিয়ে মেখে চুমুক দিচ্ছে।

বললে ও, ইট ইজ সো হট!

কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝলাম ; ফার্স্ট বুক পড়ি, মানে করলাম, ইহা হয় এত গরম!

কিন্তু গরম—তাই কি? তালের গুড় মাখলে কি গরম কমবে?

পরে বাবা বলেছিলেন ওর মানে, খুব ঝাল। মাছের ঝোল খুব ঝাল হয়েছিল। হয়ই আমাদের বাড়িতে।

বাবা বলেছিলেন সাহেবের তরকারিতে ঝাল কম দিতে।

আমি আর দিদি ওকে খেতে শেখালাম—কীসের পর কী খেতে হয়, কোন জিনিসটা কীভাবে মাখতে হয়। থনটনকাকা আমাদের, বিশেষত দিদিকে, বড় ভালোবাসতে শুরু করলে। ক্রমে একটু আধটু বাংলাও শিখে ফেললে আমাদের কাছে।

দিদিকে বলত অদ্ভুত বাঁকা সুরে—বী-ণা ডাল ডেও। বাট ডেও নো—ডাল ডেও।

দিদি হাসতে হাসতে বলত—ভাত দেব না কাকা?

—নো। বাট ডেও নো। ডাল ডেও।

—বেগুনভাজা দেব? এই যে—এই দেব?

—নো।

থনটনকাকা বুড়ো লোক, পরে আমরা আবিষ্কার করলাম। সাহেবলোকের বয়স প্রথমটা আমরা বুঝতে পারিনি।

আমাদের সে তাসের খেলা শেখাত বাদলার দিনে বসে বসে। আমাকে ইংরেজি পড়াত বটে, তবে তার বাঁকা বাঁকা জড়ানো উচ্চারণ আমি প্রথমটা বুঝতে পারতাম না। একদিন বাবাকে বললাম—বাবা, সাহেবকাকা ইংরেজি জানেন না।

—সে কী?

—কীরকম বলে, হাসি পায়।

—ও যা বলে, ওই ঠিক উচ্চারণ। আমাদের মুখেই হয় না। ও ঠিক বলে। ও যা বলে তাই শিখবি।

থনটনকাকা আমাদের গাঁয়ে পুরনো হয়ে গেল। রামায়ণ-গানের আসরে, কবির আসরে সাহেব গিয়ে বসত সকলের সামনে। করুণ গান শুনে হয়তো খুব হাততালি দিত হাসিমুখে—এইরকম বুঝত।

একখানা মোটা বই বের করে মাঝে মাঝে পড়ত। বাবা বলতেন, ও বইকে বলে বাইবেল। সাহেবদের ধর্মপুস্তক।

সন্ধের সময় ডাকত—বীণা—

দিদি এসে বলত—কী থনটন কাকা ?

—খাটে ডাও।

—এখনও রান্না হয়নি। মুড়ি দেব ?

—নিয়ে এসো। টেল নো।

—না, তেল দেব না। গুড় দেব ?

—গুড় ডাও।

এইভাবে দুবছর কাটল আমাদের বাড়িতে। তখন সে বেশ বাংলা শিখেছে, এমনকী নিজের নাম বাংলায় লিখত—জেমন থরনটন।

আমি বললাম—ও কাকা, ভুল হয়েছে। থরনটন কী ? থনটন হবে। এই দেখো—একে বলে রেফ, এই বসাও। এবার হল থনটন।

—নো, নো রেফ অ্যান্ড অল দ্যাট। এই ডেখ—

—বেশ, দেখি—

সাহেব লিখল—থরনটন—

আমার দিকে চেয়ে বললে, ঠিক ?

—না ঠিক না। এই দেখো—

—ও, হ্যাং—হোক। আমি লিখব—টোমার রেফ আমি লিখব না।

—লিখো না। লোকে বলবে থরনটন—

—লেট দেম। বলটে ডাও।

দিলাম।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে তাড়াতাড়ি সব আম পেকে গেল। আমি বললাম—থনটনকাকা, আম পেড়ে নিয়ে আসি চলো পুকুরধারের বাগান থেকে।

—আমি সব পাকা আম খাব।

—খেও। লগা নিয়ে চলো, আম পাড়তে হবে।

কিন্তু আম পাড়তে যাবার আগে পিওন এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, পড়তে পার ? এ বোধ হয় সাহেবের চিঠি।

থনটনকাকাকে চিঠিটা দিলাম। চিঠিখানা পেয়ে হঠাৎ ওর মুখ কেমন হয়ে গেল। সেখানেই খুলে পড়ল। পড়ে কী সব বলতে লাগল ইংরিজিতে ! আর নড়ে না, ওঠেও না। কখনো আপনমনে হাসে, কী বিড়বিড় করে বলে। রাত্রে বাবার কাছে শুনলাম থনটনকাকা অনেক টাকা পাবে বিলেতে। ওর এক খুড়ি না পিসি ছিল, সে মারা গিয়েছে, ও তার সম্পত্তি পেয়েছে। বিলেতের উকিলেরা চিঠি লিখছে।

মাসখানেকের মধ্যে থনটন কাকা দেশে চলে গেল।

তারপর যে কথাটা বলবার জন্যে এ গল্পটার অবতারণা সেটা এখন বলি।

যাবার কিছুদিন আগে থনটনকাকা বাবাকে বললে—আমার তুমি অনেক উপকার করেছ, তোমার একটা উপকার আমি যাবার সময় করব। আমার সঙ্গে এক জায়গায় চলো, রেলে যেতে হবে।

বাবা গেলেন।

বরাকর নদীর কাছাকাছি কোনো একটা পাহাড়ের তলাকার শালবন আর লাল কাঁকুরে মাটির ডাঙা দেখিয়ে সাহেব বলেছিল বাবাকে—সমস্ত বাংলাদেশের কয়লার খেতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কয়লা আছে এই জমির তলায়। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন

আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, কেন এমন অবস্থায় পড়েছিলাম, সে কথা তোমাকে জানাব সময়মতো। এখন আমার পরামর্শ, এই জমি বন্দোবস্ত নাও, কিংবা কেনো। কেউ জানে না এর তলায় কী অমূল্য সম্পদ লুকানো। আমার কথা অবিশ্বাস কোরো না। একদিন ভেবেছিলাম নিজে আমি এই জমি কিনে নেব বা বন্দোবস্ত নেব। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা আমার ঘটল না। তার জন্যে দুঃখিত নই। তুমি আমাকে নিজের ঘরে নিজের সহোদর ভাইয়ের মতো স্থান দিয়েছিলে, তার খানিকটা প্রতিদান দিতে পেরে আমি খুশি হয়েছি। আমার কথা শোনো, বড়লোক হয়ে যাবে। বীণার বিয়েতে যৌতুক দিলাম এই জমি। কাউকে এসব কথা বলবে না। ঘুণাক্ষরেও না। তা হলে সব যাবে।

বাবা বাড়ি এসে মার গহনা বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার চলে গেলেন বরাকরে।

সন্ধান নিয়ে জানলেন, নিকটবর্তী পালনড়ি মৌজার ডিহি পাঁচপুর কাছারির জমিদার গঙ্গারাম মাহাতোর দু-আনি অংশের জমি ওটা। কলকাতার গৌরমোহন পাল দিগর বর্তমান মালিক।

গেলেন কলকাতায় জমিদারের বাড়ি। গৌরমোহন পাল দিগরের নায়েবকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিলেন। নায়েব নক্সা ও কাগজপত্র দেখে বললে—এ জমি বহুকাল থেকে পতিত। এ আপনি কী করবেন ?

নায়েবের সুরের মধ্যে যেন সন্দেহের রেশ রয়েছে।

বাবার বুক কেঁপে গেল। মনের অগোচর পাপ নেই। বাবা বললেন—চাষ-বাস করব।

ঘুঘু নায়েব হেসে বললে—সে কী মশাই ? পাথুরে ডাঙায় কী চাষ হবে ? চাষের জমি হলে এতকাল ও জমি পতিত থাকে ? তাছাড়া ওর ত্রিসীমানায় জল নেই। কীসের চাষ করবেন ?

—গোরুমহিষ পুষব, চাষ করব, বাসও করব, সবরকমই—

নায়েব চোখ মিটকি মেরে বললে—আমায় কী দেবেন ?

—কেন গরিবের উপর জুলুম করবেন ? আপনাকে খুশি করব।

—কত ?

—একশো টাকা।

—না। ওতে হবে না।

—দেড়শো ?

—না।

—কত বলুন ?

—দশ হাজার টাকা। পাঁচ বছর পরে। নগদ দিতে হবে। লেখাপড়া করুন। এরা কলকাতার বড়লোক, এরা কী জানে মশাই, আমি আন্দাজে বুঝেছি। তবে আপনাকে নগদ দিতে হবে না। একটি কর্জনামার মতো রেজিস্ট্রি করা থাকবে। বুঝলেন ? যেন আপনি দশ হাজার টাকা ধার নিলেন আমার কাছ থেকে।

—সে হবে না। রেজিস্ট্রার টাকার লেনদেন নিজের হাতে করবে। দশ হাজার টাকা কে দেবে !

—তার ব্যবস্থা হবে। সব রোগের ওষুধ আছে।

জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল।

তবে আমরা জমিদারকেও ফাঁকি দিইনি। এখন সে জমির আয় বার্ষিক নিট দেড় লক্ষ টাকা।

জমিদারের নাবালক ছেলেকে আমরা দুহাজার টাকা ফি বছর দিই।

আমাদের যা কিছু দেখছেন সব সেই পালন্‌ডি কয়লার খনি থেকে। এখন আমাদের দশটা কোলিয়ারি, কোনোটাই কিন্তু পালন্‌ডির মতো নয়। পালন্‌ডি লক্ষ্মীর ঝাঁপি। থর্নটনকাকার ছবি দেখবেন ? চলুন পাশের ঘরে। না, আসল ছবি বা ফটো নয়। আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। আমি চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলাম অবিশ্যি যতটা মনে ছিল।

রজনীবাবু গল্প শেষ করলেন। বললেন চা খান আর একবার।

আমি বললাম—সাহেবের আর কোনো খবর পাননি ?

—কিছু না। আমার মনে হয় বিলেত যাওয়ার পথেই মারা গিয়েছিল। নইলে অন্তত বীণাদিদির খবর সে নিত। চলুন থর্নটনকাকার অয়েল পেন্টিং দেখাই। থর্নটনকাকা ভাঙা লোহার সান্‌কিতে ভাত খাচ্ছে, এই ছবিটাই আঁকিয়েছি। আসুন এই ঘরে।

বর্শেলের বিড়ম্বনা

'বর্শেল' অর্থাৎ বঁড়শি ও ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যে পটু। এককথায় ওস্তাদ মৎস্য শিকারি। লাঠি যে চালাতে পটু সে হল 'লেঠেল', ছিপ-বঁড়শি বাইতে যে পটু সে হল 'বর্শেল'।

এই সামান্য ভূমিকার দরকার ছিল এই জন্যে যে অনেকেরই 'বর্শেল' কথাটির অর্থ জানা নেই হয়তো—প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা প্রয়োজন যে, যেমন লাঠি হাতে নিয়ে সবাই বেড়ায়, কিন্তু সবাই লেঠেল নয়, তেমনি ছিপ দিয়ে মাছ সবাই ধরে, কিন্তু তারা বর্শেল নয়।

আমাদের গাঁয়ের রামহরি হোড় নামজাদা বর্শেল, আশপাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে তাঁর নাম বর্শেল হিসাবে প্রসিদ্ধ। 'তাঁর' ব্যবহার করলাম এজন্যে যে, রামহরি বনেদি ব্রাহ্মণঘরের সন্তান আমাদের গাঁয়ের—লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বড় বড় গোঁফ, চোখ বড় বড় ও রাঙা। আমরা ছেলেপুলের দল তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে চলি, বড্ড রাশভারী লোক। আগে অবস্থা খুব ভালো ছিল, এখন বিষয়-সম্পত্তির সামান্যই অবশিষ্ট আছে ; তারই আয়ে অতি কষ্টে সংসার চলে। রামহরি জীবনে কারো চাকুরি করেননি, এখন তিনি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেচেন—সুতরাং এ বয়সে পরের দাসত্ব আর স্বীকার করবেন না এটা নিশ্চয়।

কিন্তু মাছ ধরা সম্বন্ধে একজন 'অথরিটি' তিনি। বহু লোক এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে।

—হ্যাঁ হোড়মশাই, গাঙে কি চার করে রাখব আজ ?

—কী চার দিচ্ছ ?

—গোবর আর কেঁচো।

—নতুন বর্ষার জল, তুষ আর কুড়ো দাও।

তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্তৃত। কে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করবে ? হোড়মশায় জীবনের অনেক আশ্চর্য ধরনের মাছ ধরেচেন, তাঁর মুখে সেসব গল্প শুনলে আহারনিদ্রা ভুলে যেতে হয়। অবিশ্যি আমাদের মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে সেসব গল্প তিনি কখনো করতেন না, বড় লোকেদের সঙ্গে বসে বলতেন, আমরা বসে শুনতাম।

এসব পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলচি, আগেই বলে রাখি।

আমার তখন বারো-তেরো বছর বয়েস। আষাঢ় মাস, খুব বর্ষা হয়ে গিয়েচে, মাঠে-ডোবায় জল থইথই করচে।

হাবুল বললে, মাছ ধরতে যাবি, সন্তুদা ? জটেমারির খালে বড় বড় বান মাছ আর জিওল মাছ পড়চে।

—কে বললে ?

—কাল গোপাল আর নেড়াকাকা এই বড় বড় বান মাছ ধরে এনেচে।

—তোর বড় ছিপ আছে ? আমায় একখানা দিবি ?

—দুখানা মোটে আছে—বাকি তিনখানা পুঁটিমাছ ধরা ছিপ।

বেলা তিনটের পর আমরা চারজন সমবয়সী বন্ধু জটেমারির খালে কাঠের পুলের নিচে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—রামহরি হোড় সেখানে তাঁর লম্বা লম্বা ছিপগুলো নিয়ে দস্তুরমতো চারকাঠি পুঁতে একমনে গম্ভীর মুখে একা বসে।

সন্তু প্রশংসাসূচক বিস্ময়ের সুরে বললে—রামহরিজ্যাঠা মাছ ধরচে !

আমি বললাম—কই ?

—ওই দ্যাখ ওই গাছের নিচে।

আমার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। মস্ত বড় বর্শেল রামহরিজ্যাঠা দস্তুরমতো চারকাঠি পুঁতে মাছ ধরতে বসেচেন। যদি মাছ ধরতে হয়, তবে ওঁর আশেপাশে বসে। নয়তো মাছ হবে না। যে যে-সাধনায় সিদ্ধ, তার শরণাপন্ন না হলে সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

আমি বললাম—চল, রামহরিজ্যাঠার ডাইনে ওই ফাঁকা জায়গাটায় ছিপ ফেলি।

হাবুল বললে—উনি যদি বকেন ?

—বকেন তো বকবেন, দেখছিস নে, ওঁর চারে বড় বড় মাছ সব আসতে শুরু করেচে ! অমন ওস্তাদ এ দেশে নেই। কী দিয়ে চার করতে হয়, কীসে বড় মাছ আসে, এ উনি যেমন জানেন, এমন কেউ জানে না।

আমরা পাশে বসবার উদ্যোগ করচি, রামহরি বর্শেল কিন্তু সেটা তত প্রীতির চক্ষে দেখলেন না। একটা কারণ হচ্চে, তিনি মাছ জড়ো করবার মশলা ছড়িয়েচেন জলে, এখন অন্য কেউ এসে তাঁর তৈরি জমিতে চাষ করুক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয়ত আমরা চঞ্চল বালক, তাঁর মতো চুপচাপ বসে থাকতে পারব না, গোলমাল করবই। তা হলে মাছ আসবে না চারে। ভয় পেয়ে ভেসে যাবে।

রামহরি হোড় তুরীয় অবস্থা থেকে নেমে এসে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—এই! ওখানে বসবি নাকি?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আপনার পায়ে পড়ি কিছু বলবেন না আমাদের।

রামহরি বিরক্তিপূর্ণ মুখে বললেন—যত আপদ! আর জায়গা পেলিনে? আচ্ছা, চুপ করে বোস। কেউ কথাটি কইবিনে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ছিপ ফেলেচি আমরা, কিন্তু একটা মাছও ঠোকরায়নি। গোলমাল না করি, কথাবার্তা চলছে সমানে। ক্রমে কথাবার্তার সুর চড়ল।

পচা বললে—ওই খেতটায় কাঁকুড় হয়েচে, সন্তু যা, গোটা-চারেক কচি দেখে কাঁকুড় তুলে আন—

রামহরি বর্শেল ওদিক থেকে ধমকে দিয়ে বললেন—এইসব কী হচ্চে?

আমরা ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে হাবুল এবং পচা বাবলাকাঁটার নিচু বেড়া ডিঙিয়ে অদূরবর্তী কাঁকুড়ের খেতে ঢুকে পড়ল এবং তিনটি বড় বড় কাঁকুড় নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

গণ্ডগোল বাধল কাঁকুড়ের ভাগ নিয়ে।

আমি বললাম—তোমরা ভাগ বেশি নেবে কেন? সমান ভাগ করো। আমি তোমাদের ছিপ নিয়ে চৌকি না দিলে তোমরা কাঁকুড় আনতে পারতে?

পচা বললে—আমি বড়টা তুলেচি, ওটা আমার।

যতীশ নাপিতের ছেলে কেষ্ট বললে—তা কেন? সমান ভাগ হবে।

রামহরি আবার ধমক দিয়ে বললেন—ওসব কী হচ্চে রে? মাছ ধরতে এসেছিস না কাঁকুড় খেতে এসেছিস এখানে?

আমি বললাম—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না জ্যাঠামশায়!

—কী করে মাছ ঠোকরাবে? তোমাদের তো মাছ ধরা নয়, মাছ-ধরা খেলা। কী জানিস তোরা মাছ ধরার? সব কটাতে জুটে হুটোপাটি করচিস আর কাঁকুড় চুরি করচিস পরের খেত থেকে। মাঝে পড়ে আমারও মাছ হল না তোদের গোলমালে। নইলে যা চার করেছিলাম, কুঁড়ো দিয়ে আর পুরনো তেঁতুল—

রামহরি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উত্তেজনার মুখে মৎস্য-শিকারের গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করে ফেলেছিলেন আর একটু হলে।

আমি চুপিচুপি বললাম—ওই শুনে রাখ, কুঁড়ো আর পুরনো তেঁতুল এই দিয়ে চার করতে হবে, বুঝলি তো! ভুলে বলে ফেলে দিয়েচেন—

হাবুল ছিপ একখানা জল থেকে তুলে বললে—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না।

রামহরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছিপটার দিকে চেয়ে বললেন—ও কী বহর দিয়েছিস ? তোদের সবই হল ছেলেখেলা ! জল মেপে বহর দিতে হয়।

আমি আগ্রহের সুরে বললাম—সে কী করে করতে হয় জ্যাঠামশাই ?

—জল মেপে নিসনি ?

—তা তো জানিনে।

রামহরি দাঁত খিঁচিয়ে বললে—তা জানবে কেন ? জানো কাঁকুড় চুরি করতে। ঢিল বেঁধে সুতো জলে ছেড়ে দ্যাখো কতটা ভিজেছে—সেখানে ফাত্না তুলে বাঁধো—তাকে বহর দেওয়া বলে। দেখি ?

আমি ছিপ তুলে দেখাতে রামহরি বর্শেল সেদিকেই চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—আড়াই হাত বহর দে।

সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। রামহরি বর্শেল স্বয়ং আমাদের বহর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েচেন। এইবার মাছ না হয়ে যায় ?

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পরে আমাদের মধ্যে আবার গুঞ্জন-রব উত্থিত হল এবং খুব শিগ্‌গির সে গুঞ্জন কলরবে পরিণত হয়ে গেল। এবার গোলমাল বাধল ছিপের বহর নিয়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ ধরতে ব্যগ্র।

পচা বললে—আমায় ছিপ দাও—আমি নিজে বহর দিই।

আমি বললাম—তুই কী বুঝিস বহরের ? আমায় দে, দিয়ে দিচ্চি।

—থাক, তোর আর ওস্তাদি করতে হবে না—ঢের হয়েচে।

—মুখ সামলে কথা কবি সন্তু !

—তুই মুখ সামলে—

আমাদের সুর তখন পঞ্চমে উঠেচে। রামহরি বললেন—কী বিপদেই পড়েছি এদের নিয়ে ! আজ যে আমার চার করাই মাটি হল দেখছি এদের জ্বালায় ! তোরা বাপু অন্য জায়গায় যা—ওঠ ওখান থেকে—বেরো—

আমরা তাড়া খেয়ে ছিপ গুটিয়ে সেখান থেকে উঠে আর কিছু দূরে গিয়ে বসলাম। একটা কাশঝোপের আড়াল থাকার দরুন সেখান থেকে রামহরি বর্শেলকে ভালো করে দেখা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সামনের ছোট খালে কচুরিপানার দামে নীল ফুল ফুটেচে, বর্ষার জল থই থই করচে খালের কানায় কানায়। ওপারের চরে আরামডাঙা গ্রামের বাঁশ-খেজুর-তালগাছের শীর্ষ বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের তলায় একটি শ্যামল সরলরেখা রচনা করেচে। দু-একটা সাদা বক জলের ধারে পানা-শেওলার দামের ওপর চরে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চিৎকার শুনে আমরা রামহরিজ্যাঠার দিকে চাইলাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একটা বড় ছিপ দুহাতে হ্যাঁচকা টান মেরে তুললেন—এটুকু আমরা দেখলাম। তারপর তিনি বলে উঠলেন—যাঃ—

হাবুল বললে—রামহরিজ্যাঠা মস্ত বড় মাছ বাধিয়েচে, চল গিয়ে দেখি—

সবাই মিলে তখনি ছুটে গিয়ে শুনলাম প্রকাণ্ড মাছ বেধেছিল ওঁর ছিপে, কিন্তু উনি টান দিতেই ছিপের আগা ভেঙে নিয়ে মাছটা পালিয়েচে। সত্যিই দেখি, বড় একটা ছিপের আগার দিকটা ভাঙা, ছিপটা হাতে করে বোকার মতো রামহরি দাঁড়িয়ে।

আমাদের দেখে বিরক্তির সুরে ঝাঁজের সঙ্গে তিনি বললেন—তোদের জন্যে আজ সব মাটি। না দিলি চারে মাছ আসতে, না দিলি সুস্থ হয়ে মাছ ধরতে। সেই বেলা তিনটে থেকে পেছনে লেগেচিস বাপু, মাছ ধরতে আসিস কেন তোরা? কী বুঝিস মাছ ধরার? একি ছেলের হাতে পিঠে? এত বড় মাছ খেলে, শুধু তোদের জ্বালায় তুলতে পারলাম না, সুতো কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল। নাঃ, আজ আর মাছই ধরব না। কাল থেকে আমার ত্রিসীমানায় বসতে দেব না বলে দিচ্চি—

রামহরিজ্যাঠার যত রাগ আমাদের ওপর এসে পড়েচে বুঝলাম। নইলে তাঁর মাছ পালিয়ে গেল সুতো কেটে, তাতে আমাদের অপরাধ কোথায়? হাবুল নিচু সুরে বললে—বা রে, উনি পচা সুতো নিয়ে মাছ ধরতে এসেচেন, তাতে আমাদের দোষ বুঝি? আমরা মাছকে শিখিয়ে দিইনি তো—

যাহোক, রামহরিজ্যাঠা তো ছিপ গুটিয়ে চলে গেলেন। তারপরেই যে ঘটনাটি ঘটল আমাদের মতো বালকের জীবনে, সেরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

রামহরিজ্যাঠা চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পর হঠাৎ আমার নজর গেল বাঁ দিকের শেওলাদামের ধারে একটা সাদা শরের ফাত্না একবার ডুবচে একবার উঠচে। আমার কথায় হাবুলও সেদিকে চেয়ে দেখলে। ফাত্নাটা ক্রমেই যেন ডাঙার দিকে আসতে লাগল—অথচ খালের স্রোত তো এখন উলটোদিকে বইচে, তবে ফাত্না ডাঙার ধারে আসচে কীসের জোরে ?

হাবুল বললে—তাই তো সন্তুদা, ওটা কী হচ্চে ?

হঠাৎ আমি জিনিসটা বুঝতে পারলাম। রামহরি জ্যাঠার সেই ছিপের ফাত্না ! বড় মাছ ওর তলায় বঁড়শিতে বেধে আছে।

কথাটা যেমন মনে হওয়া, আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কীসের ঝাঁজ বেরিয়ে গেল ! ততক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি। হাবুলকে বললাম—রামহরি জ্যাঠার সেই মাছটা ! ও জখম হয়ে এসেচে বলে অবসন্ন হয়ে ডাঙার দিকে আসচে। জলে নামো সবাই—

হাবুল বললে—পচা, তুই ছেলেমানুষ আছিস, পরনের কাপড় খুলে ফেল, মাছটাকে কাপড় দিয়ে জাপটে ধরতে হবে।

আমি বললাম—ভারী মাছ, খুব সাবধানে তুলবার চেষ্টা করো। জলের তলায় ওর কুমিরের মতো শক্তি।

সবাই মিলে জলে নামলাম। ফাতনা ধরে সন্তর্পণে টান দিতেই জলের তলায় প্রকাণ্ড মাছ ঝটপট করে উঠে জল ছিটিয়ে আমাদের সারা গা ভিজিয়ে দিলে। আমাকে তো টেনেই নিয়ে গেল কিছুদূর—হাবুল আমার কোমর জড়িয়ে টেনে রাখলে। বললে—টান দিসনে, সুতো ছিঁড়ে যাবে—মস্ত মাছ—সাবধানে তোল।

প্রায় মিনিট-পনেরো ধরে মাছটা যুঝল। যারা কখনো বড় মাছ ছিপে ধরেচে, তারাই জানে এ ব্যাপার কী ! এক-একবার এমন হল যে, মাছ বুঝি আর থাকে না, চোঁ-চোঁ ছুটল বেশি জলের দিকে। তার চেয়েও ভয় ছিল ঘন কচুরিপানার দামের নিচে গিয়ে লুকোলে এ মাছের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

অবশেষে মাছটা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। মুখে আড়াই ইঞ্চি বঁড়শি নিয়ে কতক্ষণ পারবে ? মাছ অবসন্ন হলে ক্রমশ আপনিই ডাঙার কাছে আসে। পচা সেই সময় কাপড় দিয়ে মাছটা জাপটে ধরল—আমরা সবাই গিয়ে পড়লাম মাছটার ওপরে। টেনে ডাঙায় তুলে দেখি সের-পাঁচেক আন্দাজ ওজনের রুইমাছ !

গ্রামে ঢুকবার পথেই রামহরি বর্শেলের ঘর। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে

এসেচে, রামহরিজ্যাঠা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চেন। আমরা হইহই করে আসচি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কী রে ? মাছ পেলি নাকি ?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাই। রামহরিজ্যাঠার নাকের সামনে দিয়ে বড় মাছটা নিয়ে যাব !

দাওয়া থেকে নেমে এসে রামহরি বললেন, এত বড় মাছটা তোরা কোন ছিপে ধরলি ? তোদের সঙ্গে তো বড় ছিপ ছিল না !

আমি বললাম—হরকওলা বঁড়শির একখানা ছিপ আছে—এই যে !

রামহরি হাজার হোক, ওস্তাদ বর্শেল তো ! আশ্চর্য হয়ে বললেন—মাছটার নিতান্তই তাহলে মরণ ছিল। হরকওলা বঁড়শিতে পাঁচ সের রুইমাছ ওঠে, এ কখনো সম্ভব হয় না। তোদেরও ছেলেখেলা করতে গিয়ে এত বড় মাছটা জুটে গেল অমনি অমনি—নইলে ও-মাছ হরকওলা ছিপে ডাঙায় ওঠানো তোদের সাধ্যি ছিল ? ওই যে বললাম, মাছটার কপালে নিতান্তই মৃত্যু ছিল আজ !

বাড়ি ফিরে রামহরিজ্যাঠার বাড়ি আমরা সেড়-দেড়েক কাটা মাছ আর মুড়োটা পাঠিয়ে দিলাম।

শিকারি

জংলি দেহাতি বালক মাগনিরাম। রামজির কাছে মেগে ওকে নাকি কোলে পাওয়া গিয়েছিল। এরা ভগবানের কাছে ও মানুষের কাছে বিনয় প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, তাই বৈশ্য-বণিকদের মতো কুরুচি প্রদর্শন করে না ছেলের 'লাখপতিয়া' 'দৌলতরাম' প্রভৃতি নাম রেখে।

ঝাঁপড়িশোল গ্রামে ওর বাড়ি।

মোটরের রাস্তা থেকে বাঁদিকে বেরুনো সরু রাস্তা। এই রাস্তার কিছু দূরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শিমুল গাছের আবাদ। প্রায় তিন-চার একর জমিতে শুধু দেড়শো দুশো শিমুল গাছ। ফাল্গুন চৈত্রে ফুল ফুটলে কী অদ্ভুত দেখায় রাস্তা থেকে, নিষ্পত্র বড় বড় গাছগুলিতে আগুন-রাঙা পাপড়ি জ্বলচে শিমুল ফুলের।

শিমুল গাছের আবাদ পার হয়ে একটা নদী, নাম বরজোর নালা। বড় বড় শিলাখণ্ডের পাষাণ-বাঁধানো তটভূমির ওপর ছায়ানিবিড় বনপাদশ্রেণী, তাদের তলা দিয়ে বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে বরজোর নালা ছুটে চলেচে অদূরবর্তী শঙ্খনদীর দিকে। শঙ্খনদী আবার মহাডাল পাহাড়শ্রেণীর তলায় গিয়ে মিশেচে মহানদীর সঙ্গে। সেটা কোথায় গিয়েচে, ঝাঁপড়িশোল গাঁয়ের লোক অত খবর রাখে না। বরজোর নালা পার হয়ে চুকুরদি-তুরুবদি রিজার্ভ ফরেস্ট। চুকুরদি একটা খ্রিস্টান গ্রামের নাম, গ্রামের মধ্যেই ওদের পুরু কর্কশ সাবাই ঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গির্জা। দেওয়ালের শালকাটির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে দেখা যাবে একখানা মাত্র টিনের ভাঙা চেয়ার গির্জাঘরের একমাত্র আসবাব। বগোদর থেকে মাসে একবার পাদ্রিসাহেব এসে এদের নিয়ে উপাসনা করেন ও শাস্ত্রকথা বলেন, তাঁর জন্যেই এই চেয়ারখানা জোগাড় করা আছে।

চুকুরদি গ্রাম পেরিয়ে, মহাডাল পাহাড়ের তিনশো ফুট একটা শাখা পার হয়ে, একটা বৃদ্ধ মাদার গাছ পার হয়ে বনবেষ্টিত বনকাটি গ্রাম। মাত্র ছাব্বিশ ঘর লোকের বাস, কোল ও মুণ্ডা জাতীয় লোক, এরা খ্রিস্টান নয়।

গ্রামের বাইরে এদের বড় বড় শালগাছের মধ্যে বোঙ্গাপূজার স্থান।

মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্যদেবের উদ্দেশে এখানে মুরগি বলি দেওয়া হয়।

গাঁয়ের সবই বছরে একদিন রেঁধে খায়। হাঁড়িকুড়ি ফেলে যায় বোঙ্গাতলার একপাশে। বছর বছর জমেচে পুরনো হাঁড়ির পাহাড়।

বনকাটি গ্রামের পরে মাঙ্গানবেড়া, মাঙ্গানবেড়ার পরে ঝাঁপড়িশোল।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঝাঁপড়িশোল গ্রাম যে রিজার্ভ ফরেস্টের ছায়াময় নিবিড়তার কোথায় কতদূরে লুকানো, সেটা বোঝা যাবে।

এই গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলে দেখা যাবে, চক্রাকারে নীল শৈলমালা, মহাডাল, কাটচুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়ছুরি ও চুকুরদি পাহাড় (যেটার উচ্চতা আগেই বলা হয়েচে) এ ক্ষুদ্র গ্রামকে ঘিরে রেখেচে। জারুল ফুল ফোটে বর্ষাকালে, করমগাছের হলদে ফুল ঝরে পড়ে থাকে বনতল বিছিয়ে, ধনেশ পাখি ডাকে, কেকারব করে বনশীর্ষে ময়ূরের দল।

মাগনিরাম ষোলো বছরের ছেলে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগা শরীর। এইসব জংলি গ্রামে বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া একবার যাকে ধরে, তাকে একেবারে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের কিন্তু সুন্দর সুগঠিত দেহ, পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও সুঠাম, সাবলীল—অধিকাংশ মেয়ের মুখই যেমন সরল, তেমনি সুন্দর।

মাগনিরাম আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সর্বদা। নিজের অসুখের জন্যেই বোধ হয়।

বন্ধু ননকুয়া এসে বললে—চল মাছটা ধরে আনি—

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে বললে—নাই যাব—

—কেনে ?

—উদাস লাগচে মাথাটা।

—দুখাচ্চে ?

—না হে, উদাস লাগচে। উ কথায় তোর কী কাম ? নাই যাব, ভাগি যা !

—কেনে ভাগবে ? ইঃ !

—দিখাব তোকে ? দিখবি ?

—কাঁড় ধরবার, হাত্তি নি, দিখবি কুথা থিকে ? উ অত সোজা ?

—ভাগি যা !

—নাই যাব।

মাগনিরাম রাগের সঙ্গে একটা ঢিল ছুড়ে মারলে। ননকুয়া হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল। পালিয়ে ঠিক নয়, চলে গেল বলাই সংগত। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মাগনিরামকে কে বা ভয় করবে ওদের মধ্যে!

মাগনিরাম সেই দুঃখেই উদাস মনে থাকে আজকাল।

বরজোর নালা ঘুরে ঝাঁপড়িশোলের নিকট দিয়েই গিয়েচে, সিকি মাইল দূরে একটা বন পার হলেই। এই নালার ধারে বনের ওপারে গ্রামের লোকেরা বর্ষাকালে কান্দা আলু তুলতে যায়। কান্দা আলুর বড় লতা শাল-আসান-অর্জুন গাছের গা বেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সেই অত উঁচুতে যেখানে বনের ময়ূর নৃত্য করে বর্ষার মেঘ পাহাড়ের শিখরে জঙ্গলে—সেখানে ফুটে থাকে কান্দা আলুলতার নীল ফুল।

মাগনিরাম সে ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অত উঁচুতে উঠে ফুল সংগ্রহ করতে পারে না বলে গ্রামের মেয়েরা তাকে খ্যাপায়, দোষ ধরে, মানুষ বলে ভাবে না।

তারা বলে—কমজুরি লোকটা হে, উ উসব কামের লয়—

ও উত্তর দেয়—গায়ের জুর লা আছে তো কী করচে। তুদের মনটা নেই যে হে—

বুধ্‌নি হেসে বলে—মনে কী করবে ?

—উ তোদের বুঝাতে লারব। জাহিল লোকদের বুঝাব কী হে ?

—উঃ, ভারি জাহিল জাহিল করতে এসেচে, বড় পণ্ডিতটা আছে তাই দিখাতে এসেছে—ভাগি যাঃ !

—তু ভাগি যা।

ওরা রাগ করে বলে—তুর ঘরে চাউল সিঝাই না মকাই মাগ্‌নি করি যে ভাগি যাব ?

এবার মাগনিরাম হাসে। মেয়েদের রাগ দেখে ওর হাসি পায়। বলে—যা যা হুজুমে চালাকানা—ঠ্যাঙাকানা দো—

এ কথার মানে, না গেলে লাঠি মারব। মেয়েরা রেগে গালাগালি করে আরও। ও হাততালি দিয়ে হাসে। বলে—বিজলি চমকাও কানা দো—

অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। ও চমৎকার গান বাঁধে সেদিনটা বিদ্যুৎ চমকানো নিয়ে। নিজেই গায়। এবার মেয়েরা মন দিয়ে শোনে। ওর ওপর তাদের রাগ ও বিতৃষ্ণা অনেকখানি চলে যায়। বোঙ্গা পরবের সময় ও নিজের বাঁধা ছড়া ও গান নিজের বন্ধু ননকুয়া ও ছোট বোন রতুকে শেখায়।

আসলে মাগনিরাম হল কবি।

কবির বংশও বটে, ওর বাবা জাতে সাঁওতাল, কিন্তু রাঁচি শহরে কিছুদিন ছিল। সেই জন্যেই ওর ছেলের নাম মাগনিরাম, নতুবা সাঁওতালের ছেলের নাম মাগনিরাম হত না। রামভক্তি সে বিদেশ থেকে এই নিবিড় বনপ্রদেশে আত্মগোপন করেছিল।

ওর বাবা এদেশে একজন বিখ্যাত লোক। রাঁচি শহরে সে মোটরগাড়ি দেখেচে, টেলিফুঁক দেখেচে, বিজলি বাতি,বিজলি পাখা, কলের গান—কত কী দেখেচে। আজ বছর-সতেরো আগেকার কথা। সতেরো বছর ধরে সেই গল্প ভাঙিয়ে খাচ্চে বাড়ি বসে। গ্রামের লোকদের সে অবজ্ঞার চোখে দেখে, বলে—সে দুনিয়াটার কী দেখলি রে? কুথা না গেলি, শরীরটার সক্কত হবে কুথা থেকে হে? মনের সক্কত হবে তবে তো শরীরটাতে লাগবে।

ওর কাছে সবাই আশ্চর্য গল্প শুনতে আসে। কতরকম পরামর্শ করতে আসে। ছেলেটিও বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে। দুনিয়া সংসারের কোনো কাজে লাগে না। বসে বসে কবিতা বানায় আর গান বাঁধে। এদিক থেকে সে বাপের চেয়ে এক কাটি সরেস হয়েচে, বলাবলি করে গ্রামের লোকেরা। অবিশ্যি নিন্দা হিসাবেই বলে, প্রশংসা করে নয়।

মাগনিরামের মন ওড়ে কান্দালতার নীল ফুল যেখানে ফুটেচে, সেই বনের মাথার ওপরে। বাবাকে সে বড় মানে ; বাবা একজন কত বড় লোক। কত দেশ ঘুরেচে। এখানকার জাহিল লোকেরা কী করে বুঝবে তার বাবা কত বড় ?

সে যদি জ্বরে না ভুগত তবে অনেকদূর চলে যেত এতদিনে—একবার সে গরমিন্টোর শিমুল গাছের আবাদ দেখতে গিয়েছিল, সেখানে তার কয়েকদিন আগে গরমিন্টো এসেছিল আবাদ তদারক করতে। গরমিন্টো মিঠাই ফেলে গিয়েছিল, বিলাইতি মিঠাই, লাল নীল রঙ কাগজে মোড়া। সে কুড়িয়ে প্রথমে ভাবলে, কী এগুলো ?

আবাদের চৌকিদার দেখে বললে—ও বিলাইতি মিঠাই। খেয়ে লাও—

সে মুখে দিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমন সে জীবনে কখনো খায়নি। গরমিন্টোর মিঠাই ভারি চমৎকার লাগে খেতে।

এসব ফেলে সে চলে যেত যে-দেশে ওইরকম আশ্চর্য জিনিস আছে, কিন্তু বাবার জন্যে মন কেমন করলে দূরে কী করে যাওয়া হয় ? তাছাড়া, শরীরে অসুখ তো লেগেই আছে, যে জন্যে সে গাছের ওপরে উঠতে পারে না, কাঁড় ধরতে পারে না,পাহাড় ডিঙিয়ে বড় ঝোপের বনে যেতে পারে না। কিন্তু বাবার মতো সে নামকরা লোক হতে চায়, বাবার মনে সুখ দিতে চায়।

বর্ষার বাজরা খেতে যেমন প্রতি বছর পাহাড় থেকে বন্যহস্তিযূথ নামে, খেতের ফসল নষ্ট করে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

ঘাটোয়ালি কাছারি থেকে ঢেঁটরা দিয়ে গেল, এবার মস্ত বড় পাগলা হাতি নেমে বন্য গ্রামগুলির অত্যন্ত ক্ষতি করচে। যে হাতি মারতে পারবে, তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

গ্রামের মধ্যে জোয়ান শিকারির দল চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে পরামর্শ করে না,পাছে তার মতলব অপরে আত্মসাৎ করে।

ঢেমন সাঁওতাল বনকাটি গ্রাম থেকে এসে একদিন সবাইকে ডেকে বললে—এ বছরের হাতিটি তুরা মারতে লারবি।

সবাই বললে—কেনে হে ?

—উ মাদী হাতি আছে। মারতে লারবি।

একজন যুবক শিকারি বললে—কাঁড় টেনে হাতি মারা নেই যাবে ? তুমি শিখাতে এসেচ ? মাদী হাতিটা কি হাতি লয় ?

—ই সে হাতি লয়। দেখে লিবি আমার কথা। এবছর দু-তিন আদমি মরবেই সব বস্তির। ঘাটোয়ালি কাছারির লোক টাকা দেবে সিধা বাত শুনে ? তা দিবে না। দেখে লিবি।

ঢেমন বড় শিকারি এ অঞ্চলের। একা বাঘ মেরেচে কাঁড় দিয়ে। বিষাক্ত ফলা চালিয়ে হাতি মেরেচে। তার কথা অগ্রাহ্য করবে এমন লোক এদিকের কোনো গ্রামে নেই।

মাগনিরাম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ঢেমন সাঁওতালের সুগঠিত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে প্রশংসার দৃষ্টিতে। মরদ বটে একজন! আজ তার যদি জ্বর না হত, সেও অমনি হতে পারত। তার বাবা বুড়ো হয়েচে। বাবার হাত থেকে কাজ নিতে হবে এবার তাকে। বাবাকে সুখে রাখতে হবে।

মাগনিরাম কবির দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখে। বাবাকে সাহায্য করতে হবে, সুখী করতে হবে এটা হল কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাইরের দুনিয়াটা শুধু কল্পনাতে চলে না। কল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার কৌশলও শেখা দরকার। মাগনিরাম সেখানে নিজেকে অসহায় বোধ করে।

কতদিন একলা বসে বসে কী ভাবে সেই জানে।

বাবা কত বড় হয়ে যাবে একশো টাকা পেলে! কাড়া কিনবে। কাড়ার দুধ খাবে। গরমিন্টোর মিঠাই আনিয়ে খাবে দুজনে। তার মা কবে মারা গিয়েচে ছেলেবেলায়, তার মনেও পড়ে না। বাবা তাকে মায়ের মতো করে মানুষ করেছিল। এখন সে যদি বাবাকে না দেখে, কে দেখবে?

সেদিন সে শুনলে নিমপুরা আর বরজোর নালার ধারে রোজ রাত্রে পাগলা হাতিটা নামচে। মাগনিরাম কাউকে কিছু না বলে বিকেলের দিকে একাই চলে গেল বরজোর নালার ধারে।

বর্ষায় বরজোর নালার কূল ছাপিয়ে জল উঠেচে এপারে বাজরা খেতে। ওপারে পাহাড়, সুতরাং জল সেদিকে না বেড়ে এই কূলকেই ভাসিয়েচে। বাজরা খেতে হাতির পায়ের দাগ সর্বত্র, খেত তচনচ করেচে হাতি।

সুমুখ জ্যোৎস্না রাত। মাগনিরাম ঢেমন সাঁওতালকে অনেক খোশামোদ করে দুটি বিষ-মাখা শলা সংগ্রহ করেচে। বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে সেই বিষ-মাখানো শলা কীভাবে ছুড়তে হয় সেটা দু-একবার দেখে নিয়েচে বটে, কিন্তু নিপুণ হাতে চালায় যারা, তারাই শলা চালাতে ইতস্তত করে, আনাড়ি মাগনিরামের কথা তো অনেক দূরের।

মাগনিরাম বরজোর নালার ধারের একটা কুলগাছে উঠে বসে রইল সন্ধ্যার আগে থেকেই। আপন মনে গুনগুন করে গান করতে লাগল। যদি আজ হাতিটা নামে।

অনেক রাত্রে সত্যি নামল পাগল মাদী হাতিটা। হাতি নয়, সাক্ষাৎ শমন।

আজই সন্দেবেলা এই খানিক আগে নিমপুরার একটি বুড়ো খেত-পাহারাদারকে খুন করে এসেচে, তার শুঁড়ে তখনও টাটকা রক্তের দাগ।

মাগনিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠল। একশো টাকা রোজগার করে বাবাকে আনন্দ দেবার চরম মুহূর্ত সমাগত। দেরি করলে চলবে না।

ঠিক যখন হাতিটা বরজোর নালার ধারে কুলগাছের পাশে এসেচে, মাগনিরাম বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে শলা ছুড়ল।

এর পরের ঘটনা টের পাওয়া গেল সকালবেলা।

বাজরা খেতের মধ্যে তিন জায়গায় মাগনিরামের দেহের তিনটি রক্তাক্ত থেঁতলানো টুকরো, কিন্তু মাগনিরামের বাবাকে একশো টাকা দিয়েছিল ঘাটোয়ালি কাছারি থেকে।

কেন তা বলি।

বরজোর নালার ওপারে সরকুন্দা জঙ্গলের কিনারায় প্রকাণ্ড পাগলা হাতিটা মরে পড়ে আছে—আবিষ্কার হল তিনদিন পরে। হাতিটার নাকের দুপাশে তখনও দুটো শলা গিঁথে ছিল। ঢেমন সাঁওতাল বীর শিকারি, শলা দেখে বললে—ই তো আমার হাতের শলা আছে হে! বাসুড়ির ছেলেটা আমার কাছ থেকে লিয়েছিল সেদিন। ওর মনে ই ছিল, সেটা কী করে জানচি হে?

ঢেমন সর্দারের সাক্ষ্যের বলে ঘাটোয়ালি কাছারির পানিকর, মাগনিরামের বাবাকে কাছারিতে ডেকে চার জন সাক্ষীর সামনে টিপসই নিয়ে, নগদ দশ টাকার দশখানা নোট ওর হাতে তুলে দিয়ে বললে—বাপের বেটা তো ইকে বোলে! চোখের জল না ফেলবি, উ তোর বেটা ছিল না, তোর বাবা ছিল হে!

বিরজাহোম ও গরু বাঁধা

ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেকদিন আগেকার কথা। রোয়ালে-বাদরপুর (খুলনা) হাই স্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্তী ওই গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করত, মানত। এক প্রহর ধরে জপ আহ্নিক করতেন, শূদ্রযারক ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকত দুপুরের পরে। স্বপাক ছাড়া কারো বাড়ি কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্তী ভালো সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোনো স্কুলের পণ্ডিতি করেননি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গবর্নমেন্টের দেয় বৃত্তির দিকে মন চলে যায়। টোল ইন্সপেক্টরদের খোশামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে, খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে নামে করেও নামছিল না, দিনে-রাতে গুমটের দরুন আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পুব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পরে। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরম যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্য ছেলেরা তদবির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেডমাস্টার অফিসঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন—সার, মেঘ করেছে—

মুরলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি ও অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বললেন—কীসের মেঘ ?

—আজ্ঞে, মেঘ যাকে বলে।

—কী হয়েছে তাতে ?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভালো হত। ছেলেরা অনেক দূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

—বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের আপিসের হেড কেরানিও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করত বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়াতত্ত্বটি তাঁর নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না ?

—না।

—কেন সার ? বেশ মেঘ করে এসেছে তো ?

—মেঘের আপনি কী বোঝেন ? ওকে বলে তাতমেঘা, ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখেছিলাম এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললাম—বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন মেঘে বৃষ্টি হয় ?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রা স্ট্রটোস্ মেঘে। যাকে বলে শিট্‌ক্লাউড।

—ও !

—তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মনসুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পুবে।

—ও !

আর কোনো কথা বলতে আমাদের সাহস হল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্থ করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠল, মেঘের চাদর ঢাকা পড়ল আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্‌ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামল। পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে, বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনও পর্যন্ত স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে। সবাই আমরা আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বললেন—দেখলেন সার, তখন বললাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হত না।

মুরলীবাবু বললেন—অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematics পড়ালে বুঝতেন। জগতে space and time নিয়ে অনেক

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্নেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazettee-এ বুঝলেন ?

—সেটা কী ?

—এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়েছেন তো ? অঙ্কশাস্ত্রে এ্যালিস থ্রু লুকিংগ্লাসের পরীক্ষা আর কী। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে এলেন। অঙ্কশাস্ত্রের কথা উঠলেই স্বভাবত তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে বড় খুশি। হেডমাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি !

এমন সময় ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়ির দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশি মন। আমাকে দেখে ডেকে বললেন—কেমন ননীবাবু, বিষ্টি হল তো ?

—এই যে চক্কোতিমশায়, নমস্কার ! তা হল।

—হবি না ? আজ তিন দিন থেকে হোম করছি বিষ্টির জন্য। ওর বাবাকে হতে হবে। অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে, তা ভালো জানা ছিল না। বললাম—বলেন কী ? হোম করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে !

গোপীবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলেন—লাগে তাক, না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন—আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাস্টারবাবুরা। দেখুন দেখাই।

গোপীবাবু ও আমি দুজনে দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমটে রাত্রে ঘুমুইনি।

গোপীবাবু কেবল বলছিলেন—আজ খুব ঘুম হবে, কী বলেন ?

—নিশ্চয়। তার আর ভুল ?

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনের কুণ্ডু—বালি বিছিয়ে তৈরি, বেলকাঠ ও জগ্‌গিডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ) এক পাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো, তামার টাটে নারায়ণশিলা। সিঁদুর বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক-ওদিক ছড়ানো।

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—দেখলেন মাস্টারবাবু ? হোম করার ফল আছে কি না দেখলেন ?

গোপীবাবু বললেন—আপনি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন ?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতার কাণ্ড দেখেছি যে কত! পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়!

—বলুন না দু-একটা ঘটনা?

—না, সেসব বলব না। থাক গে। কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখছিলাম আমার এক যজমানবাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠল খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড়ছড় করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কত্তিমশায়ের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জল-ব্যাঙ ডাকতে লাগল চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুইনি। এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবার উপায় নেই। বেশ জমিয়ে গল্প শুনবার জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতে—

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনও বছর পোরেনি। আমার এক যজমানবাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্যে। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকো করে নিয়ে গেল গোবরডাঙা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘরকতক ব্রাহ্মণ ও বেশিরভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস। যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কী ?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম বিকেলে। খুব বন-জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইটের

তৈরি। মন্দিরের মাথায় বড় অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে। প্রকাণ্ড বড় একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে, চামচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময়ে আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর বড় মেয়ে শৈল, চালভাজা ও ছোলাভাজা নিয়ে এল তেল-নুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্তী বিপত্নীক, তার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে কদিন হল, চলে গেলে চক্রবর্তীমশায় নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্তীও সেই সঙ্গে। এখনও দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল-ছোলাভাজা যে খেতে পারে, তার বহুদিনেও দাঁত নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চললেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে, হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো-চোদ্দো হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর, তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হল না। তাছাড়া আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে!

গৃহস্বামী বললেন—আপনি আশীর্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন মাথায় ওর।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কী হয়েছে দেখতে। কিছুই সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়ল কী করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগল। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে এক হইচই ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসব না? সন্ধ্যার কিছু পরে শিবমন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির

মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে—শুনুন, শুনুন। দুবার কানে গেল কথাটা। এদিক-ওদিক চাইতেই চোখে পড়ল শিবমন্দিরের মধ্যে ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে!

বললাম—আমায় বলছেন?

হ্যাঁ। ও খুকির জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যে-ই হই। যদি ভালো চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হলাম। নির্জন, অন্ধকার, ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়েমানুষ আসবে কে? এমন আশ্চর্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা রাগও হল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা, অপদেবতাকেও কখনো গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্তীকে ভয় দেখানো সহজ নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বললাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্রের ফর্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল, গৃহস্বামী আমাকে রান্না করতে বললেন। এইবার আমার গল্পের আসল অংশে আসব। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোনো ছিরি-সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লীগ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা, সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ওই বাড়ির ছাদ আর এ বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া এক ফালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল, আতপ চাল, বড়ি, আলু আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কাছে কেউ থাকে আমি পছন্দ করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরি চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু জিরিয়ে, তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আঙট-কলার পাতে। তারপর খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ছাদে আমি একা নেই। এদিক-ওদিক চাইলাম, কেউ কোথাও নেই, রাত বেশি হয়েছে, বাড়ির লোকেও নিচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রামই নিশুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুকঠুক শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কী গাছ ? কালো মতো, লম্বা তালগাছের মতো ? এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি, কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে ? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কী করে। কী গাছ ওটা ! সত্যি, যখন চা খেলাম, তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার ওই রাস্তাটা দিয়ে একখানা গোরুর গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আমাকে এদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন, কই তো অত বড় একটা তাল গাছ—উঁহু, কই ! নাঃ, দেখিনি।

কিন্তু তালগাছটা এমনভাবে—ও কীরকম তালগাছ ? ওকী ! ওকী !

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়েছি।

তালগাছ না !

এখনও ভাবলে—এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কত্তি, তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মতো মূর্তি, তার তত বড় বড় হাত পা—সেই মাপে। মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মতো, চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে ! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা, যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্তি। তালগাছের মতোই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নিচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দু-দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি এমন হল ? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল শাল নারকোল গাছের মতো তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্তি বিরাজ করছে সামনে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার সামনে। তার নিচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নিচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগল, অতটা সময় লাগেনি আমার বারকয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুনতে যত সময় লাগে, ব্যস। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্তি অন্ধকারে নির্জনে ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেত না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাত। কিন্তু সে এধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে

গেলাম। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কী। পড়লেই হয়ে যেত। দুর্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হলে ওরাই পালায়।

নিজেকে তখুনি সামনে নিলাম। তারামন্ত্র জপ শুরু করলাম জোরে জোরে, সেই দিকে চেয়ে। মন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুনতে যতটা সময় নেয় ততটা। এর খুব বেশি হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম, কিছু নেই। বিশ্বাস করুন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠল। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি ?

—তখুনি। এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজি নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

জলসত্র

বৃদ্ধ মাধন শিরোমণি মশায় শিষ্যবাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনোদিকে কোনো সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদ-পোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠল, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মতো দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখেমুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা এ মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, একথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধ হয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিমদিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের খেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই কেবল চকচকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগল। তৃষ্ণা এত বেশি হল যে, সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগল। জিব জোর করে চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মতো শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন জ্বলছে, চকচকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে...মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।...অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে

হতে লাগল—একটু ঘন সবুজমতো যদি কোনো পাতাও পাই তা হলে চুষি...জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগল। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা...পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ...কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে নতুন কলসির জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেইরকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয় ?...তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কলজে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠল। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়ল তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই ; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হয়ে গিয়ে সত্য সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে প্রাণ হারিয়েছে !...সত্যিই তো !...এখনও তো দু-ক্রোশ দূরে গ্রাম...যদি তিনিও ?...

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ হাঁটার শেষে কোথায় যেন একঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ হাঁটার বাজি জিতলে, সেই জলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এইভাবেই তিনি কলের পুতুলের মতো চলছিলেন। আধক্রোশটাক পথ চলে উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধ হয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোনো পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে ?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র। চার-পাঁচটা নতুন জালায় জল, একপাশে একরাশি কচি ডাব ! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা ! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ মুখে অঞ্জলি পেতে পান করছে। গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুরমশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে ?

একজন বলল—আহা, সে কথা রাখো, বাবাঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণিমশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু-তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।

একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল করবার জন্যে !...আঃ, কী ঝিরঝিরে হাওয়া ! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরি-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হল। একজন বললে—ঠাকুরমশায়, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হন। ভালো সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণিমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কাদের ?

—আজ্ঞে ওই আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস, নাম শুনেছেন ?

শিরোমণিমশায় বললেন—বিশ্বেস ? সদ্‌গোপ ?

—আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ ! নতুন মাটির জালা-ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণিমশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কী করে জল খাবেন ? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী ; আজ কি তিনি—ওঃ ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।—নইলে এখনি তো...

শিরোমণিমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া ?

—তা আজ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কী বলি শুনুন। বলে লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স, তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা বেগুন কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করত ; এতেই তাদের সংসার চলত। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশি হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়ল। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি, ছোট বোনটি মাঠের মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে—একটু এগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্তপাড়ায় জল খাওয়াব।

সেই 'একটু আগিয়ে' মানে দুক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়ল। বার বার বলতে লাগল—ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল...

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে একঘটি জল চেয়ে এনে দেখে তার ছোট বোনটা গাছতলায় মরে পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা! এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নাম হল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলত—দাদা, ওই মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্য তুই একটা জলসত্র করে দে!...তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো-ষোলো কী বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলব কী বাবাঠাকুর, এমনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—ওগো, আমি জল দেব, তুমি আমার সঙ্গে এসো।...

লোকটি তার কাহিনী শেষ করলে ; তারপর বললে—সত্যি-মিথ্যে জানিনে ঠাকুরমশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে...

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে এল। কত লোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগল। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙল ছেড়ে বটতলায় উঠল। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগল।

এক বুড়ি অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি

নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা ?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরব তো খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাট্‌কা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়-তোলা পায়ে এক-পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ করে বসে পড়ল। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না ?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে গেল এবং যে উকিলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দি বিরুদ্ধের আর একটা কেস হত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড় সাহায্যে আধ সের আন্দাজ ভিজে-ছোলা উদরসাৎ করে একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদ রঙের সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঠের

পেছনটা আলো করে ছিল। একটা পাখি আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বউ কথা-ক'—বউ কথা-ক'।

শিরোমণিমশায়ের বসে বসে মনে হল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলি মেয়ে উমার মতোই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল-অভাবে বুনো কচুর ডাটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরি করেছে...এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মতো দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে! চারিধারে যখন সন্ধ্যা নামে...তপ্ত মাঠপথ যখন ছায়াশীতল হয়ে আসে...তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র আঁচল উড়িয়ে কোনো অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে যায়!...তার পৃথিবীর বালিকাজীবনের ইতিহাস সে ভোলেনি।...

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি-মশায় তাকে বললেন—ওহে বাপু, তোমার ওই বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে একঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না?

প্রশান্তবাবুর কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

সেদিন যেন কিসের ছুটি ছিল। বিকেলবেলা আমি ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। বিকেলবেলা আমি প্রায়ই ইস্টিশানে বেড়াতে যেতুম, বিশেষতঃ ছুটির দিনে। হিস্ হিস্ করে স্টীম ছাড়ে, খট্‌খট্ করে গাড়ী চলতে থাকে, মাঝে মাঝে বিকট শব্দে সিটি দেয়। রেলের পুলের ওপর বসে আমার সেই সব দেখতে বেশ ভাল লাগত।

সন্ধ্যা হতে তখন অনেক দেরি আছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য যেন ফাগ ছড়িয়ে চারিদিক ভরিয়ে দিচ্ছে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীর মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিঃশব্দতায় ধরিত্রী ভরে যাচ্ছে। আশেপাশের ঝোপঝাপ থেকে পাখীদের কিচির কিচির শব্দ ভেসে আসছে। আমি আঁকাবাঁকা মেঠো পথ বেয়ে পাকা কাঁঠালের তীব্র গন্ধে চিত্ত মদির করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

এমন সময় কলকাতা থেকে ট্রেনখানা এসে প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়াল। সে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সশব্দে হাঁফ ছাড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তার বিশ্রাম নেবার অধিকার। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত কয়টির মধ্যে সকলের ওঠানামা শেষ করতে হবে। যথাসময়ে গাড়ী পুনরায় ছেড়ে দিল। সে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে সরু ফালি লাইনের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধূম নির্গত করে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। তার পেছনের লাল আলোটা বহুক্ষণ ধরে দেখতে পেলুম। আম কাঁঠালের বাগানের ধার দিয়ে, বাঁশঝোপের পাশ হয়ে, সবুজ ধানক্ষেতের কোণ ধরে, পানের ঝাড় পেছনে ফেলে সশব্দে ট্রেন এগিয়ে গেল।

কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে একটি ভদ্রলোক ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে এলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা, বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, খুব ফর্সা, চোখে সোনার চশমা। গ্রামের মধ্যে কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। অবাক হয়ে তাঁর পানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলুম। আশ্চর্য! তিনি আমার কাছেই এগিয়ে এলেন, এমন কি তিনি আমাকেই প্রথমে সম্বোধন করলেন, শোন খোকা।

আমার চিত্ত পরম শ্রদ্ধায় ভরে গেল। বিনীত কণ্ঠে বললুম, আজ্ঞে!

তিনি বললেন, তুমি বুঝি এখানে থাক?

বললুম, হাঁ।

তিনি বললেন, বিষ্ণুপুর হাইস্কুল কোথায় বলতে পার?

বললুম, এই তো আমাদের স্কুল, চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন, ওঃ, তুমি বুঝি ওই স্কুলে পড়?

আমি গর্ব অনুভব করলুম। তিনি বললেন, কোন্ ক্লাসে পড়?

বললুম, ক্লাস সেভেনে।

তিনি বললেন, বেশ বেশ, তোমার নাম?

বললুম, শ্রীমান নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, গ্রামের মধ্যেই প্রায়। একটা মোড় বাঁকতেই স্কুল দেখা গেল। বললুম, ঐ দেখুন, আমাদের ইস্কুল.....ঐ সাদা রঙের দোতলা বাড়ীটা। আপনি কোথায় যাবেন? ইস্কুল তো এখন বন্ধ।

তিনি বললেন, আমি যাব আশু চৌধুরীর বাড়ী।

আমি বললুম, ওঃ। আপনিই বুঝি আমাদের নতুন হেড্‌মাস্টার?

তিনি স্মিতমুখে বললেন, হাঁ, কেন বল তো?

আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলেছি? প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. আমাদের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। আমি নিবিড় শ্রদ্ধায় তাঁর পদধূলি মাথায় নিলুম। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, থাক্ থাক্ থাক্।

আজও আমি সেদিনের কথা ভুলতে পারিনি। তাঁর সেই সৌম্যমূর্তি মধুর ভাষা আমার স্মৃতিপটে দূরপনেয় রেখাপাত করে গেছে।

স্কুলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। আগেকার বুড়ো হেডমাস্টারের পরিবর্তে প্রশান্ত-বাবুকে পেয়ে অনেকে স্বস্তি বোধ করল। উঁচু ক্লাসের বড় বড় ছেলেরা তো হেসেই ফুঁ করে উড়িয়ে দিল। বলল, আরে ছ্যা! ও আবার হেডমাস্টারী করবে! ডিসিপ্লিন কাকে বলে তাই হয়তো জানে না। অতটুকু হেডমাস্টারকে কেই বা মানবে? কি বলিস্ বক্কেশ্বর?

বক্কেশ্বর তুড়ি দিয়ে বলল, আরে অমন অবনীবাবুকে ঘাল করে দিলাম, তার আবার প্রশান্ত মুখুজ্জে এম. এ.! মাত্তর দুদিন, তারপর দেখে নিস, বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব আমরা হচ্ছি ইস্কুলের লিডার। নে নে ভোলানাথ, একটা গান ধর।

সঙ্গীতজ্ঞ ভোলানাথ বলল, ইস্কুলে বসে গান?

বক্কেশ্বর বলল, আরে গর্দভ, টিফিনের সময় গাইবি তো তাতে কি হয়েছে? নে সেই গানটা আরম্ভ কর, সেই 'ভুলি ভুলি কারি ভুলিতে নারি'.....

অগত্যা ভোলানাথ গলা ছেড়ে গান ধরল। গায়ক ভোলানাথের স্কুলে বেশ নাম আছে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিলুম। সেখানে ঢোকবার হুকুম নেই, কারণ সে হচ্ছে বড়দের আসর। গান বেশ তালে তালে চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে হেডমাস্টার মশাই সেখানে নিঃশব্দে এসে হাজির হলেন। কে যেন ভোলানাথের গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। লিডারদের মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেল। তাদের বীরত্ব আস্ফালন চিরতরে অস্তমিত হল। হেডমাস্টার মশায় ভোলানাথের কান ধরে দাঁড় করিয়ে তার দুগালে ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো চড় মেরে বললেন, এটা বাগানবাড়ী নয়।

তারপর অন্যান্য শ্রোতাদের এক এক চড় মেরে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমন নিঃশব্দে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। লিডারদের তখন রক্ত গরম হয়ে গেছে। কেউ বলল, সেক্রেটারীর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করবে। কেউ বলল, মজা দেখাবে।

কিন্তু কারুর মজা দেখাতে কিংবা অ্যাপ্লিকেশন করতে সাহস হল না। পরন্তু সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে হেডমাস্টার মশাই ভারী রাশভারী এবং কড়া মেজাজের লোক। বাস্তবিক ইস্কুলের সকলেই তাঁকে রীতিমত সমীহ করে চলত।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামময় তাঁর সুনাম রটে গেল আদর্শ শিক্ষক হিসাবে। তাঁকে সকলে ভক্ত শ্রদ্ধা করতে লাগল। তিনি ছিলেন ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। যে যখন যা প্রশ্ন করত তিনি তখনই তার উত্তর দিতেন। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে তিনি সব সময় উন্মুখ ছিলেন।

তাঁর মধ্যে কোথাও একটুকু গর্ব ছিল না। তাঁর মুখ কোন সময়ে হাস্যমধুর, কোন সময়ে বা গাম্ভীর্যে অটল-প্রায়। সেই যে কথা আছে না—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি

কুসুমাদপি', হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ঠিক সেই রকম। ছেলেরা কোন অন্যায় করলে তিনি তখন কঠোর শাস্তি দিতেন, আবার ছেলেরা কোন ভাল কাজ করলে তিনি তাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন—

মাস কয়েক পরে শুনলাম তাঁর নাকি বিয়ে, এমন কি আমারই কাকার মেয়ে ঊষার সঙ্গে। ঊষাকে দেখতে ছিল ফুটফুটে ফুলের মত। দুজনকে চমৎকার মানায়। হারাণ-চক্কোত্তি বললেন, অমন সোনার টুকরো মাস্টারকে সংসারী না হলে কি মানায় মুখুজ্জে মশাই? আমরা থাকতে এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কিন্তু বিয়ে যে করতে চাইছে না।

চক্কোত্তি বললেন, ক্ষ্যাপা! বিয়ে কর বল্লেই বুঝি ছেলেরা রাজী হয়? কলিকালে সব উল্টে গেছে। ওরা মুখে প্রথমে ওরকম বলে থাকে। তুমি দেখে নিও, ও বিয়ে করবে। আরে দাদা, বিয়ে করতে কার না ইচ্ছে যায়? দেখে নিও, চাটুজ্জের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবই দেব।

যথাসময়ে তাঁরা হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই প্রথমে বিনীতভাবে তাঁদের প্রস্তাব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। অথচ গ্রামের লোকও কেউ সহজে ছাড়ল না। হেডমাস্টার মশাই বললেন, দেখুন আমার আত্মীয়-স্বজন এখানে কেউ নেই। এখানে বাড়ী ঘরদোরও নেই। আমি থাকি পরের বাড়ী। এখন আমার বিয়ে করা সাজে না।

রায়মশাই বললেন, বাড়ীর জন্যে ভাবতে হবে না মাস্টারমশাই। আমার একটা বাড়ী তো অমনি অমনি পড়ে রয়েছে। উঠবেন সেখানে গিয়ে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, আপনি আমায় নয় আজ থাকতে দিলেন, নয় ধরুন কাল থাকতে দিলেন ; কিন্তু চিরকাল কি আশ্রয় পাব?

রায়মশাই বললেন, আশ্রয় দেওয়া কার সাধ্যি বলুন মাস্টার মশাই? আপনি নয় এক কাজ করতে পারেন, মাসে মাসে কিছু ভাড়া দেবেন, তা হলেই হবে। যতদিন বাড়ী থাকবে, যতদিন আপনি এখানে থাকবেন ততদিন আপনি ওখানে বাস করবেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, শুধু তাই নয়, আমার বিয়ে দেবেই বা কারা?

রায়মশাই বললেন, তার জন্যে ভাববেন না। আমার বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে আপনার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনি কেবল সাতপাক ঘুরে আসবেন, ব্যস্ ; মানে গরীবের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হওয়া।

অগত্যা মাস্টার মশাইকে বাধ্য হয়ে বিয়ের জন্য রাজী হতে হল। তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঊষাকে দেখে এলেন। সেই প্রথম দেখাতেই তাঁদের বিয়ের কথা পাকা-পাকি হয়ে গেল। তিনি ঊষাকে তাঁর নিজের হাতের নামলেখা আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে এলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। মেয়েরা উলু দিল।

হেডমাস্টার মশাই আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এলেন গম্ভীর-ভাবে। ইস্টিশানের সেই প্রশান্তবাবু আর নেই। কারুর মুখে কোন কথা নেই। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায়। তিনি আমাদের একখানা বই নিয়ে বললেন, তোমাদের কি পদ্য পড়া হয়েছে?

আমি বললুম, We are Seven, Lucy Gray, The blind boy...।

তিনি বললেন, We are Seven হয়েছে? কার লেখা বল দিকি?

সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর।

তিনি বললেন, একজন একজন করে উত্তর দাও। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে তোমরা কে কি জান?

কারুর মুখে কোন কথা সরল না। তিনি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি বল দিকি?

আমি বললুম, তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির প্রাণ আছে।

তিনি বললেন, বেশ, বেশ। বল তো এই জায়গাটার মানে কি?

"How many you are, then" said I
"If they two are in Heaven?"
Quick was the little maid's reply
"O Master! We are seven."

অনেকেই তাঁর কথার মানে করে গেল। তিনি তখন বললেন, কেউ আর কিছু জান?

কেউ আর উত্তর করতে পারল না। আমি বললুম, ঐ মানে আমরা শিখেছি।

তিনি শুধু হাসলেন, বললেন, তোমাদের মানে ঠিকই হয়েছে। ওর আর একটা বিশেষ অর্থ আছে।

আমরা সকলে অবাক হয়ে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলুম। তখন তিনি আমাদের বললেন, আত্মার অমরত্বের কথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলুম। সে ব্যাখ্যা এখনও আমার বেশ মনে আছে। শেষে তিনি বললেন, তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে?

আমি উঠে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, ওঃ, তোমার সঙ্গেই না সেদিন দেখা হয়েছিল? তোমার নাম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, না?

বললুম, হ্যাঁ।

এর পর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর হয়ে উঠল। তিনি প্রায়ই আমায় ছুটির পর অপিস ঘরে নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর বই পড়তে দিতেন। যে জায়গাটা বুঝতে পারতুম না, সেটা কত রকমে কতবার বুঝিয়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়। পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারদিক গভীরভাবে দেখা। জান, নিউটন কি করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, কি করে গ্যাল্‌ভানি ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছিলেন, স্নান করতে করতে আর্কিমেডিস্‌ হায়ড্রোস্‌ট্যাটিকসের কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন? আমাদের চারপাশে এমন অনেক জিনিস ঘটছে যা আমরা দেখছি শুধু সাদা চোখে, তার সেই পর্দা সরিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারছি না। বড় হতে হলে চোখ চাই—সব জিনিস বুঝে দেখবার চোখ।

আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বলতেন, দেশ তোমাদের কাছে কিছু চায়। তোমরা দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে!

আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম।

যে মাস্টার মশায়ের বিয়ে করবার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, আশীর্বাদের পর তাঁর মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। অজস্র পয়সা খরচ করে তিনি বিরাট আয়োজন করতে লাগলেন। সারা গ্রামে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আমাদের স্কুল চারদিনের জন্য বন্ধ রইল। কলকাতা থেকে গায়েহলুদের আগের দিন জিনিসপত্র কিনে আনা হল। কনের জন্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ী এল। বিখ্যাত জুয়েলারের দোকান থেকে গহনা এল। তারপর দুরান্তর কাঁপিয়ে সানাই বেজে উঠতে লাগল।

গায়েহলুদ দেখে সকলে তো অবাক হয়ে গেল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। পাশের গ্রামের হেমন্ত হাজরা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছে বর

নিয়ে যাওয়া হবে বলে। সারাদিন ধরে ফুল দিয়ে সেই মোটর সাজান হচ্ছে। আমাদের মন আনন্দে ভরে গেছে। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে আমরা তর্ক করছি বরযাত্রী বড় না কনেযাত্রী বড়—এমন সময়ে দেখি স্কুলের সেক্রেটারী মশাই একজন বেঁটেমত কালো ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আমায় বললেন, তোর বাবাকে ডেকে দে দিকি!

তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত। আমি বাবাকে ডেকে দিলুম। সেক্রেটারী বললেন, শুনে যান গোষ্টবাবু, এই ভদ্রলোক কি বলছেন!

বাবা বললেন, কি কি!

সেক্রেটারী বললেন, এদিকে আসুন। সতীশবাবুর মুখেই ব্যাপারটা শুনবেন।

সতীশবাবু ওরফে সেই কালোমত ভদ্রলোকটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরা ফিস্ ফিস্ করে কি সব বললেন। বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তখনই কাকাকে ডাকা হল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বাড়ীর ভেতর মেয়েরা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক নিরানন্দে ভরে গেল—সারাগৃহে বিষণ্ণতার ছায়া। সেক্রেটারী মশায় যাবার সময় বলে গেলেন, একেই বলে কলিকাল। নইলে বলুন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না? আজকাল মানুষ চেনা দায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার এ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাবের মেম্বাররা এসে দারুণ হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বলল, শাস্তি চাই। আমরা কি সব মরে গেছি? গাঁয়ের মধ্যে একজন এসে যে এই কেলেঙ্কারি করবে তা আমরা কখনই সহ্য করব না। আজ ওর হাড় গুঁড়িয়েই ছেড়ে দেব।

সেক্রেটারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না না, তোমাদের অত কিছু করতে হবে না। ভদ্রলোকের যা অপমান হবার খুবই হয়েছে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তো বুঝতে পারবে। কালই সমস্ত কাজ বুঝে দূর করে দেব গাঁ থেকে। তোমরা এই গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা কর।

তাঁরা সকলে চলে গেলে শুনলুম, হেডমাস্টারকে নিয়েই নাকি এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তিনি নাকি বিধবার ছেলে। ঐ সতীশবাবু হচ্ছেন তাঁর কাকা। আমার কাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ভাগ্য। তা নইলে অমন সোনার টুকরো ছেলের কিনা এই বিচ্ছিরি দোষ?

ঊষার বহু কষ্টে বিয়ে হল সেই গোধূলি লগ্নেই এই গাঁয়ের মতি বাঁড়ুয্যের ছেলে কিরণের সঙ্গে। কিরণ তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। যাই হোক, বিয়েতে আমি আনন্দ পাই নি একটুও, এমন কি বিয়েও কখনও এমন বিষণ্ণতার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর তো আমি শুনি নি। কোন প্রকারে সাত পাক ঘুরে মালাবদল করা আর নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ করা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। চুপ করে বাড়ী বসে থাকতে আর ভাল লাগল না। আস্তে আস্তে ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে গেলুম।

সন্ধ্যা হয়েছে। দূরের জিনিস ভাল রকম দেখা যায় না। একটা নারকেল গাছের মাথাটা কাঁপছে, তার পাশ দিয়ে উজ্জ্বল শুকতারাটি দেখা গেল। ইস্টিশানে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। গাড়ী আসছে। ফ্ল্যাগ ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিন হলে হয়তো ছুটে গিয়ে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতুম—সেটা হয়তো খটাখট খটাখট করে চলে যেত; কিন্তু আজ আমার পা যেন উঠতে চাইছে না। ধীরে ধীরে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলেছি এমন সময়ে দেখি হেডমাস্টার মশাই ঠিক আমার সামনে। তাঁর হাতে

একটা স্যুটকেস, পেছনে চাকরের মাথায় অন্যান্য জিনিসপত্র। তিনি আমার কাছে এলেন, বললেন, এখানে কি করছ নির্মল? বাড়ী যাও, ঠান্ডা লাগবে।

তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। মনে হল এবার বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। নিঃশব্দে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। তিনি আমার পিঠটা বার দুয়েক চাপড়ে সহাস্যে বললেন, বেশ...বেশ...বেশ।

আমি অতি কষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তাঁর চোখ চকচক করছে যেন!

নিকটেই ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। তিনি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় বললেন, বেশীক্ষণ আর এখানে থেকো না, বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে।

মাত্র মিনিট কয়েক ট্রেনখানা থামল। তার মধ্যেই ওঠানামা শেষ হয়ে গেল। আবার সেই দুরন্ত ট্রেন হু হু করে ছুটে চলল। মাথার ওপর দিয়ে ডানার ঝটাপটি করতে করতে একটা পেঁচা উড়ে গেল। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।

তিরোলের বালা

মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন।

গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে নি, এ নিয়ে গাড়ীর লোকজনের নানা রকম মতামত চলেছে।

—মশাই বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ী ছাড়বার নামটি নেই—কখন বাড়ী পেঁছিব ভাবুন তো?

—এদের কান্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইস্টিশানে দুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্।

—ঐ আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়ীরই সমান দশা—

—আঃ, কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ী করে! রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ী করি, কোথায় বাড়ী করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ী করতে—

—সে কোথায় মশাই?

—এই প্রসাদপুর, যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হলে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশী না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগন্ডা হবে, পাড়াগাঁ জায়গা, শ্বশুরবাড়ীর সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী করলুম, দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে। এই স্টুপিড গাড়ীগুলো—

—পঁচিশ কি স্যর, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন। আমারও পৈতৃক বাড়ী ঐ প্রসাদপুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙ্গা। লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্তা শুনে ভয় হলো। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসীমা থাকেন, মেসোমশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসীমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে, তাতে কখন সেখানে পেঁছিব কে জানে?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসে ছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথার চুলগুলো যেন একটু হেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাইরের

দিকে চেয়ে ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ী ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁটুলিহাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনা-সামনি বেঞ্চিতে মুখো-মুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ ভেদ করে—টু হার্টস! নো ট্রাম্প! থ্রি স্পেডস!

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাইবোন? কিংবা মামা-ভাগ্নী? মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য নয়। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড তো?

যাকগে, আমার সে-সব ভাবনার দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এলো। মাসীমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন আঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। তারপর ছাড়ল। বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে ক্বচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউলতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙ্গে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো বাদুড় উঠে এসে বসেছে, খালের পারে মশাল জেলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু দুজনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে! বেশ সুন্দর চেহারা দুজনেরই। না, মামা-ভাগ্নী বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা? মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখীন পোশাক-পরা তরুণ-তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক গে, আমার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়াসাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাঢ়দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশী। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসীমা কিছু টাকার দরকার বলে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছে। ধনেপ্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে!

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—চাপাডাঙ্গা ইস্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন স্যার?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ার?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকোও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোনো কথা না বলে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হলো, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি না ওরা কোথায় যাবে। কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্তার ভরসা না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, স্যার, ওপারে গাড়ী পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ীর কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ী—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাড়ী!

লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত করে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদূর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা, রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবার ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন স্যার?

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়।

যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে বললে—যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

তবে ইলোপমেণ্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে!

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন।

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

—অনেক দূর থেকে স্যার, ধানবাদের কাছে সয়ালডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন? ঐ মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে!

চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপর দিকে কেমন একটু বাঁকান, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়ী ভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙ্গাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের, বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব

কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙ্গাতে কোন লোকের বাড়ী আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব?

—না স্যার, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তা হলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে থাবে না পর্যন্ত। যে-কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে— সে-ভরসা করি নে স্যার—ওর সে মূর্তি দেখলে আমি ওর দাদা, আমি পর্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরনের হবে আর একটু পরে।

চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়ীঘর বেশী নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশ পান-বিড়ি, মুড়ি-মুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ওপারে দু-একখানা চাষাভুষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দুতিনখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্যন্ত তারা যায়, নদী পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ীর —তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়তো ইস্টিশানেই থাকবেন রাতে!

—না স্যার, কাল অমাবস্যা, আমায় তিরোল পৌঁছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগ্‌গির হয় পৌঁছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি করে এই অন্ধকার রাত্রে? তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। তিরোলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ী পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, ভয়ভীত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে আমরা তিনজন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্ততঃ আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে!

বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বলে—না, গায়ে দেবার কিছু—ধরুন এ বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়ীতে বসেছিলাম—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে দামোদর? আমি জানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী কি না? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ার নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাবে না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবে কেন? চুপ করে বসে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ীঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবুমশাইরা, শামকুড়ের গোয়ালপাড়ায় গরুর গাড়ী পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন—

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলু-চচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিলে।

বললে—দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা?

পূর্ণিমা বললে—বর্ধমান থেকে কেনা, আসবার সময়ে। খারাপ হয় নি? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা, ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকাতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে খাবার খাব এভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন বাড়ীতে মা-বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল।

কিন্তু পরবর্তী মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয়, সেদিন তাদের সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তাহ'লে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর-গাড়ী নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হ'ল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য করে আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তার পরিশ্রমের জন্যে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ী থেকে তামাকের টিনটা নেওয়া হয় নি—গাড়ী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশী দেরী হবে না বাবু—

শামকুড় গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন, লোকের বাড়ী-ঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূরে হবে?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পূবদিকে প্রায় দু' ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো!

—কি আর কষ্ট?.....আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মাসীমার বাড়ী গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে —কি আর কষ্ট? না? আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোন দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হলে এ ধরনের হাসত না, অন্ততঃ এ জায়গায় ও এ অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি? আমার ভয় হ'ল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো? আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয়?

গাড়ীতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ী আপনমনে চলেছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অন্ধকার, আমার মনে হ'ল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কষ্টকর 'আঃ' শব্দ আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে, আর ওরা বসেছে গাড়ীর পেছন দিকটায়, সেদিকে বেশী অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা।

আমি কোন কথা বলবার পূর্বেই যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ীর গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত কণ্ঠে 'উহু-হু-হু' বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণে গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু? কি হয়েছে?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোন কিছু বাধা দেবার পূর্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ীর সামনের দিকে গিয়ে পেঁছিল এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নামাবার পূর্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দু-জনেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তা কোন দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোল যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিন-জনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণ ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু শীগ্‌গির চলুন, কাছেই পাঁতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপকলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা যে যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে, সে-কথা দুজনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পেঁছিলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় কষার ঝাড়। তন্ন তন্ন করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে।

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে—আর কোন দিকে জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না, বাবু, কাছেপিঠে আর জলা নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দুজন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যতদূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশীও হয়ত। তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হ'ল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে-লোকটা বললে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়ীতে বসে। আমি বাবু গোয়ালঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্দের একটু পরেই—দেখি গোয়ালঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রীলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু, ইকি! তারপর বাড়ীর লোক এসে পড়ল। তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়ীতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের একি কষ্ট! চলুন গরীবের বাড়ী। দুটো ডাল-ভাত রান্না করে খান। দিদিঠাকরুণের মাথাটা ভাল যদি হ'ত একটু তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষ্মীর পিরতিমে। আমাদের বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা করে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়ীতে তিরোল পেঁছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ী গিয়ে পেঁছলাম।

বাড়ীটার কথা এখানে একটু ভাল ক'রে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্তী

ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল চলে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে। তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়ীটা ও-দেশের চলনমত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় এক-খানা বৈঠকখানা, তার দুই কামরা, মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠানি—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরের উঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধারা—জাতিতে কৈবর্ত। সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না। রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসব্জী ছ'জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রান্না করলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্তি ধরেছে। তার কথাবার্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানারকম কথাবার্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লাম—সকলের সঙ্গে আলাপ হল, পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, নাকি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হ'ল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ী কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল।

তার পর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি? আমি বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা!

বলেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? বড় কষ্ট হ'ল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরনের দু-একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে—আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম। আমাদের সয়লাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা—

—বেশ, যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

—এই পূজোর সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পূজো হয়, একখানা কলিয়ারীর বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়—

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন—সাঁওতালের নাচ সে একটা

দেখবার জিনিস, আসুন পূজার সময়—ভারী খুশী হব আমরা আপনি এলে।

পূর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তাহলে কথা রইল কিন্তু দাদা। বোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বললে—আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পূর্ণিমা বললে—তা হলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকী—ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না।

পূর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধঘণ্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারি বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম, নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি, এমন সময় আমার মনে হ'ল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পূর্ণিমার দাদার নাক ডাকার শব্দ। অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে—যেন গোঙানি বা কাৎরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ শুনতে পেলুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরার দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ীর লোকও না! আরও আধঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এ'রা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তার পরে সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তুরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিজ্ঞেস করলে—এ'রা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো! গরমে সারারাতে ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন-টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলাম কিন্তু একবার দেখাটা দরকার। ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল—ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে একখানা চৌকি পাতা, পূর্ণিমার

দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেঝেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চীৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারিধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না। মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙ্গে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ী ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কান্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোরে নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো—পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিশ এল—আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হ'ল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন করে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছানা। উন্মত্ততায় ঘুম সহজে ভাঙে নি তাই রক্ষে—দুপুর পর্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমুল। পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হলো।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্যন্ত।...

সয়লাডি কলিয়ারীতে টেলিগ্রাম করা হলো। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথম শুনলুম, পূর্ণিমা বিবাহিতা। পাগল বলে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই তাও এই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হলো। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্যভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুণ ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ী নিয়ে যেতে রাজি নন। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হলো হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাডিতে আসবেন কিন্তু একদিন। মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা? দাদাকে দেখছি নে। দাদার কাছে কানের

চুল দুটো খোলা রয়েছে, কান বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগের কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ানো, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এত দিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম-ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।

প্রাবল্য

কথাটি শুনিয়া মন খারাপ হইয়া গেল। পাশের ঘরের বধূটির মেয়ের নাকি ভারী অসুখ। দিন দশ ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দুর্ভাবনার ছায়া-পাতে ম্লান হইয়াছে। তাহার অনর্গল কলকণ্ঠ ক্ষান্ত হইয়াছে। সে প্রভাত হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত কত অসংখ্য গল্প করিত—হাসিয়া হাসিয়া খুন হইত। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া আমাদের নিঃসন্তান সংসার-জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

রমার বয়স বেশী নয়, বড়জোর বছর একুশ হইবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে রীতি-মত পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায় এবং কর্মে সর্বত্র সেই আভাস পাওয়া যায়। রবিবার দাড়ি কামাইলে নাকি শরীরের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, বৃহস্পতিবারে আমিষ ভক্ষণ করিলে কোন্ এক দুষ্ট দেবতার কোপে পড়িতে হয় ইত্যাদি অগণিত বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিজেকে বদ্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে সে দিন গুনিয়া যাইতেছিল। তিন প্রাণীর সমবায়ে তাহার ক্ষুদ্র সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে...তাহার কর্মব্যস্ত স্বামী ...ও স্বর্গের পরীর মত ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। এখনও তাহার ঠিকমত কথা ফুটে নাই। বয়স অতি অল্প বলিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতে থাকে। কারণে অকারণে রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি কাঁপাইয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার নামকরণ করিয়াছে 'কমলা', কিন্তু সচরাচর ডাকে 'কমলি' বলিয়া।

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সে কমলাকে বড় ভালবাসে। অষ্টপ্রহর তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া দেয়। তাহাকে খাওয়ানো, স্নান করানো সমস্ত খুঁটিনাটি ভার আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। সারাদিন সে আমাদের ঘরেই থাকে। রাত্রে তাহার মা আসিয়া ডাকে, কমলি কোথায় দিদি?

স্ত্রী কহিল, ঘুমুচ্ছে ভাই।

রমা বলিল, রাতেও রেখে দেবে নাকি?

স্ত্রী কহিল, থাকতো যদি তো রাখতুম ; কিন্তু ভাই, রাতদুপুরে মার জন্যে যদি কাঁদে!

রমা কহিল, অত আস্কারা দিও না দিদি।

স্ত্রী কহিল, আস্কারা নয় ভাই, আস্কারা নয়। তুমি ছেলেমানুষ, ছেলে মানুষ করার কি জান?

রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি মিথ্যুক গো তুমি! ছেলে মানুষ করার

সব কিছু তোমার জানা আছে বুঝি? না জানি পেটের পাঁচটা হলে কি দেমাকই না হত।

স্ত্রীর মুখ মুহূর্তের জন্য পাংশু হইল। তাহার বক্ষ দলিয়া পিষিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইল। রহস্যের ছলে কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া আর একজনকে যে এরূপভাবে আঘাত করিতে পারে, রমা হয়ত তাহা জানিত না। ঐ শব্দগুলি জোড়া দিয়া একটি যে বিশ্রী শ্রুতিকটু বাক্যের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা রমার অবিদিত ছিল। সে অপ্রস্তুতে পড়িল। আমার স্ত্রীর হাতদুখানি চাপিয়া ধরিয়া করুণ সুরে মিনতি করিল, রাগ করলে দিদি? আমি না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি।

রমার কাতর মুখ দেখিয়া স্ত্রীর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইল। সে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আনিয়া কহিল, ওমা! কি এমন মন্দ কথা বলেছ ভাই? ও আমার বরাত। তবে কি জান, মেয়েটা আমায় একেবারে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে!

রমা কহিল, ওর মা যে কে তাই ও ভাল করে বুঝতে পারে না। আর জন্মে তুমি ওর মা ছিলে নিশ্চয়।

স্ত্রী কহিল, মাইরি বলছি, বিচ্ছেদ যদি আমাদের মধ্যে কখনও হয় তো তোমার আমার সঙ্গেই হবে। কমলি যেন তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। ও যেখানে খুশী থাকবে।

রমা হাসিতে লাগিল, বলিল, এখন থেকে অত ভাবনা নেই তোমার দিদি। দেখে নিও, ও ঠিক তোমার কাছেই থাকবে।

স্ত্রী কহিল, ওকে দু'দণ্ড না দেখতে পেলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে।

আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী কিসের জোরে কমলিকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল। কেমন করিয়া দিনে দিনে পলে পলে তাহার ঊষর বাৎসল্যবর্জিত জীবনমরুতে স্নেহপ্রেমের বিরাট মহীরুহ সৃষ্ট হইল? কেমন করিয়া তাহার নিষ্ফল হৃদয় নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একজন অচেনাকে দুহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল! সত্য কথা বলিতে কি, আমার স্ত্রী কমলিকে তাহার জননীর চেয়ে বেশী ভাল-বাসিত বলিয়া বোধ হইত।

একদিন স্ত্রী কমলিকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াতেছিল। তাহার মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরিয়া কহিল, তুই দিন দিন ভারী দুষ্টু হচ্ছিস বাপু। বসে দুধ খেতে শিখবি কবে?

আমি কহিলাম, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

স্ত্রী আমার প্রতি একটি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তুমি থাম দিকিন। দেখছিস তো কমলি, তোর জন্য লোকের পাঁচশো কথা শুনতে হয়। দাও দিকি গামছাটা, মুখ হাত পা মুছিয়ে দেব।

গামছা দিয়া কহিলাম, অতটা ভাল নয় সরো।

সরো অর্থাৎ সরোজিনী, আমার স্ত্রী। কহিল, মানে?

মরীয়া হইয়া বলিলাম, যাই হোক, পর ভিন্ন তো আর কিছু নয়।

আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তাহার অবকাশও পাইলাম না। স্ত্রী তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিল, তোমার ঐ এক সৃষ্টিছাড়া কথা! দেখ, ও অলক্ষুণে কথা আমায় কখনও বলো না। আমার কমলি-মাকে তুমি পর ভাবতে পার, কিন্তু আমি পারি না। মরে গেলেও পারব না। কমলি, তুই আমায় পর ভাবিস?

কমলি নেহাৎ ছেলেমানুষ। সংসারের এই সব তীক্ষ্ণ বাক্যের অর্থ জানিত না। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, ধ্যেৎ!

সুতরাং আমার একটিও কথা কথা বলিবার রহিল না।

কমলাকে মধ্যস্থ করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে মাঝে মাঝে কলহ হইত। আজ তাহার খেলনা চাই—কাল তাহার পোষাক চাই—তার পরদিন জরির জুতো চাই। এই

অসংখ্য অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে করিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। আমি মানুষ—অমন নিঃস্বার্থভাবে জানিয়া শুনিয়া পরের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজী নই। স্ত্রী কহিত, তোমার হাত দিয়ে যদি জল গলে!

আমি কহিলাম, যেন জন্মে জন্মে না গলে।

স্ত্রী কহিল, ছিঃ, ছিঃ! লোকে বলবে কি?

কহিলাম, জান, বেচারা কাক কোকিলের ডিমে তা দেয়!

আসলে আমি কমলিকে আদৌ সুনজরে দেখিতাম না।

এহেন কমলির নাকি অসুখ—অসুখ নাকি সহজ নয়, কারণ ডাক্তার পর্যন্ত মুখ ঘুরাইয়া গিয়াছে। তাহাকে নাকি আরও আগে দেখানো উচিত ছিল। আমি আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, বল কি? আগে তো শুনি নি!

বিশুষ্ক মুখে স্ত্রী কহিল, মা আবাগী কি বলেছে সে কথা?

আমি কহিলাম, বড়ই দুঃসংবাদ।

স্ত্রী যুক্তহস্ত ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, মা মঙ্গলচণ্ডী! তুমি আমার বাছাকে ভাল করে দাও মা!

ব্যস্তভাবে বাজারের থলি খুঁজিতে খুঁজিতে কহিলাম, বাজার থেকে আজ কি আসবে বল তো?

স্ত্রী কহিল, আজ আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং দুটো চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে আজ আপিস যাও।

কহিলাম, আর তুমি?

স্ত্রী কহিল, আমার কথা আমি ভাবব।

অগত্যা ফলার খাইয়া সেদিন যথাসময়ে আপিসে হাজির হইলাম। যাহা হউক, সেখানে তো আর স্নেহমমতার বালাই নাই—সেখানে স্ত্রীর ন্যায় আব্দার খাটিবে না। আত্মীয়স্বজনহীন, শূন্য প্রাণহীন, কর্মমুখর আপিস।

কমলির অসুখ আঁকাবাঁকা পথে মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলিল। আমার স্ত্রীর মন সংসারে আর বসিল না কিছুতেই। ভাত গলে না কিংবা গলিয়া যায় অত্যন্ত; তরকারিতে ঝাল বেশী হয় কিংবা ঝালই হয় না; হয়ত নুন বেশী হয় কিংবা আদৌ হয় না। স্ত্রীর তো ঠিকমত খাওয়াই হয় না। প্রাণধারণের জন্য ঐ যা দুবেলা দুটো দাঁতে কাটা। রাত্রি-দিন সে অক্লান্তভাবে কমলির সেবা করিতে লাগিল। আমি একদিন কহিলাম, শেষকালে তুমিও কি পড়বে!

স্ত্রী উদাস কণ্ঠে কহিল, জানি না।

বলিলাম, জানি না নয়। অমনি করে মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, কি পাষাণ গো তুমি!

সুতরাং সেইখানেই সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

সেদিন রবিবার।

বিকালবেলা স্ত্রী কহিল, আমি উনুনে আগুন দিচ্ছি। কোথাও যেও না যেন। সকাল সকাল আজ খেয়ে নাও।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে সে কহিল, কি জানি, আজ যেন মেয়েটাকে ভাল বুঝছি না। সত্যি আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে। কোন কাজ আর ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যার পরই খাইতে বসিলাম। অর্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে পাশের ঘরে

রমা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে কমলারে, তুই কোথায় গেলি রে?

সেই বিচ্ছেদবেদনাবিধুর ক্রন্দন-শব্দে আকাশ বাতাস রী-রী করিয়া উঠিল। স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে ভাতের থালা পড়িয়া গেল। সে জড়িত-কণ্ঠে কহিল, পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।

আমি স্ত্রীর কথা পালন করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্ত্রী কহিল, ওকি, খেলে না যে বড়?

বলিলাম, পাষাণ গলে গেছে।

স্ত্রী নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল। পরক্ষণেই মিলিত কণ্ঠে দুইজনে ঘোর রবে দিকে দিকে মৃত্যুর বার্তা পৌঁছাইয়া দিল। রমার স্বামী সমস্ত পুরুষত্ব খোয়াইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বার বার ডুকরাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আমি হেন নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও চক্ষু যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কমলি এ মরজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সহস্র ব্যাকুল আহ্বানেও সে ফিরিয়া আসিবে না। এ কথা স্মরণ করিতে কোথা হইতে এক অনির্দেশ্য উদ্বেল বায়ু কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথ বহিয়া আসিয়া মধ্যপথ হইতে কেন জানি ফিরিয়া গেল। আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলাম—কখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, সমস্ত কর্তব্যভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি না করিলে কমলির সৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। কমলির বাপের নিকট গিয়া বলিলাম, রবীনবাবু, আপনি একটু স্থির হোন।

স্থির হওয়া তো দূরের কথা, রবীনবাবু বালকের ন্যায় আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আকুল হইয়া উঠিল, কি হবে দাদা!

প্রবোধ দিলাম, আঃ! আপনার এত বিচলিত হলে চলবে কেন? আপনি পুরুষ-মানুষ। জানেন তো ভগবান বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।'

কথাটা নিজের কানেই যেন বিঁধিতে লাগিল। আমার কথায় কোন কাজ হইল না। রবীনবাবু বিন্দুমাত্র তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

সুতরাং আমি লোক-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম। নয়টার সময় ফিরিয়া সেই এক-টানা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই সুর করিয়া করিয়া পরপারবর্তী বধির যাত্রীর নিকট অসংখ্য অভিযোগ। দেখিলাম, ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীর গলা ভাঙিয়া গিয়াছে। সে মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, ওরে কমলিরে, পর বলে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয় রে?

আর রমা? তাহাকে দেখিয়া অবাক হইলাম। সে কমলির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃতপ্রায় হইয়াছে—তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া রাঙা হইয়া গিয়াছে—পিঠের উপর জমকালো চুলগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী কহিল, বাছার একখানা ফটো তুলে রাখ গো। তা না হলে আমি কখনো বাঁচব না।

সুতরাং একখানি ফটো তোলা হইল। সেই নিমীলিত চক্ষু, বিবর্ণ মুখের বীভৎস ছবি। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, ঐটুকু মেয়ের আবার ফটো তোলা কেন?

স্ত্রী মেঝের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সুর সপ্তমে চড়াইয়া কাঁদিল, ওরে কমলি রে, তুই কেন অভিমান করে চলে গেলি রে?

কঠিন মেঝের আঘাতে কোমল কপাল ফুলিয়া উঠিল। তাহার সেই অশ্রান্ত ক্রন্দন, সেই আর্তনাদ যেন মর্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া অন্তহীন ইথার-সমুদ্র বাহিয়া স্বর্গের রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করিয়া ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমরা নিষ্ঠুরের ন্যায় নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে লাগিলাম। রমার বুক হইতে তাহার প্রাণের পুত্তলীকে দুর্জয় বিক্রমে ছিনাইয়া লইলাম। নিশ্চেতন রমার শরীর স্পন্দিত হইল। সে কাতরে

ভাগর রাঙা চোখদুটি তুলিয়া মিনতি করিল, না—না—না। আমি যেতে দেব না।

মুহূর্তের জন্য আমার হাত অবশ হইল, সমস্ত কর্মশক্তি শিথিল হইল। ভবতারণ কহিল, সব মাটি করে ফেলছ খুড়ো। পুরুষমানুষের অত কোমল হলে চলে না। সরো দিকিন।

রমা 'মাগো' বলিয়া মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পা আঁকড়াইয়া ধরিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সোনামানিককে আমার? আমি প্রাণ থাকতে যেতে দেব না। তার আগে আমার মরণ হোক গে।

তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অবকাশও আর ছিল না।

সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। হাঁ, মার চেয়ে মেয়েটাকে বেশী ভালবাসত সরোজিনী—আমার সহধর্মিণী। আঘাতটা নাকি তাহাকেই বেশী করিয়া হানা দিয়াছে।

সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া সরোজিনী একটানা সুরে শোক করিয়া চলিল। মুখে তাহার খাদ্য রুচিল না...রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হইল...মধ্যাহ্নে সাংসারিক কর্মে অবহেলা করিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ফটোখানি বুকে চাপিয়া কমলিকে কতরূপে কত ছলে এই ধরাতলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ক্লান্তিহীন শোকের গভীরতা দেখিয়া আমারই ভাবনা হইল। একদিন বলিলাম, সরো, তুমি একটা কথা শোন।

সে অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, কি?

বলিলাম, নিজেকে তোমায় বাঁচতে হবে। বল, এমনি করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করলে কি কমলি ফিরে আসবে? না আসতে পারে?

সরোজিনী অসহায়ের মত হতাশ সুরে বিষণ্ণভাবে বলিল, সত্যি আর সে আসবে না?

বলিলাম, পাগল! কখনো কি কেউ এসেছে? তুমি জেনেশুনে এমন ছেলেমানুষের মত কাজ কর। লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন, দুটি খেয়ে নাও, কথার অবাধ্য হয়ো না।

কত সাধ্য-সাধনা করিলাম। আশপাশের কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া অজস্র সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন স্ত্রী বহুকষ্টে জীবনধারণের জন্যই যা দুটি অন্ন মুখে দিল। সরোজিনীর শোকাতিশয্যে সকলেই রমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার যে বত্রিশ নাড়ী মোচড়াইয়া অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা কোনরূপ প্রলেপেই আরোগ্য হইতে পারে না—তাহা ভাবিবার আমাদের ফুরসৎ ছিল না।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পর একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া আমি স্ত্রীর পানে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহার মুখ দুর্ভাবনায় শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া বসিতেই বলিল, একটা কথা বলি শোন। হেসে উড়িয়ে দিও না।

বলিলাম, কি কথা শুনি?

সরোজিনী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, আর একটা বাড়ী দেখ, এ বাড়ীতে আর এক-দন্ডও থাকতে পারব না, মাইরি বলছি।

কথাটি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। বাড়ী-বদল সহজ ব্যাপার নয় কোন মতেই। পাঁচ বৎসর নির্বিঘ্নে অনড় অবস্থায় এইখানে রমাদের সন্নিকটে দুটি পরিবারের স্নেহবন্ধনে দিনযাপন করিতেছিলাম। আজ অকস্মাৎ সেই সুগঠিত পরিপাটী নীড় ভাঙ্গিবার আদেশ হইল। দুর্বাসার অভিশাপ বোধ হয় এ আদেশের সহিত তুলনীয় হয় না! বিচলিত চিত্তে কহিলাম, অপরাধ?

স্ত্রী তখন বিশদভাবে অপরাধ ব্যাখ্যা করিল। সে এক অভিনব অপরাধ। কেন জানি না, রমা কমলির ব্যবহৃত বিছানাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিছানার উপর শুইয়া কমলি নাকি নিশ্চিন্ত আরামে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সরোজিনী তাহা স্বচক্ষে

দেখিয়াছে। এমন কি ফটোতে পর্যন্ত তাহার ছবি উঠিয়াছে। রমা সেই বিছানাগুলি প্রতিদিন নাড়িয়া-চাড়িয়া কারণে অকারণে কাঁদিতে থাকে। সেগুলিকে সযত্নে পবিত্রভাবে বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী কহিল, সত্যি বাপু, ও আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। ছিষ্টি রি-রি কচ্ছে। একটু বাছ-বিচার নেই। আমার ঠাকুর ঘুয়েছে, দেবতা রয়েছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজই তুমি বাড়ী ঠিক করে এস।

কথাটি শুনিতে বা বলিতে খুব সহজ। কহিলাম, রমারা কি মনে করবে সরো?

সরোজিনী বলিল, তাই বলে তো আমি ইহপরকাল খোয়াতে পারি না। জেনেশুনে পাপ করি কি করে বল।

বলিলাম, কমলিকে তুমি না রমার চেয়ে বেশী ভালবাস? আড়াই টাকা দিয়ে তো ফটো তুললে!

সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ওগো দোহাই তোমার, আর দগ্ধে মেরো না। এই নাও কমলির ফটো। বেঁচে থাকতে তো একদিনও বাছাকে আমার একটুও ভালবাস নি। মরে গিয়েও তার রেহাই নেই।

কথার শেষে সে কমলির ফটোখানি নিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাতাসে ভর করিয়া সেই ফটো দূরে উড়িয়া গেল।

অগত্যা আমায় সে বাড়ী অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। রমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। জানিয়া শুনিয়া তো আর পাপ করিতে পারি না। আচার-বিচার আগে, না আগে ভালবাসা!

আশ্চর্য মানুষ!

বাঁশি

আজও আবার সেই ভাঙ্গা বাঁশিটা লইয়া গোল বাধিল। বহুদিনের একটা পুরাতন বিবর্ণ পিতলের বাঁশি। মুখের দিকটা খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ছিদ্রগুলি আর নিখুঁত হইয়াও নাই, আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় ফেলিয়া দিলেই হয়। এমন একটা পুরানো বাঁশি ছোট বউ কেন এমন আঁকড়াইয়া থাকে, একথা বহুবার ভাবিয়াও সুলেখার শাশুড়ী কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। প্রায়ই এই বাঁশিটা লইয়া গোল বাধে। আর লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলেটাও যদি কথা শোনে—না, ঐ বাঁশিটাই তার চাই।

আজও গোল বাধিল। সুলেখা অনেক যত্নে, টুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেক কষ্টে বাঁশিটাকে খুব উঁচুতে তুলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। খোকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং ঘরের মেঝেতে বসিয়া অবাধ্য কাঠের ঘোড়াকে তাহা দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল কিছু বলিবে না। কিন্তু কেমন একটা তীব্র বেদনা তাহার সমস্ত মনের গহনে ম্লান হইয়া উঠিল। নিকটে এবং দূরে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে কিসের এক কল্যাণময় সুর যেন শ্রান্ত গতিতে বাজিতে লাগিল। করুণ সুর কিন্তু সজীব।

সুলেখা খোকার নিকট আগাইয়া গেল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিল—তোকে একটা নূতন বাঁশি এনে দেব...

খোকা জবাব দিল না। ঘোড়া কিছুতেই চলিতেছে না, তাহা লইয়া সে ব্যস্ত। সে ঘোড়ার উপর কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিল—চল ঘোড়া। চল, হ্যাট—

সুলেখা বলিল—লক্ষ্মীটি! দে।

মুখ ফুলাইয়া খোকা বলিল—না। এবং এই 'না' বহু চেষ্টায়ও 'হাঁ'তে পরিণত হইল

না। বাঁশির এই অযত্ন সুলেখা সহিতে পারে না...

হাত হইতে বাঁশিটা টানিয়া লইল—তোকে পয়সা দেব। দে।

খোকা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু সুলেখারও যেন আজ কি রকম এক রোক চাপিয়া গিয়াছেঃ বাঁশি তার চাই, চাই-ই। সে খোকার গালে অকস্মাৎ রাগের বশে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় মারিয়া বলিল, হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, কথা শোনে না। কী হবে তোর এ ভাঙ্গা বাঁশি নিয়ে? সেদিন কিনে দিলাম—সেটায় হবে না, এটা চাই। লক্ষ্মীছাড়া!

বলিয়া সুলেখা খোকার পিঠে আরও কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া মা আসিলেন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এই নিত্যনৈমিত্তিক উপভোগ্য ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

পিসী এ বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া আছেন এবং বড় বৌয়ের দিকে টানিয়া মনরক্ষা করিয়াই চলিতে অভ্যস্ত।

পিসী বলিলেন, তোমার যে কবে জ্ঞানগম্যি কিছু হবে, তা এতটা বয়স হলেও আমি বুঝলাম না ছোট বউ।

সুলেখা কথা কহিল না। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বড় বৌ আজ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। ছোট বৌ সুলেখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেও এবং তাহাকে ছোট বোনের মত দেখিলেও, খোকার গালের দাগগুলি দেখিয়া মার হৃদয় সহসা কাঁদিয়া উঠিল। তিনি টান মারিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া বাঁশিটা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সুলেখা আপত্তি করিল না। একটা প্রতিবাদও তুলিল না। যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে এক নিদারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। বর্ষার দিনে সমস্ত আকাশ যেমন করিয়া মেঘ-ভারাক্রান্ত হইয়া সজল নয়নে চুপ করিয়া থাকে, তেমনি গাঢ় বেদনায় সে একান্ত নিরুপায়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া কালো আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিল। দূরের গাছটার পাশ দিয়া সূর্যদেব নামিয়া যাইতেছেনঃ সব কিছুর মধ্যে আজিকার মতো বিদায়ের ধ্বনি।

সুলেখা ছাদে আসিয়া ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন কিছু ভাল লাগে না। এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা, এই মিষ্টি সুন্দর হওয়া, এই আলো, এই বাতাস—সব কিছু যেন তিক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসে রোজকার মতো আছে সেই সুর, সেই ছন্দ ; তবু যেন ভালো লাগে না। হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী যেন কিসের আবাহনে আবার নিবিড় হইয়া উঠিল ; বিগত জীবনকে সে কত ভাবে কত দিক দিয়া ভুলিতে চাহিয়াছে, কর্মের মধ্যে নিজেকে সযতনে নিয়োজিত রাখিবার কত প্রচেষ্টাই না সে দিনরাত করে—তবু পারে না। ঐ বাঁশিটাই যেন তাহাকে সজোরে তাহার গত জীবনের মধ্যে লইয়া আসে।

সুলেখা ছাদ হইতে সেই বাঁশিটার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা ইঁটের উপর বাঁশিটা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। সুলেখার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। মনে ভাবিলঃ ভালই হইল। ঐ অলুক্ষণে সর্বনাশা বাঁশিটাই যত নষ্টের গোড়া ; ওটাই কিছুতেই তাহার বিগত জীবনকে ভুলিতে দেয় না। ভালই হইল।

কিন্তু তবু যেন কিসের এক নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ সুর তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। সে সব কিছু ভুলিয়া যায়।

মনে পড়িতে লাগিল সেই দিনের কথা, যখন এ গৃহে প্রথম সে আসে। বয়স আর তখন কতই বা হইবে—ওই বছর পনেরো বা ষোল—বা তারও কম।

স্বামীকে মনে পড়ে। বনোজ যেন আজও তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর,

গৌর চেহারা। বনোজ, তার স্বামী। তার স্বামীকে মনে পড়িয়া যায়।

আরও ধীরে ধীরে অনেক কথাই তার মনে পড়িতে লাগিল। এই বনোজ কি দুষ্টুই না ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা তাহার খোঁপা খুলিয়া দুষ্টুমি করিয়া এমনি হাজারো রকমের কী বিরক্তিই না করিত। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া সে বলিত, সুলেখার মনে পড়িতে লাগিল—তোমাকে একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, কেমন মেয়ে তুমি?

সুলেখা বলিত, দিনরাতই ত কাছে আছি, তবু পাও না?

না পাইনে ত। এই বুঝি দিনরাত?

সুলেখা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত।

এই বুঝি দিনরাত কাছে থাকা, বনোজ বলিত, হিসেব করে দেখ ত আজকে কতক্ষণ তুমি কাছে ছিলে। সেই ভোরে মিনিট খানেক—দুপুরে তিন সেকেন্ড, আর এই এসেই, যাই আর যাই।

সুলেখা প্রতিবাদ করিত না। কারণ, করিয়া লাভ নাই। বলিত, মা বসে আছেন সেই কখন থেকে, আর-আর-ওরা-সবাই বা কি ভাববেন, যাই।

এমনি কতো টুকরো টুকরো কাহিনী মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বনোজের একটি প্রিয় জিনিস ছিল—বাঁশি বাজানো। তন্ময় হইয়া সে বাঁশি বাজাইত এবং এই একটিমাত্র সময়েই সে সব কিছু ভুলিয়া যাইত—সংসার মুছিয়া যাইত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে, সমস্ত কিছু সুরের ছন্দে নাচিয়া বেড়াইত। কী সুন্দর বাজাইতেই না সে জানিত! সুরের উপর সুর সৃষ্টি করিত এক অপরূপ রূপ-জগতের, যেখানে আর কাহারও স্থান ছিল না, সুলেখারও নয়। এ সময় সুলেখা আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেও সেই দিকে তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল হইত না—হয়তো চোখ পড়িয়াও পড়িত না।

এই সুরের রাজ্যে বনোজ ছিল একান্তই একক। ইহার গণ্ডী পার হইয়া সুলেখাও কখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এইখানেই ছিল তার দুঃখ। সে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইত, বনোজ একবার ফিরিয়াও তাকাইত না।

সুলেখার রাগ বাড়িয়া যাইত। সে হয়তো টান মারিয়া বাঁশিটি তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইত। দু-একবার একটু আপত্তি তুলিয়া বনোজ চুপ করিয়া থাকিত। সুলেখাকে সে এতই ভালবাসিত যে অত্যন্ত রাগ হইলেও কখনও তাহাকে ব্যথা দিতে পারিত না, বলিত, সু—তুমি অমন করে কখনও বাঁশি কেড়ে নিও না আমার কাছ হতে।

সুলেখা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিত, বাঁশি তুমি আর কখনও বাজাতে পারবে না।

ম্লান ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া সে বলিত, কেন?

সুলেখা রাগিয়া বলিত, কেন দিনরাত শুধু বাঁশি বাজাবে তুমি? আমি কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

বনোজ কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত। আদর করিয়া বলিত, এই কথা! বেশ ত। এসো।

বলিয়া এমন দুষ্টুমিই করিতে আরম্ভ করিত যে বাধ্য হইয়া সুলেখা বলিত, তোমার কেবল দুষ্টুমি, ছাড়ো।

বাঃ! তোমার সাথেও দুষ্টুমি করতে পারবো না?

না।

বেশ, বনোজও হাত পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া নির্বিকার হইয়া বসিত। বেশ, না করলাম, বলিয়া বাঁশিটি হাতে তুলিয়া লইত।

ধাঁ করিয়া সুলেখা আবার তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিত, না, এখন থাক বাজানো।

বেশ না হয় দুষ্টুমিই কর, কিন্তু দেখ ত এই সন্ধ্যাবেলা—শেষে কে কি বলে বসবে!

বনোজ আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, কেউ কিছু বলবে না।

এমনি কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে-সব কথা এতো ছোট, এতো ক্ষুদ্র যে কোনটিই মনে রাখার মতো নয়—তবুও প্রত্যেক কাহিনী, প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি ছন্দ যেন কতো চেনা, কতো পরিচিত।

ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যেন ভোলা যায় না। স্মৃতির কোন্ অতল দেশ হইতে আপনিই উঠিয়া আসে। বসন্ত ঋতুতে যেমন করিয়া দক্ষিণের বাতাস সমস্ত কিছু ভরাইয়া দিয়া যায়, তেমনি করিয়া সেই সব গত কাহিনী মনের কোন গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়া সুরে ছন্দে, গানে এবং প্রাবল্যে, উত্তেজনায় আর আনন্দে তাহাকে মাতাইয়া দিয়া যায়, তাহাকে বিভোর করিয়া তোলে। সে আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেই রূপের মোহে, সেই সুরের ধ্বনিতে ছন্দের বিচিত্র বর্ণে এবং গন্ধে।

ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না।

এমন করিয়া কত কি সুলেখা ভাবিতেছিল।

নীচ হইতে মা ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বৌ ডাকিলেন, ও ছোট, কোথায় তুই? নীচে আয়।

সুলেখা ডাক শুনিয়া নীচে আসিল। বড় বৌ বলিলেন, তোমার জন্যেই খোকাটা অত বাড় বেড়েছে, এখন বোঝ মজাটা। একদিন তুমি না খাইয়ে দিলে চলবে না, ভাত নিয়ে কতক্ষণ সাধাসাধি হলো। খাবে না।

সুলেখা কোন কথা বলিল না খোকাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। ইহাকে খাওয়ানো একটা মহাযুদ্ধ জয় করা হইতে কম নয়। এবং একমাত্র সুলেখাই তাহা পারে। খাইতে বসিয়া অন্ততঃ সহস্র আবদার রক্ষা না করিলে সে কিছুতেই খাইবে না। সুলেখা ইহা জানে, কিন্তু আজ তার কোন দিকে ভাল লাগিল না। বলিল, বুড়ো ছেলে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, পারব না আমি তোকে রোজ খাওয়াতে, খা!

সুলেখা বুঝিতে পারিল আজ খোকার ভাল করিয়া পেট ভরে নাই। কিন্তু কোন কথা বলিল না, রাগ করিয়া এমন করিয়াছে একথা মিথ্যা—কেন যেন ভাল লাগিল না। যাকে এক মুঠা বেশী খাওয়াইবার জন্য উদ্বেগের আর তাহার অন্ত থাকে না আজ তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিতেও যেন কেমন এক বিশ্রী আলস্য। মনের সমস্ত কিছু ভরিয়া শুধু বনোজ। শুধু মাত্র বনোজ, আর কেউ নাই। এই পৃথিবী, এই বিরাট জগতের যা কিছু সব আজ নিঃশেষে এই বিধবা তরুণীটির নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে কেবলমাত্র 'বনোজ' আজ সেখানকার অধীশ্বর কেউ আর কোথাও নাই। সব ফাঁকা সব খালি।

খোকার খাওয়া-পর্ব শেষ হইলে সুলেখা সংসারের ছোটখাটো কাজ করিল। আজ কাজ করিতেও কেমন এক বিতৃষ্ণা। দেখিল, মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা পর্যন্ত এখনও হয় নাই। খোকার এবং অন্যান্যের বিছানা খালি পড়িয়া আছে, চাদর পাতা হয় নাই। বড় ঠাকুরের আসিয়াই গামছা চাই, অথচ র‍্যাকে গামছাটা পর্যন্ত ঝোলান নাই।

এসব কাজ সুলেখাই করে, এবং করিতে না পারিলে দুঃখিত হয়। কিন্তু আজ কিছু ভাল লাগিল না, কেমন যেন একটা অবসাদ, সমস্ত মাথার ছিদ্র দিয়া যেন অন্য কাহারও কথাই মনে ঢুকিতে লাগিল।

ছোট ননদ 'মিনু' আসিয়া বলিল—বৌদি, আমার পড়াটা একটু দেখিয়ে দেবে চল না।

চল, বলিয়া তাহাকে পড়াইতে বসিল।

কিন্তু আজকে যেন কিছু ভাল লাগে না, পড়াইতে পড়াইতে অকস্মাৎ কখন মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যা হইলেই বনোজ ঐ বাঁশিটি লইয়া বাজাইতে বসিত, আস্তে আস্তে

সুর তুলিত গানের।

মিনু বলিল, তার পর কি হল বৌদি, কি হবে বলে দাও না।

বৌদি বলিল, বাঁশির ইংরাজী তাও জানো না—

মিনু বলিল, বা, তা বুঝি জিজ্ঞেস করছি?

বৌদির মন অবচেতনা হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল, আজ থাক বোন। আজ ভাল লাগছে না। ধীরা কই রে?

কে, বড়দি?

হাঁ।

সে ত আজ স্কুল হতে আসেনি।

কেন রে?

ওদের আজ প্রাইজ না কি, বললাম আমাকে নিয়ে যেতে—নিলে না।

বৌদি চুপ করিয়া রহিল।

মিনু বলিল, আজ ওরা হোস্টেলে থাকবে, কাল সকালে আসবে।

আচ্ছা।

ধীরা থাকিলে তাহার সহিত গল্প করিয়া কিছুটা সময় তবু কাটানো যাইত। আজ তাহারও উপায় রহিল না, অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন এমনি করিয়াই হয়।

রাত্রি এদিকে অনেক হইয়া গিয়াছে। আকাশে এক খণ্ড চাঁদ, তাহারই শুভ্র আলোকে সকল কিছু রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ী-ঘর, দূরের ঐ প্রান্তর সমস্ত কিছুর উপর চাঁদের মিষ্টি আলো। কোমল স্পর্শ!

সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতও কম হইল না। সুলেখার চোখে ঘুম নাই। ঘুম যেন এ রাজ্য হইতে কতদূরে পলাইয়া গিয়াছে—ঘুম নাই। সুলেখা জানালার নিকটে দাঁড়াইল। কিসের যেন একটা মিষ্টি শব্দ কতদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূরের ঐ পল্লবিত বনানীর শ্রেণী পার হইয়া, ছোট ঝরণাধারাগুলিকে পাশে রাখিয়া কোথা হইতে যেন একটা বাঁশির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

জানালা ধরিয়া সুলেখা চুপ করিয়া রহিল।

আকাশে শ্বেত-শুভ্র অপরূপ জ্যোছনা, রূপার মত ঝক ঝক করিয়া বিছাইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া গলাইয়া আসিয়াছে খানিকটা তাহার ঘরের মধ্যে, এমনি কত রজনীতে কতদিন তাহারা দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়াছে, বাঁশি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। এমনি করিয়া কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত গ্রীষ্ম তাহাদের নিকট দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে—খুশী করিয়া, হাসি দিয়া, কত ভাবে। কিন্তু তারপরের কথা ভাবিতেও সুলেখার ভয় হয়।

তখন বৈশাখ মাস। এমনি একটা সময়ে বনোজের সর্দি হঠাৎ বসিয়া যায়। তা লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু টানাটানিতে এক পক্ষই জিতিতে পারে—জয় হইল বিধাতার। অসুখের সময় বনোজ বাঁশি বাজাইতে চাহিত। ডাক্তারদের বারণে হইয়া উঠিত না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে বনোজ সুলেখাকে কাছে টানিয়া নেয়। বলে, আমার ত সময় হইয়া আসিল। বিদায় দাও, সু!

চোখের অশ্রু মুছিয়া সুলেখা কি বলিতে চাহিতেছিল, পারে নাই।

মৃত্যুর মত হাসি হাসিয়া বনোজ বলিয়াছিল, যদি কিছু হয়—এ বাঁশিটি তুমি রেখে দিও। ওর চেয়ে প্রিয় আমার কিছু নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুলেখা বলিয়াছিল—অমন কথা বলবে ত আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি পারব না রাখতে তোমার বাঁশি।

বনোজ আর কিছু বলে নাই। শুধু বলিয়াছিল—ওকে রেখে দিও।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গিয়াছে আজ তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। সুলেখা সে কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠে। মাত্র তিন বছর স্বামীর সহিত বাস করিবার পরই তাহার সব ঘুচিয়া গেলঃ নারী যাহা লইয়া গর্ব করে, সে তাহাকে হারাইল।

তারপর কত বছর কাটিয়া গিয়াছে। কত বর্ষা, কত বসন্ত ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গন্ধভরা উতলা বাতাসে কত দক্ষিণের গানই না রূপের মাধুর্যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই যেন মস্তবড় একটা দীর্ঘ ফাঁক। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে। কিসের যেন অভাবে সমস্ত আলো, সমস্ত হাসি একটা বিরাট মিথ্যা হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয়।

কিন্তু প্রত্যহ রাতে যেন কে আসিয়া ঐ বাঁশিটি বাজায়। সুলেখা ঘুমাইয়া পড়িলে যেন কাহার সজীব হস্তে বাঁশিতে সুর আরম্ভ হয়। জাগিয়া থাকিলে বাঁশি বাজে না। কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রত্যেক রাত্রে সে ঐ বাঁশির শব্দ শুনিতে থাকে। তাহার বৈধব্য-জীবনের মধ্যে এই একটি মাত্র সান্ত্বনা। যাহা লইয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে।

আজ তাহার মনে হইতে লাগিল কতদূর হইতে একটি বাঁশির করুণ সুর যেন ভাসিয়া আসিতেছে। কি করুণ সে সুর! প্রতিটি রেশের মধ্য হইতে কে যেন শান্ত কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিতেছে, আমায় তুমি নিলে না? তুলে নাও, নাও।

সুলেখার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। ওদিকে বাঁশি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় তুলে নাও তুমি, তুলে নাও।

সুলেখা কি করিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। খিড়কীর দরজা খুলিয়া প্রাচীরের নিকটে আসিয়া সেই বাঁশিটির নিকট ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল। কে এক ছায়ামূর্তি যেন বাঁশিটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সুলেখা কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তারপর কিসের এক উন্মাদনায় আগাইয়া গেল এবং সেই ছায়ামূর্তির হাত হইতে বাঁশিটি তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ছায়ামূর্তি খুশী হইয়া উঠিল যেন, কিন্তু কিছু বলিল না।

শান্তিরাম

সন্ধ্যার কিছু আগে একখানা ট্রেন ছাড়ে। রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সেখানা দেশের স্টেশনে পৌঁছায়। শান্তিরাম ওই ট্রেনেই বাড়ী যাওয়া ঠিক করিল।

কলে জল আসিয়াছে। ঝর ঝর শব্দে চৌবাচ্চায় পড়িতেছে। চৌবাচ্চাটা মাঝারি, ক্রমশঃ পুরিয়া আসিল বলিয়া। ভাদ্র মাসের পচা গুমোট, স্নান করিয়া লওয়া ভাল। কাপড় ভিজাইয়া দরকার নাই—গামছা পরিয়া শান্তিরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। এখনও ঝাড়ুদার আসে নাই। এবেলা-ওবেলার উচ্ছিষ্ট ভাত, শাকের চিবানো ডাঁটা, মাছের কাঁটা ঝাঁঝরি ড্রেনের মুখে পড়িয়া জলের স্রোত আটকাইয়াছে, দেখিলে গা কেমন করে—কি নোংরা!...কিন্তু এই নোংরা আস্তাকুড়ের মধ্যে আজ সাতটি মাস বাস করিয়াও পয়সা হইল কৈ? সে সব সহ্য করিতে পারিত যদি হোটেলটা হইতে কিছু পয়সা আসিত।

ভূপেনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঘরের চাবি খুলিল। ঘরটার সামনে চালের বস্তা, ডালের বস্তা, বেগুন পটলের ধামা, শুকনা বিলাতি কুমড়া। আধ নাগরী আখের গুড়—একটা ছোট্ট আড়াইসেরা টিনের অর্ধেক ভর্তি সরিষার তৈল।

বাজে হোটেলের মত যা তা তেল এখানে ব্যবহার করা হয় না, রামগোপাল মিলের মোহন-মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল। কিন্তু এতেও হোটেল চলিল না।

ভূপেনবাবু কলতলায় হাত পা ধুইতে আসিল। কাঁধে গামছা, পায়ে খড়ম। চটির দাম বেশী। বেচারী পঁচিশটি টাকা মাহিনা পায়। ট্রাম কোম্পানীর আপিসে কাজ করে। ঘরের ভাড়া দেয় সাড়ে চার টাকা—পাইস হোটেল এটা, তবুও ভূপেনবাবুর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে—ঘরভাড়া বাদে এগারো টাকা।

ভূপেনবাবু বলিল—শান্তিরামবাবু, আপনি নাকি আজ চল্লেন?

—না গিয়ে কি করি বলুন। এতদিন তো বেয়ে ছেয়ে দেখলাম। কিছুই যখন হলো না, তখন থেকে লাভ কি, খাবই বা কি?

—কেন, আপনাকে এরা রাখবে না?

—আমার পোষাবে না। আমি ছিলাম হোটেলের মালিক, আর এখন ওদের তাঁবে আমাকে সাত টাকা মাইনে আর খোরাকীতে খাটতে হবে। আর ওই যে নিধিরামবাবু, ওঃ, এমন মানুষ যদি দুটি—বল্লাম আর পঁচিশটি টাকা বেশী দাও গিয়ে। দেনার দায়ে নয় হোটেল বিক্রিই হচ্ছে, তা বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে তোমাদের ভালো হবে! হোক, ভগবান মাথার উপর আছেন। তিনি দেখবেন। কারেই না হয় পড়েছি মশায়, চিরকাল এমন দিন থাকবে না, তাও বলে দিচ্ছি।

—বাড়ীতেই এখন থাকবেন?

—দেখি কি হয়! পয়সা যা পেলাম হোটেল বিক্রি করে, তা গেল পাওনাদারের পেছনে। মিথ্যে বলব কেন ভূপেনবাবু, আপনি আমার ছোটভাইয়ের মত, সাতটি টাকা আর রেলভাড়া—এই নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তাতে আর কদিন চলবে সেখানে?

হঠাৎ শান্তিরামের মনে পড়িয়া গেল—ধারে হোটেলের জন্য কড়া ও বালতি কিনিয়াছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের গিরীন্দ্র কুণ্ডুর দোকান হইতে। হোটেল বিক্রি হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা আজ কয়দিন জোর তাগাদা চালাইতেছে। খাইতে দেয় না, ঘুমাইতে দেয় না। তাহাদের বিল-সরকারকে আজ সন্ধ্যার সময় আসিতে বলা হইয়াছে। আসিলেই চার টাকা কয়েক আনা তাহাদের দেনা শোধ করিতে হইবে। তবে বাড়ী যাইবে কি শুধু হাতে! পুঁজি তো সাতটি টাকা।

কাজের কথা নয়। তাহার আগেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়া গাড়ীর জন্য বসিয়া থাকা ভাল। দেড় ঘণ্টা হোটেলে অপেক্ষা করিবার দণ্ড স্বরূপ চার টাকা কয়েক আনা দিতে সে রাজী নয়। নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া সে একখানা ময়লা কাপড় পাতিয়া দু-তিনখানা আধময়লা কাপড় ও জামা, কাঁসার গেলাসটা, পুরানো একজোড়া জুতা, একজোড়া খড়ম, পাটি একখানা—পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। না, এখানে কোন জিনিস ফেলিয়া গিয়া লাভ নাই। বাড়ীতে লইয়া গেলে গৃহস্থ সংসারে কত কাজে লাগিতে পারে।

ছোট টিনের স্যুটকেসটার মধ্যে ধোপার বাড়ী হইতে সদ্য-আসা দুখানি ধুতি এবং একটা ছিটের কাপড়ের পাঞ্জাবি পুরিয়া নিজের গায়ের শার্টটা পরিতেছে, রেলে যাইবার সময় ফর্সা জামা গায়ে দিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতেই যখন যাইতেছে সে, কুটুম্ব বাড়ীতে নয়—এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শান্তিরামবাবু আছেন?

—কে?

—সেদিনকার সেই আধ টিন সর্ষে তেলের দামটা পাওনা—কাল আসতে বলেছিলেন, কাল দু-দুবার এসে দেখা পেলাম না।

—কত বাকি?

—এক টাকা সাড়ে ন আনা।

শান্তিরামের একবার ইচ্ছা হইল বলে, কাল এসো সকালবেলা। কিন্তু ভূপেনবাবু পাশের ঘরেই রহিয়াছে, ভূপেনবাবু জানে, আজই হোটেল বিক্রি হইয়া গিয়াছে, সে—শান্তিরাম, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে দেশে চলিয়া যাইতেছে, আর এখন ফিরিবে না। এ অবস্থায় পাওনাদারকে কি বলিয়া মিথ্যা কথা বলা যায়?

অগত্যা দিতে হইল। সাত টাকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল এক টাকা সাড়ে না আনা। এ বেড়া-আগুনের জাল হইতে বাহির হইতে পারিলে এখন সে বাঁচে। আবার কোন্ দিক হইতে কে আসিয়া পড়িবে কে জানে?

—চল্লেন. তা হলে?

—হেঁ হেঁ আসি। নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবেন—কি রকম আছেন, কেমন তো?

—হ্যাঁ, দেব বইকি—দেব না?

বেশ লোক ভূপেনবাবু।

ডান হাতে টিনের বিবর্ণ স্যুটকেসটা, বাম বগলে পুঁটুলি ও ছাতা লইয়া শান্তিরাম হোটেল হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শেয়ালদ-এর মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

নাশপাতি—নাশপাতি—ছেলেদের জন্য কিছু কিনিয়া লওয়া যাক। দু'পয়সা জোড়া! ডাকাত নাকি রে বাবা! দু'পয়সা জোড়া নাশপাতি কে কবে শুনিয়াছে?

দিব্যি আপেলগুলি। কত দর? চার পয়সা জোড়া কেন, পয়সা পয়সা না?

ফলওয়ালা চটিয়া বলিল—বাবু কৌন জমানা মে আপেল পয়সা পয়সা বিকা?

অনেক দরদস্তুর করিয়া শান্তিরাম ছোট ছোট নাশপাতি দুই পয়সায় জোড়া দরে ছয়টি কিনিল, চার পয়সায় একজোড়া আপেলও কিনিল। পরিমল নস্য লইবে কিছু, দেশে ভাল নস্য পাওয়া যায় না।

ফলওয়ালাকে পয়সা বাহির করিয়া দিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—এই যে শান্তিরামদা, এ কি, যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী নাকি?

শান্তিরাম পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদের দেশের (ঠিক গ্রামের নয়) সরোজ মুখুজ্জে! সরোজ এখানে কোন মেসে থাকে, সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যায়। চাকুরি করে গার্চেন্ট আপিসে। আশি-নব্বই টাকা মাহিনা পায়।

—আর ভাই, বাড়ী চল্লাম—সব উঠিয়ে দিয়ে চল্লাম।

—কেন, তোমার সেই হোটেল?

—চালাতে পারলাম কই? চলতো ভাল. পাঁচ ভূতে খেয়ে আর বাকি ফেলে ফেল মারিয়ে দিলে। এক এক ব্যাটার কাছে আট টাকা দশ টাকা বাকি. খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে! উপুড় হাত করবার নামটি নেই। তাগাদা করতে গেলেই আজ দেব কাল দেব। এদিকে আমার পাওনাদারেরা—বাড়ীওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদি আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। জোচ্চোরের জায়গা কলকাতা। এখানে কি ভদ্দরলোক আছে?

—কিন্তু শান্তিরামদা. দেশে কতদিন যাওনি বল তো? দেশের অবস্থা জানো? বাড়ী তো যাচ্ছ, বন্যায় সব ডুবে গিয়েছে—রসময়পুর থেকে নৌকায় চড়বে আর একেবারে তোমাদের গাঁয়ের বটতলায় গিয়ে উঠবে, কলুবাড়ীর কাছে। চাল নেই, ধান নেই—সব ডুবেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়া—লোকজনের ভয়ানক কষ্ট। কত বাড়ী ঘর পড়ে গিয়েছে—আর এই দুর্দিনে তুমি যাচ্ছ দেশে? এখন যেও না আমি বলি!

—না গিয়ে কি করি?

—এখানে থেকে পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর। এখানে নানা পথ আছে—দেশে কিছু নেই—এক ভিক্ষে ছাড়া। তাই বা দেবে কে? এখানে থেকে বাড়ীতে পয়সা পাঠাও, তাদের উপকার হবে। শুধু হাতে বাড়ী গিয়ে কি করবে? আচ্ছা আসি শান্তিরামদা, আসি।

বন্যার খবর শান্তিরাম কিছু জানে না। বাড়ীর চিঠি পায় নাই আজ পনেরো-কুড়ি দিন। চিঠি না পাওয়ার কারণ সে জানে। তিন পয়সা দাম একখানা পোস্টকার্ডের, পাড়া-গাঁয়ের লোক নিতান্ত দরকারী খবর দিবার না থাকিলে চিঠি বড় একটা দেয় না। বিশেষতঃ তাহার সংসারের যা অবস্থা। তিনটি পয়সা তিনটি মোহর।

ট্রেন ছাড়িল। বেলা একদম পড়িয়া আসিয়াছে। স্টেশনের সিগন্যালের লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে। গাড়ীতে লোক বেশী নাই। শান্তিরাম এককোণে বসিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া মাঝে মাঝে বিড়ি টানিতে টানিতে ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

সরোজ যাহা বলিল, তাহাতে বাড়ী যাইবার উৎসাহ তাহার কমিয়া গিয়াছে। সত্য বটে সে ন-দশ মাস বাড়ী যায় নাই। সে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, স্ত্রীর শেষ সম্বল বালা দুগাছা বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল কলিকাতায়।

দুইশত টাকার মধ্যে বাড়ী লইয়া ফিরিতেছে পাঁচ টাকা সাড়ে ছ-আনা। অবশ্য এ কয় মাস কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়াছিল বাড়ীতে—কিন্তু গত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে আর কিছুই দিতে পারে নাই।

দেশে থাকিতে পয়সা উপার্জনের কোন পথ সে বাকি রাখে নাই। লেখাপড়া তেমন জানে না বলিয়া চাকুরি জোটে নাই, না-ই বা জুটিল চাকুরি? ব্যবসা করিয়া বড়লোক হওয়া যায়, চাকুরিতে নয়। গুড়ের ব্যবসা, কাঠ চালানির ব্যবসা, তরকারি চালানির ব্যবসা; এমন কি মাছ চালানির ব্যবসা পর্যন্ত। কিছুতেই কিছু হইল না। তাই স্ত্রীর বালা-জোড়া লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল কোন একটা ব্যবসা করিতে।

অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল হোটেল খুলিতে। খারাপ কিছু চলে নাই, দুবেলা লোক-জন খাইতেছিলও মন্দ নয়—কিসে কি হইল ভগবান জানেন, খরচে আয়ে আর কিছুতেই কুলায় না এমন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাড়ীভাড়া বাকি পড়িয়া গেল তিন মাসের। বাড়ীওয়ালা শাসাইল জিনিসপত্র আটকাইয়া ভাড়া আদায় করিবে। মুদির দেনা, কয়লা-ওয়ালার দেনা, তরকারীওয়ালার দেনা, মাছওয়ালার দেনা, দুধওয়ালার দেনা, ঠাকুরের মাহিনা বাকি, ঝি-চাকরের মাহিনা বাকি—হোটেল চলে কি করিয়া?

সর্বস্বান্ত হইতে হইল—সত্যসত্যই সর্বস্বান্ত। এতটুকু সোনার গুঁড়া নাই ঘরে, এই কটি টাকা মাত্র সম্বল! বাড়ীতে পা দিলেই চৌকীদারি ট্যাক্সের তাগাদা—সেখানেও মুদির দেনা, গোয়ালার দেনা কোন বা দশ পনেরো টাকা না জমিয়া গিয়াছে!

তাহার উপর দেশের অবস্থা যে-রকম শোনা গেল, সব কিছু ডুবিয়া গিয়াছে, জিনিস-পত্রের দাম চড়া, ধার মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে এ বাজারে। স্ত্রীপুত্র হয়তো বা উপবাসে দিন কাটাইতেছে। নীরদা কত আশা করিয়া আছে, পূজার সময় (আর দিন সতেরো বাকী পূজার) স্বামী কলিকাতা হইতে সকলের জন্য নতুন কাপড় এবং টাকাকড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিবে।

নীরদাকে একদিনের জন্যও খুশী করিতে পারে নাই সে। বিবাহ করিয়া পর্যন্ত অভাব অভাব—অভাব আর ঘুচিল না কোনদিন। অদৃষ্ট! তাহার অদৃষ্ট না নীরদার অদৃষ্ট? দুজনেরই।

দেশের স্টেশনে নামিয়া সহযাত্রীদের মুখে শুনিল, পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছানো যাইবে না। মাতুগঞ্জের বড় বিল ভাসিয়া রাস্তার উপর এক কোমর জল—এত রাত্রে নৌকাই বা পাওয়া যায় কোথায়? চিলমারির নবীন কলু তাহার মুদির দোকানের জন্য কলিকাতার মাল কিনিতে গিয়াছিল। সে তিন বোস দেশলাই ও দুই তিনটি মিছরীর কুঁদো লইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

—এই যে দাদাঠাকুর! কলকেতা থেকে এলেন বুঝি? এই গাড়ীতেই এলেন—কই

দেখিনি তো! এখন কি করে যাই বলুন তো? একটা লোক নেই ইস্টিশানে। নৌকো থাকবার কথা বলা ছিল, কই, কাউকে তো দেখছি নে। আপনিও তো যাবেন, ওদিকে সব জলে জলময়।

একজন কুলি তাহাদের জিনিসপত্র ঝাঁকায় করিয়া লইয়া যাইতে রাজী হইল। কুলিটার মুখে শোনা গেল, স্টেশন ছাড়াইয়া যে বড় মাঠ, কিছুদূর গেলে সেই মাঠের ধারে জেলেদের নৌকা ভাড়ার জন্য মজুত আছে। মাঠ জলে ভাসিয়া সমুদ্রের মত দেখাইতেছে —শুধু বাবলা গাছ ও অন্যান্য গাছপালার খানিকটা করিয়া জাগিয়া আছে মাত্র।

শান্তিরাম অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বলিল—হ্যাঁ নবীন, এ রকম বন্যে তো আমাদের জ্ঞানে কখনো দেখিনি। এ কি হয়েছে, এ যে চেনা যায় না কিছু! গাঁয়ের মধ্যে জল ঢুকেছে নাকি?

বাড়ী পৌঁছিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শান্তিরাম ছোট ছেলের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে নীরদা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দোর খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিল। রং ফর্সা, রোগা চেহারা, শান্তিরামের অপেক্ষা সাত বছরের ছোট সুতরাং বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হইয়াছে। মাথার চুল সামনের দিকে অনেক উঠিয়া গিয়াছে। মুখের লালিত্য অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। পরনে লাল পাড় ময়লা শাড়ী; চুলবাঁধা বা পরনপরিচ্ছদের মধ্যে এতটুকু পারিপাট্য নাই। অতিরিক্ত পান দোক্তা খাইয়া দাঁতগুলি কালো।

—এত রাত্তিরে কোন গাড়ীতে এলে! দ্যাও ওগুলো আমার হাতে। বাবা, একখানা চিঠি না পত্তর না—ভেবে মরছি। সতুর আজ আবার তিন দিন জ্বর আর পেটের অসুখ—বুলুর একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ভাবছি আজকালের মধ্যে একখানা পত্তর দেব। তার ওপরে চারিদিকে জল! হাটবাজার করে এনে দেবার লোক পাচ্ছিনে, এই জল পেরিয়ে কে আমার জন্যে চিলেমারি থেকে জিনিস কিনে এনে দেবে! এলে বাঁচলাম—কি আতান্তরে যে পড়েছি—তার ওপর এদিকে হাতে—ও বুলু, কি বলছে শোন, এই যে যাই—চেঁচিও না, কে এসেচে দ্যাখ্—

—তোমার শরীর ভাল আছে? এই এতে আপেল আর নাশপাতি আছে, সতুকে বুলুকে দাও। খুকীকে দাও এই লেবেঞ্চুস—কলার আর কমলালেবুর। খুকী ভাল আছে তো? চল ঘরে—

—দাঁড়াও একটু, আলোটা জ্বালি, ঘরে অন্ধকার। সামনেই সব শুয়ে আছে, মাড়িয়ে চটকে দেবে।

খানিক পরে শান্তিরাম সুস্থ হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেহ আপেলের টুকরা কেহ লেবেঞ্চুস খাইতেছে। নীরদা স্বামীর জন্য ভাত চড়াইতে গিয়াছে রান্নাঘরে।

নীরদা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে, সে না জানি কত টাকা লইয়াই ঘরে আসিয়াছে! নীরদাকে কিছু বলা হইবে না এখন। না, বলাই ভালো। মিথ্যা আশায় রাখিয়া লাভ কি! নীরদার মুখে আনন্দ ও উৎসাহ যেন ধরিতেছে না। কষ্ট হয় বলিতে—নীরদা, যা ভাবছো তা নয়, আমার হোটেল বিক্রী করে দিয়ে চলে এলুম। সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে, তোমার সে বালা গিয়েছে, তার টাকা গিয়েছে। পাঁচ টাকা সাড়ে ছ আনা মাত্র হাতে অবশিষ্ট আছে।

এ কথা বলিতে কষ্ট হয়। নীরদাকে কোন সুখটা দিয়াছে জীবনে সে?

নীরদা ভাত চড়াইয়া দিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিল। বলিল—পুজোর আগে আবার যাবে বুঝি? তা এই যাবে আবার আসবে, মিছিমিছি পয়সা খরচ। একেবারে আর দুদিন দেরী করে পুজো পর্যন্ত থেকে যাও। ওদের কাপড়-চোপড় এনেছ নাকি?

শান্তিরাম একবার ভাবিল বলে—নীরদা, কিছু নেই, সব গিয়েছে। তোমার বালা

জোড়াটাও। সব উঠিয়ে দিয়ে এলাম। হাত একেবারে খালি! পুজোর কাপড়-চোপড় তো দূরের কথা, তোমাদের খেতে দেবো যে কোত্থেকে তাই ভেবে—

তবুও আজ আট মাস পরে বাড়ী আসিয়া তাহার কি ভালই লাগিতেছিল। কলিকাতায় হোটেল খুলিয়া থাকা—সে এক অন্য ধরনের জীবন। এই কয় মাসে সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। কখনো যে ঘরছাড়া হয় নাই তাহার পক্ষে একা ওভাবে নির্বান্ধব স্থানে থাকা কি ভালো লাগে? এ তাহার নিজের বাড়ী—সকলে এখানে আপন। এখানে নীরদা আছে, সতু, বুলু, খুকী, পিসিমা। পাশের বাড়ীতে দুর্গাদাস কামার, নিতাই কামার, এরা সব তাহার আপন। নিতাই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া শেখে নাই—পৈতৃক বৃত্তি দা-বাঁধানো, লাঙলের ফাল-পোড়ানো অবলম্বন করিয়াছে। তাহাকে সে যে কত দিন দেখে নাই! নিতাই কামারের দোকানঘরের জামরুল-তলার ছায়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিতাই এবং কামারদোকোনের সমাগত লোক-জনের সঙ্গে বেগুন কুমড়ার গল্প করিতে কি সুখ! তার তুলনায় হোটেল? কাল নিতাইয়ের সঙ্গে সকালেই দেখা করিতে হইবে।

শান্তিরাম খাইতে বসিল।

—হ্যাঁ গা, পুজো পর্যন্ত থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

—তা কাপড়জামা ওদের কলকাতা থেকে আনলে না কেন? এখানে দর বেশী।

—দর? হ্যাঁ, তা বেশী।

—হোটেল দেখাশোনা করবে কে এখন?

শান্তিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল নেই।

নীরদা বিস্ময়ের সুরে বলিল—নেই! তবে অন্য কি—কেন, এই সেদিনও তো চিঠি লিখলে হোটেলের কাজ চলছে ভাল।

শান্তিরাম বলিল—চলছিল তো ভালই। তারপর কিসে থেকে কি হলো, কেবল দেনা বাড়তে লাগলো। বিক্রি হয়ে গেল দেনার দায়ে।

—সে বালা-জোড়াটা আছে তো! এনেছ সঙ্গে তো?

নীরদা এই ধরনের প্রশ্ন করিয়া বড় বিপদে ফেলে। এই ধরনের প্রশ্ন না করিয়া যদি বলিত—"সে বালা দুগাছাও ঘুচিয়ে দিয়েছ তো?" তাহা হইলে উত্তর দেওয়াটা সহজ হইত যে বালা ঘুচিয়া গিয়াছে। মিটিয়া গেল। এতখানি আশা-ভরা প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে এখন—

না, সংসার করা এত বিপদ জানিলে সে বিবাহ করিত না। বিবাহ সে ইচ্ছা করিয়া করেও নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রবধূর মুখ দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় উনিশ বছরের ছেলে শান্তিরামের বিবাহ দিয়া যান বারো বছর বয়সের নীরদার সঙ্গে।

—ইয়ে, বালা কোথায় নীরদা? বালা বিক্রী করেই তো হোটেল খুলেছিলাম।

নীরদা হঠাৎ নিজের গালে চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—ওমা আমার কি হবে, ওমা আমার কি হবে—

শান্তিরাম বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, কি ছেলেমানুষি কর—থামো—

ছেলেমেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল।

শান্তিরামের ভাত খাওয়া হইল না—সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া নীরদার হাত ধরিল। স্বামীস্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। নীরদাকে শান্ত করিতে শান্তিরামের সময় লাগিল। মেয়েমানুষকে বোঝান দায়। অনেকক্ষণ পরে নীরদা কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া বলিল—তোমার খাওয়া হলো না—আর দুটি ভাত আছে,

বেড়ে নিয়ে আসি।

—না না, থাক। শোয়া যাক এখন। রাত হয়েছে বারোটা কি একটা—

শান্তিরাম স্ত্রীর প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে—একজোড়া বালা না হয় গিয়াছে, তা বলিয়া সে খাইতে বসিয়াছে আর এমন কুরুক্ষেত্র কান্ড! ছিঃ, এর নাম সংসার? একটু সান্ত্বনার কথা নাই, সহানুভূতি নাই! আচ্ছা সন্ন্যাসী হইয়া গেলে কেমন হয়? অনেকে তো যায়। সংসার আর ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠিকই বলিয়াছেন—কামিনী কাঞ্চন অসার! তাহাদেরই গ্রামের পাশে বন্দিপুরের মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে রাধাকান্ত বহুদিন আগে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিল—এখন কি একটা বেশ বড় গোছের নাম লইয়া কাশীতে মঠ করিয়া আছে। বহু শিষ্য সেবক। দুধ ঘি খায়, কোন কষ্ট নাই—পায়ের উপর মোহর প্রণামী। দিব্যি আছে। আর সংসার করিলে তাহারও দশা এই রকমই হইত—ছেলেপিলে লইয়া জড়াইয়া মরিতে হইত এতদিন।

কামিনী কাঞ্চন সত্যই অসার।

নীরদাও স্বামীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বালা-জোড়াটা একমাত্র সম্বল ছিল। এই তো সংসারের ছিরি! তাহার বাবার দেওয়া বালা। শ্বশুরবাড়ী?.....তাহা হইলে ভাবনা থাকিত না! এক কুচো এখানকার সোনা কোনদিন অঙ্গে ওঠে নাই। কি বিবাহই দিয়াছিলেন বাবা! অকর্মণ্য—আসল কথা এই যে অকর্মণ্য স্বামী। কত পুরুষ মানুষ কত কাজ করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে, গরীব অবস্থা হইতে বড় লোক হইতেছে। আর তাহার স্বামী যাহা ঘরে আছে বা ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। বড়লোক হইতে সে চায় না। কিন্তু এই দুর্বৎসরের বাজারে ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে হইবে তো? এমন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। বিবাহের শখ আছে, স্ত্রীপুত্র পুষিবার ক্ষমতা নাই।

শেষরাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল, ফুটা ছাদ দিয়া নানাস্থানে জল পড়িতে লাগিল। নীরদা ছেলেমেয়েদের লইয়া সরিয়া বিছানা পাতিল। স্বামীর মশারি ভিজিতেছিল দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। শান্তিরাম কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল—আঃ, কি?

—মশারি ভিজছে—ওঠো একটু। বৃষ্টি এসেছে বড্ড।

নীরদা মশারি খুলিয়া কোণের দিকে লইয়া গিয়া আবার খাটাইতে লাগিল। শান্তিরাম বিরক্তমুখে বিছানায় বসিয়া ছিল, কেরোসিনের টেমির মৃদু আলোয় নীরদার দিকে চাহিয়া দেখিল—নীরদা দেখিতে যেন বুড়ী হইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে। বিবাহের পর প্রথম কয়েক বছর কি সুন্দর ছিল দেখিতে! সে রং, সে চেহারা কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ভোজবাজির মত উড়িয়া গেল।

ঠিক তেমন ভালবাসাই কি এখন আছে? সে আকুলি-বিকুলি ভাব, না দেখিলে বাঁচি না ইত্যাদি—বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

নীরদা মশারি খাটাইতেছে। সামনের কপালখানা মাঠের মত চওড়া হইয়া গিয়াছে চুল ওঠার দরুন, ময়লা শাড়ীখানাতে চেহারা আরও খারাপ দেখাইতেছে। যেন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েই নয়। ফর্সা একখানা কাপড় পরিলে কি হইত?

শান্তিরামের মনে স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ কেমন অনুকম্পা জাগিল। বেচারী নীরদা!

তাহারই দোষে নীরদা অমন হইয়া গিয়াছে। মেয়েমানুষ অসহায়, যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে। পরাও না শান্তিপুর ফরাসডাঙার জরিপাড় শাড়ী, চড়াও না মোটরগাড়ীতে? এমন চড়িবে যখন, সাজসজ্জাও করিবে তখন। উহার দোষ কি?

না—কাল উঠিয়া কোন একটা চেষ্টা-চরিত্র দেখিতে হইবে। হাত-পা হারাইলে

চলিবে না!

নীরদা বলিল, পান দেব, পান খাবে?

—না! এক গেলাস জল বরং দাও। তামাকের পাত্রটা কোথায় রেখেছ? টিকেগুলোতে জল না পড়ে।

—তামাক খাবে নাকি? সাজবো?

—থাক, তুমি জল দাও। তামাক আমি সাজছি।

তামাক টানিতে টানিতে শান্তিরাম বলিল—এখানে আর দেনা কত হয়েছে?

—তা পনেরো-ষোল টাকা কেষ্টর দোকানে বাকি পড়েছে। রোজ তাগাদা করে, বলেছিলাম পুজোর সময় বাড়ী এলে একেবারে নিও—

—পনেরো-ষোল টাকা! এত ধার জমলো কি করে?

নীরদা একটু ঝাঁজের সহিত বলিল—জমবে আর কি করে! চার মাস যে বাড়ীতে উপুড়হাত করোনি সে কথা মনে আছে? চালাচ্ছি কি করে তবে? তবুও আমার কথায় চাল ধার দেয়—নইলে পাড়ায় ধার দেওয়া দোকান থেকে বন্ধ করে দিয়েছে!

এই কথাটিতে শান্তিরামের দুর্ভাবনা আবার বাড়িয়া গেল। একটা টাকা যাহার কাছে একটা মোহর—বর্তমানে, তাহার মুদীর দোকানে পনেরো-ষোল টাকা বাকি! না শোধ করিলে অবশ্যই চলে এবং চলিতও। কিন্তু বর্তমানে অসহায় অবস্থায় দোকান হইতে ধারে জিনিসপত্র না লইলে চলিবে না—এবং লইতে গেলেই পূর্বের দেনার কিছু অংশ শোধ করিতেই হইবে।

নীরদা বলিল—শুয়ে পড় এখন। ভেবে আর কি হবে। যা হবার হবে।

নীরদার এ কথাটা আবার শান্তিরামের বেশ লাগিল। নীরদার মনে ভালবাসা আছেঃ দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, নীরদার মুখখানা দেখিলে তবুও যেন অনেকটা শান্তি।

নীরদা বলিল—ওগো শোন, তোমাদের গাঁয়ে পশুপতি মুখুজ্জে কে ছিল? পুকুরধারের ওই যে বড় দোতলা বাড়ীটা? ও তো আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত পড়েই আছে ওই ভাবে। ওই বাড়ীর লোক এসেছে, আজ পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখি গাড়ী করে নামলো। একজন ছোকরা, এক ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে, এক বুড়ী—বোধ হয় ওদের মা—মেয়েটা আইবুড়ো, বেশ দেখতে। ওরা পশ্চিমে থাকতো না?

শান্তিরাম বলিল—পশুপতিদাদার বাড়ীতে? তা হবে। পশুপতিদাদা তো মারা গিয়েছেন আজ সাত-আট বছর। তাঁর ছেলে শুনেছি ইঞ্জিনিয়র। এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। লখনৌ না কানপুর কোথায় থাকে।

—কোন জন্মে তো আসতে দেখিনি। বাড়ীটা তো ভাঙাচোরা, থাকবে কি করে ও বাড়ীতে?

পরদিন সকালে শান্তিরাম বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—কাকা চিনতে পারেন?

শান্তিরাম বুঝিল এটি পশুপতি মুখুজ্জের ছেলে, যাহার কথা রাত্রে হইয়াছিল। বলিল—এসো বাবা, এসো। তোমার খুড়ীমা বলছিলেন—তোমরা কাল এসেছ। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্টই—আহা পুণ্যাত্মা লোক—তোমাদের রেখে স্বর্গে চলে গিয়েছেন—বসো বাবা, বসো। বৌদিও এসেছেন নাকি?

—না, মায়ের শরীর ভাল না। সঙ্গে এসেছেন আমার এক সম্পর্কে মাসীমা। আমি কখনো গাঁয়ে আসিনি—কাউকে চিনি নে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্ছি। দেখুন, এই বাপঠাকুরদার দেশ। অথচ কাউকে চিনি নে। বাড়ীটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে। কাল সারা রাত্তির বিছানায় জল পড়েছে। সঙ্গে আমার বোন আছে—ওকেও নিয়ে এলাম,

এবার ম্যাট্রিক দেবে। কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে পড়ে।

—বেশ বেশ, খুব ভালো বাবা। যাবে আসবে বৈ কি? তোমরা গাঁয়ের রত্ন, না এলে-গেলে কি হয়? দেখছ তো গাঁয়ের অবস্থা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সব থাকতে, আমরা কি কষ্ট পাচ্ছি দেখ গাঁয়ে থেকে। তোমার নামটি কি বাবা?

যুবক বলিল—আজ্ঞে আমার নাম সুশান্ত। আমার বোনের নাম চিন্ময়ী, চিনু বলে ডাকে। আপনার কাছে যে জন্যে এলুম তা বলি। বাবা আমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাদার নামে গাঁয়ে একটা পুকুর কেটে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। আজ সাত বছর বাবা মারা গিয়েছেন, কিন্তু নানা কারণে আমার গাঁয়ে আসা ঘটেনি। তাই এবার ভাবলুম—যাবই, কাজটা সেরে আসি। আমাদের বাড়ীর সামনে যে পুকুরটা রয়েছে, ও তো একেবারে মজা। ভাবছি ওটাকে কাটাবো। পাড়ার লোকের জল খাওয়ার সুবিধে হয় তা হ'লে। তা ও পুকুরে আপনার অংশ আছে শুনলাম। আমি অন্য সব অংশীদারের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁরা সব রাজী হয়েছেন। এখন আপনি যদি—আমি অবিশ্যি ন্যায্য দাম যা হয় দেব। সকলকেই দেব।

শান্তিরাম বলিল—এর আর কি বাবা, খুব ভাল কথা। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে ওবেলা কি কাল যা হয় বলব।

যুবক চলিয়া গেল। শান্তিরাম স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—শোন, শোন। একেবারে অকূল ভাবছিলাম, একটা কূল দেখা দিয়েছে—

তারপর পুকুরের ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বলিল—মজা এঁদো পুকুর পড়ে আছে শেওলা হয়ে। কখনো কিছু তো হয় না। যা পাও, পঁচিশটে টাকাও দেবে। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে পাঁচ পয়সার হরিলুট দিও।

দুপুরের পর পশুপতি মুখুজ্জের মেয়েটি শান্তিরামের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। নীরদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাকীমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

নীরদা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েটির চিবুক ছুঁইয়া আদর করিয়া বলিল, এসো মা আমার, এসো, বসো। গরীব কাকার বাড়ী, তোমায় মা কোথায় বসাই : এ আসনখানাতে বসো মা।

দুজনে ভাবসাব খুব শীঘ্রই হইয়া গেল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সারা দেহে একটা গতির হিল্লোল, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একরাশ চুল একটু নামাইয়া এলানো খোঁপা বাঁধা—সাদাসিধা ধরণের শাড়ী ব্লাউজ পরনে। হাসি ছাড়া যেন কথা কহিতে পারে না মেয়েটি।

নীরদা বলিল—তোমার দাদা এসেছিল ওবেলা তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলুম বড় ভাল ছেলেটি। তুমি ইস্কুলে পড় শুনলাম। কি পড়?

—ক্লাস টেন্-এ পড়ি। এবার ম্যাট্রিক দেব।

—তোমার মা এলেন না কেন? কখনো দেখিনি তাঁকে।

—তাঁর শরীর ভাল না। বিছানা থেকে উঠলে মাথা ঘোরে—কোথাও বেরুতে পারেন না।

—আহা! তাঁর দেখাশুনো কে করে? তোমার দাদার বিয়ে হয়েছে?

—না, দাদা বিয়ে করবে না এখন। দেশসেবা করবে, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের লেখাপড়া শেখাবে—এসব দিকে মন। দেশের কাজ করবে বলে পাগল। অন্য ধরনের মানুষ দাদা।

দাদার কথা বলিবার সময় মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় নম্র হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে ইহার মুখের চেহারা যেন বদলাইয়া যাইতেছে। ভারী জীবন্ত চোখমুখ—এসব পাড়াগাঁয়ে নীরদা কখনও এমন মেয়ে দেখে নাই।

অনেকক্ষণ বসিয়া এগল্প ওগল্প করিবার পর মেয়েটি উঠিতে চাহিলে নীরদা বলিল—চিনু মা, গরীব কাকিমার বাড়ী এসেছ যদি, কিছু না খেয়ে তো যেতে পারবে না। তুমি বসো, আমি একটু হালুয়া করে আনি—

চিনু বলিল—মুড়ি নেই কাকিমা? মুড়ি খেতে বড় ভালবাসি।

নীরদা তাড়াতাড়ি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—তুমি কি মুড়ি খেতে পারবে মা, সেই জন্যে দিতে ভরসা করিনি। আমি নিজে মুড়ি ভাজি—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল মুড়ির ধান ফুরাইয়াছে, অথচ কিনিবার পয়সা নাই। আর দুদিন পরে চিনু আসিলে তাহাকে মুড়ি দিবার সামর্থ্য পর্যন্ত থাকিত না। মান-সম্ভ্রম কি করিয়া বজায় থাকে যে সংসারে পুরুষ মানুষ অমন অকর্মণ্য!

চিনু সেদিন গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার আসিয়া প্রায় ঘণ্টা-দুই নীরদার সঙ্গে কাটাইয়া গেল। ভারি অমায়িক মেয়ে, এদিন সংসারের যত তরকারি, সব বঁটি পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কুটিয়া দিতে লাগিল, নীরদার কোন বারণ শুনিল না। পাড়ার অন্য সকলের বাড়ীতে চিনু তত যায় না, যত এখানে সে আসে। নীরদাকে তাহার কি যে ভাল লাগিল সে-ই জানে! দিনে অন্ততঃ দুইবার তার এখানে আসাই চাই নীরদারও তাহাকে বেশ ভাল লাগে।

দিন দশ বারো পরে একদিন শান্তিরাম স্ত্রীকে বলিল—শুনেছ, আমার অংশের দাম ধার্য হয়েছে বত্রিশ টাকা। আশা করি নি এত হবে! তা সবাই যে দর নিয়েছে আমিও তাই নিলাম।

নীরদা অবাক হইয়া বলিল—সে কি গো! ওই এক মজা ডোবা, বত্রিশ টাকা করে অংশ হলে ছ-অংশের জন্য সুশান্তকে দুশো টাকা দিতে হবে?

—তা হবে বৈ কি। ঠাকুরদাদার নামে পুকুর পিরতিষ্ঠে করবার গরজ আছে—টাকা খরচ করবে না?

নীরদা গম্ভীর মুখে বলিল—একটা কথা বলি শোন—তুমি ও টাকা নিতে পারবে না। ছেড়ে দাও অমনি।

শান্তিরাম অবাক হইয়া বলিল—এমনি ছেড়ে দেব! কেন? বেশ তো তুমি—

নীরদা বলিল—চিনু আমাকে বড় ভালবাসে। এখানে ছাড়া সে কোথাও খায় না আসে না। দুটি চালভাজা দিই তাই হাসিমুখে বসে বসে খায়। মেয়ের মতো মায়া হয়েছে ওর ওপর, ওদের কাছ থেকে তুমি ওই ডোবা বেচে টাকা নিতে পারবে না—আর যে টাকা নেয্য নয়, তা কখনও নিতে পারবে না তুমি।

—তবে চলবে কি করে শুনি? এ টাকা ছাড়লে কিসে থেকে কি হবে?

—তা যাই হোক! ওরা বড়মানুষ বটে, কিন্তু গাঁয়ে সবাই ওদের ঠকিয়ে নিচ্ছে ছেলে-মানুষ পেয়ে—তা বলে তুমি তা নিতে পারবে না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা আছে! তুমি নিলে আমি অনথ বাধাব বলে দিচ্ছি।

স্ত্রীকে শান্তিরাম ভয় করিত। কাজেই যখন অন্য সরিকেরা ডোবার অংশের দাম কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া পাইল, শান্তিরাম কিছুতেই টাকা লইল না। সুশান্তকে বলিল—পশুপতি দাদার ইচ্ছেতে তাঁর বাবার নামে পুকুর হবে, আমি তাতে টাকা নিতে পারব না। এমনি লিখে দিচ্ছি আমার অংশ। ও অনুরোধ ক'রো না বাবা।

রাত্রে সে স্ত্রীকে বলিল—কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি। তুমি টাকা নিতে দিলে না, এখন কর উপোস! বত্রিশ টাকায় দুটি মাস ভাবতে হতো মা। এখন আমি কোথা থেকে কি করি, এই পুজো আসছে সামনে, অন্তত ওদের কাপড় কিনে দিতে পারতাম তো—

নীরদা বলিল—ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে টাকায় আমার ছেলেমেয়ের কাপড় কিনতে হবে না। ওরা কাপড় এবার না হয় পরবে না। যেমন চিনু, তেমনি ওর দাদা—

ওরা ছেলেমানুষ। ওদের কাছ থেকে দাম নিয়ে অনেষ্য টাকা আদায় করে কদিন খাবে? বেশ করেছ ছেড়ে দিয়েছ।

টাকাটা হাতছাড়া হওয়াতে শান্তিরাম দুঃখিত হইল বটে কিন্তু স্ত্রীর এ নূতন মূর্তি তাহার কাছে লাগিল ভাল। সোনার বালার শোকে স্ত্রীর যে মূর্তি দেখিয়াছিল, ইহা তাহার বিপরীত ; নীরদা—না, বেশ লোক। এ জিনিস যে আবার নীরদার মধ্যে আছে—

বলিল—শোন, ওপাড়ার মহেশদাদা তো এক শরিক! আমায় ডেকে পরশু বলছে—হ্যাঁ হে, তোমরা নাকি বত্রিশ টাকা করে অংশ ধার্য করেছ? আমি আমার অংশ পঞ্চাশ টাকার কমে দেব না। ওদের গরজ পড়েছে, বড়লোক, যা চাইবো তাই দিতে হবে। ও খাস ব্রহ্মোত্তর, ছাড়বো কেন অত সহজে?—সত্যি যা বলেছ, সুশান্তকে ভালমানুষ পেয়ে ওরা দম দিয়ে বেশী টাকা আদায় করেছে।

—করে থাকে করেছে। যার ধর্ম তার কাছে। ও টাকা কদিন খেতে? ও কথা বাদ দাও। পুকুর কাটিয়ে দেবে ওরা একগাদা টাকা খরচ করে কিন্তু জল খাবে পাড়ার পাঁচ-জনেই তো? ওরা সেই পশ্চিম থেকে কিছু পুকুরের জল খেতে আসছে না। আমাদের সুবিধের জন্যেই ওরা করে দিচ্ছে। চিনু বলেছিল, ওর দাদা পরের কাজে, দেশের কাজে বড় মন দিয়েছে। বেশ ছেলেটি।

পুজোর দিন কয়েক বাকি।

সুশান্ত সন্ধ্যার সময় শান্তিরামের বাড়ী আসিল। বলিল—কাকা, আমরা কাল চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আপনার উপর একটা ভার দিয়ে যেতে চাই। পুকুর কাটানোর ভারটা আপনি নিন। গাঁয়ের মধ্যে আপনি অনেস্ট লোক দেখলুম। চিনুর মুখে আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি। একটা প্রস্তাব আছে আমার, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি। আমি এই পুকুর কাটানোর আর আমাদের জমিজমা বাড়ীঘর এখানে যা আছে তা দেখাশুনা করবার জন্যে মাসে আপনাকে পনেরো টাকা দেবো। পুকুর কাটানো হয়ে গেলে আমাদের বাড়ীটা মেরামত করবার ভারও আপনার ওপর থাকবে। আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে খালাস হবো। মাঘ মাসের দিকে মাকে নিয়ে এসে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে যাবো। বলুন কাকা, এতে আপনি রাজী আছেন—রাজী না হলে ছাড়ছি নে, গাঁয়ে আর লোক নেই। আর আমাদের যাওয়ার আগে আপনার দু-মাসের টাকা দিয়ে যাবো—কেন না, পুজো আসছে, খরচপত্র আছে তো? পুকুর-কাটার দরুনও আপাততঃ একশো টাকা আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই—আপনাকে সকলে গাঁয়ে বলে হোটেলওয়ালা বামুন, কিন্তু দেখছি আপনিই খাঁটি লোক।

শান্তিরামের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছোকরা আরও সব যে কি বলিয়া গেল শান্তিরামের মাথার মধ্যে কিছু ঢুকিল না। সুশান্ত চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কোথায় গেলে, শুনছো—শোন শোন—

নীরদা সব শুনিয়া হাসিমুখে বলিল—স্ত্রীবুদ্ধি বলছিলে যে? আমার বুদ্ধি নিয়ে চলো একটু।

ফিরিওয়ালা

অনেক দিন আগে বাল্যজীবনে যখন কলকাতায় এসে কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন হ্যারিসন রোডের একটা ছাত্রদের মেসে থাকতাম।

একজন ফিরিওয়ালা সে-সময় প্রত্যহ আমাদের মেসে আসত, তার মাথায় একটা চেপ্‌টা গড়নের হাঁড়ি—তাতে থাকত ক্ষীরমোহন ও রসগোল্লা। লোকটা সত্যিই ভারি চমৎকার ক্ষীরমোহন তৈরি করতে পারত—এবং তার চেয়েও বড় গুণ ছিল লোকটার,—সে ধারে খাবার দিয়ে যেত মেসের ছেলেদের।

মেসে জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে, ধার না দিলে তাদের ব্যবসাই চলে না—একথা তাদের চেয়ে ভালভাবে কেউ বুঝত না। ধারও যেমন তেমন ধার নয়, মেসের ছেলেরা নির্বিবাদে দিনের পর দিন খেয়ে চলেছে, মাস শেষ হলে দেখা গেল, ফিরিওয়ালার ক্ষীরমোহনের দেনা দাঁড়িয়েছে এক-একজনের কাছে দশ টাকা, পনেরো টাকা। মজা হচ্ছে এই যে, টাকা শোধ না হলেও এসব ক্ষেত্রে ধার দিয়েই যেতে হবে—কারণ খাবার খাইয়ে না যেতে পারলে টাকা কখনই আদায় হবে না।

ক্ষীরমোহনওয়ালার মুখে বিনয়ের হাসি সর্বদাই লেগে থাকত, আমি কখনো তার হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি অন্ততঃ। ও এলেই বড় ভাল লাগত—ওর মুখের মজার মজার হাসির গল্প শুনতে। মেসের ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে চার-পাঁচ টাকার খাবার খেয়ে ফেলত সবাই মিলে।

লোকটার চেহারা ছিল ভাল। বেশ দোহারা গঠনের, রং একটু ফর্সা, বড় বড় গোঁপ জোড়া দেখলেই আমাদের খুব হাসি পেত, তার ওপরে ওর মুখে ওর দেশের নানান রকম মজার গল্প শুনতে গিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার উপক্রম হত।

ঘড়ির কাঁটার মত লোকটা আসত আমাদের মেসে।

ঠিক সাতটা যে-ই বাজল, মুখ ধুয়ে উঠে সবাই বসেছে, এইবার চা আর খাবার আনবার দরকার, অমনি দেখা গেল ক্ষীরমোহনওয়ালা তার চেপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে হাজির হয়েছে। দুঘণ্টা ধরে নানারকম হাসির গল্পের মধ্যে বেচা-কেনা নিষ্পন্ন করে সে তার চেপ্‌টা হাঁড়িটা মাথায় তুলে আবার ফিরে যেত। এই রকম দুই তিন বছর কেটে গেল।

তারপর আমাদের মেস গেল ভেঙে, আমিও অন্যত্র গিয়ে উঠলাম। দিনকতক পরে আমার নতুন মেসে আবার সেই ফিরিওয়ালা গিয়ে হাজির।

মেসের ছেলেদের মন কি করে পেতে হয়, এ আর্ট ভালভাবে জানা ছিল লোকটার। মাসখানেক যেতে না যেতে ও এখানেও সবার অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এক হাঁড়ি করে প্রতিদিন বিক্রি হতে লাগল এ মেসেও। একদিন ক্ষীরমোহনওয়ালা (ওর নামটা বোধ হয় ছিল পঞ্চানন, কিন্তু ওর নাম ধরে কেউ কোনদিন ডাকেনি, কাজেই ঠিক মনে নেই) এসে আমাদের হাতজোড় করে বল্লে—বাবুমশাইরা, আমার ছেলের বিয়ের আজ বৌভাত, আপনাদের দোরে খেয়েই তো আমি মানুষ। আপনারা সবাই আমার মনিব। বলতে সাহস পাইনে, তবে যদি আপনারা দয়া করে আমার ওখানে আজ পায়ের ধুলো দিয়ে মিষ্টিমুখ করে আসেন, তবে বড় খুশী হই।

মেসের অনেকে গেল, কি কারণে আমার যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া ঘটে নি। যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে ফিরিওয়ালার খাতির ও যত্ন আতিথ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করলে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে কোথায় একটা ছোট্ট খোলার বাড়ীতে ফিরিওয়ালার বাসা। তারই সামনে অন্য একখানা খোলার বাড়ীর বাইরের ঘরে ওদের বসবার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা হয়েছিল। পান তো ছিলই, এমন কি কাঁচি সিগারেটের পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। মেসের ছেলেরা নববধূর জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিল। বৌটিও বেশই হয়েছে সবাই বল্লে, তবে বয়েস কম, এগারো বছরেরর বেশী নয়—ছেলের বয়েসই সবে ষোল বছর।

তারপর ফিরিওয়ালা সকলকে পরিতোষ করে খাইয়ে ছেড়েছে—লুচি, তরকারি, মাছ, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। খাওয়ার পর আবার পান সিগারেট। একজন সামান্য ফিরিওয়ালা যে এমন চমৎকার খাতির যত্ন করবে ভদ্রলোকের ছেলেদের, সেটা এমন বেশী কথা কিছু নয়, কিন্তু তার আয়োজন যে এমন ত্রুটিশূন্য হবে, তার ঘর দোর, বসবার বিছানা যে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এটাই অনেকে আশা করেনি। এমন কি যাবার সময়ে

সকলে ঠিক করেই গিয়েছিল, যাচ্ছি বটে—নিতান্ত গরীব লোকটা নিমন্ত্রণ করে ফেলেছে, না গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই যাওয়া। ওর ছেলের বউয়ের মুখদেখানি স্বরূপ কিছু কিছু ওর হাতে দিয়েই চলে আসবে, কিন্তু খাবে না কেউ সেখানে। তার পরিবর্তে তারা যা দেখলে, তা আশাতীত বটে তাদের পক্ষে। দুতিন-দিন ধরে মেসে ফিরিওয়ালার ছেলের বিয়ের কথাই চলল।

তারপর আবার ফিরিওয়ালা মেসে আসতে লাগল। আগের চেয়ে তার দশগুণ খাতির বেড়ে গেল আমাদের মেসে। ক্ষীরমোহন এক হাঁড়ি করে উঠত আগে—এখন দুবেলা ওঠে দু-হাঁড়ি।

ধড়িবাজ ব্যবসাদারও বটে লোকটা।

আরও বছর দুই পরে আমার ছাত্রজীবন শেষ হল, আমি কলকাতার বাইরে গেলাম চাকুরি নিয়ে এবং সেখানে সাত আট বছর কাটিয়ে দিলাম। কলকাতার জীবন ক্রমশঃ দূরের হয়ে গেল—মেসের কথা, পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কথা আর তেমন করে ভাবিনে। সেবার পূজার পূর্বে বিশেষ কি কাজে কলকাতায় এসে দেখলাম, আমার পূর্ব-পরিচিত সেই ক্ষীরমোহনওয়ালা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে মেসে খাবার বিক্রী করতে এসেছে।

আমি বল্লাম—কিগো, চিনতে পার?

ফিরিওয়ালা আমায় দেখে চিনতে পারলে, খুব খুশী হল। প্রণাম করে বললে—বাবুমশাই, চিনতে পারব না আপনাদের? আপনাদের দোরে খেয়ে মানুষ আর আপনাদের চিনব না? তা এখন কোথায় আছেন? অনেক কাল আপনাকে দেখিনি। বিয়ে'থা করেছেন বাবু? ছেলেপিলে হয়েছেন?

আমি আমার সব খবর মোটামুটি তাকে দিয়ে জিগ্যেস করলাম—তোমার সব খবর ভাল? আছ কেমন? তোমার ছেলেটি এখন কি করে—

লোকটা চুপ করে থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বাবু, সে নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—তোমার ছেলেটি নেই! মারা গিয়েছে? কতদিন হল?

ফিরিওয়ালার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ময়লা কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে বললে—বাবু, তার কি হয়েছে তা যদি জানতাম, তা হলে তো মনটা শান্ত হত। আর বছর মাঘ মাসে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল বৌবাজার বাব বলে। বৌবাজারে আমাদের দেশের একজন লোকের মুদিখানার দোকান আছে। সেই যে বাবু গেল, আর এল না।

—খুঁজেছিলে?

—খোঁজার কি কিছু বাকি রেখেছিলাম বাবু? সব হাসপাতাল সব জায়গা খোঁজ করেছিলাম—কোন সন্ধান নেই। এখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি বাবু। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব—কাল থাকবেন?

পরদিন সকালে ফিরিওয়ালা আবার এসে আমার ঘরের দোরের সামনে দাঁড়াল। বললাম—এস, ঘরের মধ্যে এস, কেউ নেই—কি কথা বলবে বলছিলে?—

—বাবু, আপনি একটু খবরের কাগজে লিখে দেবেন ছেলের কথাটা? আমায় লোকে বলে তুমি কাগজে লিখে দাও, তা হলে ছেলে পাওয়া যাবে। দেবেন লিখে বাবু?

কোথায় কি লিখে দেব বুঝতে পারলুম না। এতদিন পরে লিখে দিলেও যে বিশেষ কোন ফল হবে, সে সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবুও পুত্রশোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্লুম, আচ্ছা, তুমি বলে যাও, আমি লিখে নিই। কি রকম দেখতে ছিল তোমার ছেলে? বয়েস কত?

কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি নিজের খরচে দু'তিনখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেলুম। বাবা মণী, ফিরে এস, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, যদি শেষ দেখা করতে চাও—

ইত্যাদি।

এর ফলাফলের কথা আমি কিছু জানিনে—কারণ তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি আবার কলকাতা থেকে চলে গেলাম।

পুনরায় কলকাতায় ফিরলুম দু-বছর পরে।

কলকাতায় এবার এসেছিলাম খুব অল্পদিনের জন্যে, আগের সেই মেসটাতেই উঠেছিলাম—কিন্তু ফিরিওয়ালাকে এবার আর দেখলাম না সেখানে, তার কথা যে খুব মনে ছিল, তাও নয়।

নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরতাম, অন্য কারও কথা ভাববার অবকাশ ছিল কোথায়?

হয়তো বা ওকে দেখলে সব কথা মনে পড়ত, কিন্তু তা হয় নি।

তারপর আবার চলে গেলুম কলকাতা থেকে।

বিদেশে থাকবার সময়ে অবসর সময়ে আমার মাঝে মাঝে দু-একবার ফিরিওয়ালা ও তার ছেলের কথা মনে হত—তারপর একেবারে ভুলে গেলাম।

ন-বছর পরে বিদেশে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এসে কলকাতাতেই চাকুরির খোঁজে এলাম, মাস কয়েক পরে একটা চাকুরি পেয়েও গেলাম।

মেসেই থাকি। পূর্বে যে অঞ্চলে থাকতাম, সেই অঞ্চলে বটে, তবে অন্য বাড়ীতে। হঠাৎ একদিন দেখি সেই ফিরিওয়ালা। সেই চেপ্টা ধরনের হাঁড়িতে ক্ষীরমোহন ভরা, আগেকার মতই। ওকে দেখে কি জানি কেন, আমি হঠাৎ বড় খুশী হয়ে উঠলুম। এই যে মেসে এসে উঠেছি এখানে সবাই অপরিচিত, এদের সঙ্গে আমার মনের কোন যোগই নেই কোন দিক দিয়ে। এই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিড়ের মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার বহুকাল পূর্বের ছাত্রজীবনের সঙ্গে কেবল এই লোকটিরই যোগ আছে—আর কারও নেই এখানকার মধ্যে।

আমাকে কিন্তু ও প্রথমটাতে আদৌ চিনতে পারেনি। আমার চেহারার অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল এর মধ্যে, বয়েসও হয়েছিল, হবারই কথা—আমার বর্তমান জীবন ও ছাত্রজীবনের মধ্যে কুড়ি-একুশ বৎসরের ব্যবধান।

এখনও লোকটা ঠিক সেই আগের দিনের মতই সেই একই ধরনের চেপ্টা হাঁড়ি মাথায় করে মেসে মেসে ক্ষীরমোহন ফিরি করে বেড়ায়।

ওকে ডাকলুম। ক্ষীরমোহন কিনে পয়সা দেবার সময় ও আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দু-একবার, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না।

আমি বল্লুম—কি, চিনতে পারো?

ফিরিওয়ালা হাতজোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তাই চেয়ে চেয়ে দেখছি, বাবুমশাই না?...তা এখন আর চোখে তেমন তেজ নেই আগেকার মত। এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু?

ফিরিওয়ালার চেহারার কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—মাথায় চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, মুখের চেহারা ঠিক তেমনি আছে।

বল্লাম—আমিও দেখছি—তোমার চেহারা রাখলে কি করে? কিছু বদলায়নি, মনে হচ্ছে যখন হ্যারিসন রোডের মেসে যেতে, সে যেন কাল্‌কের কথা।

ফিরিওয়ালা বল্লে—আর বাবুমশাই, চেহারা!

হঠাৎ মনে পড়ল ওর নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কথা। আগে মনে হওয়াই উচিত ছিল সেটা, কিন্তু তা হয় নি। একটু ইতস্ততঃ করে জিগ্যেস করলুম—হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার সেই ছেলেটি—

ফিরিওয়ালা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না বাবু, সেই যে চলে গেছে, সেই শেষ।

খুব দুঃখিত হলাম শুনে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাহলে কোন কাজ হয়নি!

—ছেলের বৌটি কোথায়?

—আমার কাছেই আছে বাবুমশায়, আর কোথায় যাবে?

—এখন আছ কোথায়?

—বেলেঘাটায় সেই বাসাতেই।

—তোমার স্ত্রী আছে তো?

—না বাবু—সেও আজ চারবছর হলো মারা গিয়েছে। ছেলের নিরুদ্দেশের পর তার শরীর সেই যে ভেঙে গেল, আর তো ভাল হয়নি। বাবু এসে পড়েছেন, ভাল হয়েছে—

—কেন বল তো?

—আমাকে কিছু সাহায্য করুন বাবুমশাই। বারো বছর হয়ে গেল, এবার খোকার কুশপুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধ করব। বিধেন নিয়েছি ভটচায্যি মশায়ের কাছ থেকে। আমার তেমন রোজগারপাতি নেই আজকাল—ভিক্ষেসিক্ষে করে ছেলের কাজটা করব—

ওকে একটি টাকার বেশী দিতে পারলাম না—নিজেরই চাকুরির অবস্থা সুবিধে নয়, মেসের খরচ চালানোই দুর্ঘট হয়ে পড়েছে।

দিন পনেরো পরে ফিরিওয়ালা এসে আমায় বল্লে—বাবু, আজ আমার ছেলের কাজ, আপনি একটু পায়ের ধুলো যদি দেন গরীবের বাড়ীতে, ছোট মুখে বলতে সাহস হয় না আপনাকে—আপনার দয়া—

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না—মন সরলো না। বহুদিনের যোগাযোগ ওর সঙ্গে। আমার ছাত্রজীবনের আমলের আর কোন পরিচিত লোক কলকাতায় নেই—এই ফিরিওয়ালা ছাড়া। যেতেই হলো।

ও একটা ঠিকানা আমায় দিয়ে গেল বেলেঘাটার—যে অঞ্চলে জীবনে কখনো যাইনি, যাবার প্রয়োজনও হয়নি এতদিন। একটা বস্তির খানকুড়ি বাইশ ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ওর ঘর খুঁজে বার করলুম। সামনে একটা ডোবা। সামনে একটা নীচু খোলার ঘরে ফিরিওয়ালা আমায় নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসালে। কেওড়া কাঠের তক্তপোশের ওপর পুরু করে বিছানা পাতা। আমি আসতে ফিরিওয়ালা যে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে ওর প্রত্যেক কথার মধ্যে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে তার প্রকাশ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ বাড়ীতে কতদিন আছ?

—আজ ত্রিশ বছর বাবু, এ বাড়ীতে আমার খোকা জন্মায়—

তারপর সে ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একবাক্স সিগারেট এনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বল্লে—নিন, বেশ আরাম করুন বাবু, গরীবের কুঁড়েয় যখন এসেছেন—

ওর হাব-ভাব দেখে মনে হবার কথা নয় যে আজ ওর পুত্রের শ্রাদ্ধ। যেন কোন উৎসব আনন্দের কাজ চলছে বাড়ীতে। আমার মনে কেমন সঙ্কোচের ভাব এল, আমি এসেছি বলে আমার খাতির করতে গিয়ে ওকে উৎসবের মতই আয়োজন করতে হয়েছে।

আমায় বল্লে—আমার খোকার যখন বিয়ে হয়, আজ অনেকদিন আগেকার কথা—তখন আপনাদের সেই পুরোনো মেসের রমেশবাবু, হরিধনবাবু, গোপালবাবু, সতীশ-বাবু, ওঁরা সব এসে এই ঘরে এই তক্তপোশেই বসেছিলেন। বড় ভাল লোক ছিলেন ওঁরা। রমেশবাবু ওইখানটাতে বসে চা আর খাবার খেলেন, আমার আজও মনে আছে। সতীশবাবু বল্লেন—ওহে, গরম গরম লুচি নিয়ে এস তো? আমি তখন খোলা চড়িয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে আলাদা করে গরম লুচি ভাজাই—খেয়ে তাঁদের কি ফুর্তি বাবু-মশাই! বল্লেন—বেশ করেছ, বেশ করেছ—আহা কি সব লোকই ছিল তখন। পান এনে

দি বাবু, বসুন—

আমি সত্যিই অস্বস্তিবোধ করছিলুম। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল ওর ছেলের বিয়েতে সেদিন—বহুবছর আগের কথা—বিশ-বাইশ বছর হবে, সে কথা আমার মনে ছিল না, আজ ওর কথায় মনে হল—

তখন কেন আসা হয়নি জানিনে—এতকাল পরে সেই ছেলের শ্রাদ্ধতে এসেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

লোকটা কিন্তু আমায় নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি ওর বাড়ীতে এসেছি, এ যেন ওর কাছে মহাশুভ ঘটনা। বার বার সে আমার কাছে এসে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখতে লাগল। বিশ বৎসর আগে যখন আমার মেসের বন্ধুরা ওর বাড়ীতে এসেছিল ওর ছেলের বিবাহে, সেও ওর জীবনে দেখলুম এক অতি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে—ঘুরে-ফিরে বার বার ও সেই কথাই পাড়তে লাগল।

—রমেশবাবুরা এলেন, তা আমি ওঁদের জন্যে সব আলাদা বন্দোবস্ত করেছিলাম। ফিরিওয়ালার কাজ করি বটে বাবু, কিন্তু আমি মানুষ চিনি বাবুমশাই। হরিধনবাবু বল্লেন—তুমি ক্ষীরমোহন বিক্রী কর, তোমার ছেলের বিয়েতে আমরা পেট ভরে ক্ষীর-মোহন খাব। নিয়ে এস ক্ষীরমোহন। আমি বড় হাঁড়ির এক হাঁড়ি ক্ষীরমোহন ওঁদের জন্যে আলাদা করে রেখেছিলাম। সতীশবাবু, রমেশবাবু খেয়ে খুব খুশী—তার পরের হপ্তায় সতীশবাবু আমায় পাঁচ সের ক্ষীরমোহনের অর্ডার দেন, বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে—

আমি বল্লাম—বিশ বছর আগেকার কথা তোমার এত খুঁটিনাটি মনে আছে?

ফিরিওয়ালা বল্লে—তা থাকবে না বাবু? আপনারা তো আমার বাড়ীতে রোজ রোজ পায়ের ধুলো দিচ্ছেন না। জন্মের মধ্যে কর্ম একটা দিন। তা মনে থাকবে না!

আর কিছুক্ষণ পরে আমি আরও গোটাদুই পান খেয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, ফিরিওয়ালা জিভ কেটে বল্লে—তা কি হয় বাবু? এসেছেন যখন তখন—

আমি বল্লাম—না, শোন। আমি কিছু খেতে পারব না আজ—এ যদি আনন্দের কাজ হত আমি—

—ও কথাই মুখে আনবেন না বাবু। আপনারা আমার মা বাপ—আমার খোকার সদ্‌গতি হবে না আপনি আজ এখানে সেবা না করলে—ব্রাহ্মণ দেবতা আপনি—

অগত্যা কিছু খেতেই হল।

পাশের ঘরে আমার জন্যে পরিপাটি করে খাবার আসন পাতা। একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বিধবা যুবতী আধ-ঘোমটা দিয়ে আমায় খাবারের থালা দিতে এল।

ফিরিওয়ালা বল্লে, এই আমার বৌমা। গড় কর বৌমা, ওঁদের খেয়েই আমরা মানুষ—ব্রাহ্মণ দেবতা—

বৌটি গলায় আঁচল দিয়ে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

ফিরিওয়ালা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বল্লে—বৌমা বড় ভাল মেয়ে মশাই। খোকা যখন আমায় ছেড়ে পালাল, তখন বৌমার কাঁচা বয়েস, এই আঠারো কি উনিশ। সেই থেকে এই সংসারেই আছে, গরীবের সংসার, কখনো ভাল মন্দ খাওয়াতে পরাতে পারিনি। মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে। আমার পরিবার ওর ওপর একটু অত্যাচার করত, মিথ্যে কথা বলব না, দেবতা আপনারা। বলত, তুই অলুক্ষুণে বৌ ঘরে এলি, আর ছেলে আমার দেশছাড়া হল। একদিনের জন্যেও বৌমা ব্যাজার হয়নি সে সব শুনে। এখন তো আর কেউ নেই—ও আছে আর আমি আছি। ওই আমার মা, ওই আমার মেয়ে—

ফিরিওয়ালার পুত্রবধূ ইতিমধ্যে দই আনতে গিয়েছিল বাড়ীর মধ্যে।

আমি বল্লাম—তোমার বৌমা বরাবর তোমার কাছেই আছে?...বাপের বাড়ী কোথায়?

সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত আছে তো?...

—কোথায় বাবুমশাই? ওর তিন কুলে কেউ নেই। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, বয়েস হয়েছে, আজ যদি চোখ বুজি, আমি তো বেশ যাব, পুত্তুরশোক জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু বৌমার কথা যখন ভাবি, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কার কাছে রেখে যাব ওকে, সোমত্ত বয়েস, এক পয়সা দিয়ে যেতে পারব না। কখনো ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা দেয় নি—কি খাবে, কোথায় যাবে!

—ও কি বাবুমশাই, তা হবে না, ও কখনো ফেলে উঠতে পারবেন না, খেতেই হবে।

আহারাদি শেষ করে চলে আসবার সময় বিধবা মেয়েটি পান এনে রাখলে সামনে। তারপর আবার তার শ্বশুর ও সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

এরও বহুদিনখানেক পরে পর্যন্ত ফিরিওয়ালা নিয়মিত ভাবে আমাদের মেসে খাবার ফিরি করতে আসত। তারপর গত বৎসর পুজোর ছুটির আগে থেকে ও আর এল না। এখনও পর্যন্ত আজকদিনও আর তাকে দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে লোকটার কথা মনে হয় —বেঁচে আছে না মরে গেল! খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল অবিশ্যি—কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি।

চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের স্যুটকেস হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসত হইতে শিয়ালদ' পর্যন্ত 'তাঁতের মাকুর' মত যাতায়াত করিয়া ও ক্রমাগত 'দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি এক কথায় যত রকম ব্যথা, শূলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—' বলিয়া চিৎকার করিয়াও চাকুরী রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণলালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেন নি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনার ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট।

—দেখুন, আগেও আমি অন্ততঃ সতেরো বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা

—বেলায় তা কি হবে? চাক্‌রীটা গেল আজ।

—সে কি! এতদিনের চাক্‌রীটা—

—কত করে বললুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ? গরীবের কথা কে রাখে বলো!

—হয়েছিল কি?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে তুমি ক্যাশ ভেঙেচ।

—তাই তো...তাহোলে এখন উপায়?

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে।

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস্ হোটেল হইতে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী—

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরনে আধময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ী, হাতে গাছকয়েক কাঁচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বছর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন আর তাহার কি আছে? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যানভাসারের পদে বাহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়ীতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর তখন বয়স ষোলো-সতেরো। রূপ দেখিয়া রাস্তার লোকে চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মা'র হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা—গোলাপীর ঘরে মেহগ্‌নি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাঁচবসানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা, আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের সুরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ী তার নিজের না হ'লে চলে না আর—তা তেমন কপাল কি—এই এক বাড়ীতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—

—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ি এ পাড়াতেই আছে—তাহ'লে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওলো, একটু রয়ে সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায় বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক'দিন বললাম একখানা ঢাকাই শাড়ী, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানো, তা বুড়ো মড়া আজ সাত মাস ঘুরুচ্চে—আজ এলে হয় একবার—ওর দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়ী? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ী, চেয়ার,

ট্রেন দশটা একুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে বসে ছিলাম শুধু আপনার জন্যে। নিতাই দু'বার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে এসেচে। লেট এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরনো কথা। ও কথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেচেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুশকিল হয়েচে, আচ্ছা আসি—

—যান আসুন—

কৃষ্ণলাল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নিত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হ'ল!

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যানভাসারের কাজ ক'রে। জানেন না যে ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েচে বলুন দিকি? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরোনো ক্যানভাসার ব'লে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেচি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক'দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজি হয় নাই—নৃত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নৃত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্তাকে গিয়া পর্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না।

মুশকিল এই, চাকুরী যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতই তার গতিপথ নির্মম, ধরাবাঁধা!

সুতরাং চাকুরী গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে। স্নান-আহার হয় নাই।

২৫/২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাঠকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগার নির্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতেরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্ট ঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেজের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন রুমমেট্ ট্রামের কণ্ডাক্টার, সাড়ে চারটার পর সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘণ্টার জন্য বাসায় আসে এবং তারপরেই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস্ হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে বলিল—এত বেলায়?

এমন কি শেষে কলের গান পর্যন্ত। কোন্ সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ী করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ী) কালীঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেখে নাই তার আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল—রেলগাড়ীর কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত-আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে এই বাড়ীটিতে থাকিতে হয়। তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাক্‌রীটা গেল!

গোলাপী বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি গা!

—বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা?

—খরচ হয়ে গেল!

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল? তোমার এখনও দোষ গেল না তা ওরা কি করে রাখে তোমায়? কাল কোথায় গিয়েছিলে?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বর সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি? রাত দশটার পরে ইস্টিশানের গেটে আমায় ধরেচে। রূপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে নাকি? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে, না হয়নি? আমার অদেষ্টে ঝি-গিরি নাচ্‌চে সে তো দেখতে পাচ্চি। তখন বল্লু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দু'জনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কলকেতা আর কলকেতা! কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবো নি। এখন থাকো কলকেতায়? কে এখানে খাওয়ায় দেখি।

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাক্‌রী নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে! এখন আর কি তোমার হাত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত বেদনা মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক্ গো গোসাঁই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না,

সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন!

—তাহ'লে বল চাক্‌রীতে নেবে কিনা?

—নেবে না আবার? একশো বার নেবে—আমি যাই এখন ঝি-গিরি ক'রে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে! কি অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম!

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—ব'সো, দুটো মুড়ি-টুড়ি মেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহ'লে বক্তৃতা এখনও দিতে পারি, কি বলো?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মত কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের, ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মত নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়ে বললে—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হ'ল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম ক্যান্‌ভাসার—হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না!

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বের্দ্দ বয়েসে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনারবেনেদের ঠাকুরবাড়ীতে একটা ঝিয়ের দরকার, সকাল-সন্ধ্যে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমার বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগার এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহ'লে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধ্যের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন আর তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছিল দু'মাসের, মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু, আমাদের রেণ্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্চেন—চাক্‌রীটা গেল, হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া যোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে? দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা

দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিনদিন কাটিয়া গেল, দু'একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু'চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল-ভাতে কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু' পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সঙ্গে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্মল জল।

মেসে ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন। বলিলেন—কিছু হ'ল?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবছি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু' মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেরও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন? আপনি জিনিসপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র সমেত (একটা টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা) কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিসপত্র রাখিবার মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায়? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে—মধ্যে একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাহিরের ফুটপাতে বসিয়া ছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না)—কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ী গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিসপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলাল জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার স্টীমারঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সায় একটা ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়।

এই সময় একটি ছোকরা ব্যাগহাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেন্ট-বাঁধানো রানার উপর পাতিল। বসিতে যাইবে এমন সময় ছোকরা হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিক চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে ব্যাগটা দেখবেন? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ করিয়াছিল, ছোকরা একজন ক্যান্‌ভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যান্‌ভাস করেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস?

—হাতকাটা তেল—সার্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোকরা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের

সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি। লাগে না?

ছোকরা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কান্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এ কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পৌঁছিতে বেলা তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূরসম্পর্ক জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখাশোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিন টেকে? আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পূর্বে দু পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই—এখানকার লোকে কথাবার্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল—রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এরই মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহারা চড়কতলার ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দুটি মুখে দিতে না দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু'পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা...এ দোকানে ও দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া... চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘণ্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়! কয়েক বাড়ী যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু-একটা কথা বলো, গল্প করো—এক আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা, সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরণের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলার কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পুব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে।

ওপরের তিন তলায় তিনটি মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্মব্যস্ত, ঘড়ি ধরিয়া কাজ কলিকাতায়. 'সময় গেল। ছ'টা বাজে, কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে.....এখনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে না বাজিতে, এতটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়াল-দ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল,.....শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! যত প্রকার বাত, ফুলা, শুলানি, কনু-কনানি, মাথা ধরা পেটবেদনা, ইহার একমাত্র ব্যবহারে ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে,—এই চলিল বেলা বারোটা পর্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কি জীবন! কি আনন্দ! কি পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে. রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায. যে পয়সা আয় করিতে জানে, সে-ই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ্য, কখনো পা গুটাইয়া কর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোনো উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটে আর চাকুরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যান্‌ভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া.....তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যান্‌ভাসারের চাকুরীর মত সম্মানের চাকুরী, আরামের চাকুরী আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মানসম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাইয়া জীবন ধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু'-এক বিঘা ধান করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মান-কচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল নাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরণের, সেখানে ক্যান্‌ভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর ধরিয়া কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে।

ট্রেনে পুরানো ক্যান্‌ভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়. কবিরাজ অনঙ্গ-মোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানী—ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ফার্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে।

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়েথাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন্ কোম্পানীতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই তো, থাকলেই দেখে—আমাদের কোনো চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানী, হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু'শো টাকা বছরে আয়ের সম্পত্তি? বলো কি! তবে তো তুমি—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরাতন বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল সুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল যে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে, পয়সা রোজগার আছে, তার পর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া। মরিতে হয় এখানেই মরিবে।

পনেরো বিশ দিন এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকুরী মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোকরা ক্যান্‌ভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা পায়ে, থিয়েটারের রামের মত গলা, এই সবাই চায়; বয়স হইয়া গেলে—মানে, এখন উঁহাদের লোক আছে, দরকার হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু'দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরি-টোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার স্টীমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যান্‌ভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যান্‌ভাসারেরা তাহাকে—কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে!

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট স্যুটকেস্‌টি হাতে লইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া ক্যান্‌ভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চা রাখা দরকার তো বটেই, তাছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন্‌ ছোকরা ক্যান্‌ভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।—দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁতশূলানি, হাতবেদনা, পিঠ-বেদনা.....ভদ্রমহোদয়গণ। এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে...

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ ছয় পরে সগর্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমায় একটা ছোট ফাইল!—

কৃষ্ণলাল গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা একশো ছয়ের সি হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের অফিসে.....আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্চি—

দিন পাঁচ ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ স্যুটকেস্‌ হাতে ঝুলাইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। অফিস ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শোনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। বসু মহাশয় বলিলেন, এ কি হচ্চে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল আজ্ঞে আজ্ঞে একবার চর্চ্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাই তো বলি এ কি কাণ্ড! গত দিন পাঁচ-ছ'য়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের স্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো কি দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক'মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো এই ডাল্ সিজন্ যাচ্চে, আমি তো অবাক : সবাই বলে নালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে.....আমি বলি আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি, আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যান্‌ভাসারদের মত থিয়েটারী রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই অফিসে আসুন এক্ষুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যান্‌ভাসার য়্যাপয়েন্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক ক'রে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চ'লে আমার গাড়ীতে—

সন্ধ্যাবেলা।.....নবীন কুণ্ডুর লেনে খোলার ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্তাকাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল—গোলাপী ও গোলাপী, বাইরে এসে এই জিনিস-গুলো ধরো দিকি। হাত ভেরে গিয়েচে—

পারমিট

আজই সেই আশ্চর্য ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটেচে।

এমন সব অত্যাশ্চর্য কাণ্ডও মানুষের জীবনে ঘটে যায়! বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখনও ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়চি এক-একবার।...

ভাদ্রের ভরা নদী। উভয় তীরের বনভূমির শাখা প্রশাখা জলের ওপর নত হয়ে আছে, এক এক জায়গায় জলমগ্ন নল-খাগ্‌ড়ার বন নদীর স্রোতোবেগে থরথর করে কাঁপচে। এমনি এক স্থানে জলের ওপর কলমি শাকের দাম দেখে নৌকার মাঝি সয়ারাম শাক তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নৌকা থামিয়ে। আমার সঙ্গী নকুড় চক্কত্তি তাকে বকচে—সন্দে হবে, ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে শাক তুলতে।

নৌকো থেমে দাঁড়িয়ে জলের আবর্তে পাক খাচ্চে।

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—একটা বিড়ি খাওয়া যাক, কি বলো হে?

আমার ওসব দিকে তত মন ছিল না। তবুও কলের পুতুলের মত ওর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালুম। নকুড় চক্কত্তি জলের ধারের ধানগুলো সম্বন্ধে কি যেন বলচে। একবার সে বল্লে—যাক, একটা কাজের মত কাজ হয়েচে। ধানটা খুব জোর পাওয়া গিয়েচে। তুমি না গেলে হাকিম কি ধান দিত? হাকিমের স্ত্রী তোমায় চেনে নাকি? ও না থাকলে আজ ধান হ'ত, না ছাই হ'ত!

আমি অন্যমনস্ক ভাবে বল্লাম—হ্যাঁ।

গল্পে এমন ঘটনা অনেক পড়া গিয়েচে—কিন্তু বাস্তব জীবনে ক'টা ঘটে তাই ভাবচি।

একটাও না, অথচ সন্দে পড়লে হয়তো মনে হবে, এমন গল্প অনেক পড়া গিয়েচে। জীবনের অলিখিত কাব্যে কত অধ্যায় কত ঘটনা—এর পাঠক কে, না যে সে জীবন যাপন করচে। বহির্দেশে দণ্ডায়মান বিরাট জনতা উৎসুখ শ্রোতা হতে পারে, দর্শক হতে পারে কিন্তু রসিক সমঝদার মাত্র, তার বেশি নয়।

বাগজোলার খালের মধ্যে দিয়ে জলের তোড় মাঠের দিক দিয়ে দু'ধারের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এসে নদীতে পড়চে। জলের তোড়ে একটা প্রকাণ্ড জগডুমুর গাছ শেকড় ছিঁড়ে জলে ঝুঁকে পড়ে আছে। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—দ্যাখো তো বাবা সয়ারাম, গাছটাতে যদি কচি কচি ডুমুর পাওয়া যায়। নৌকোটা একটু থামিয়ে পাড় দিকি দু'টো—তরিতরকারির যা দাম, তবুও দু'টো ডুমুর নিয়ে গেলে কাজ হবে—ধানটা পেয়ে বড্ড সুবিধে হয়েচে—কি বলো রামলাল?

আমি বল্লাম—হ্যাঁ।

—তোমার আজ হয়েচে কি হে? কোনোদিকে যেন মন নেই—

—যা হয়েচে তা হয়েচে, ধান পেয়েচ তো?

—ওঃ—দশ টাকায় এক মণ ধান; এ না পেলে তোমার আমার মত লোকের—

নকুড় চক্কত্তির কথাটা আমার মনে লাগলো বটে কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের মত অবস্থার লোকের কি অবস্থা হ'ত আজ যদি সুবিধে দরের ধান পাওয়া না যেতো। অথচ আজ নকুড় চক্কত্তি নিজের নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়ালে শুনে মনের মধ্যে খচ্ করে উঠলো কোথায়।

অনেকদিন আগের কথা। আমার পিসিমার বাড়ী বামুনহাটি থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি কলেজ থেকে বেরিয়েচি চার পাঁচ বছর, কিন্তু তখনও কলকাতায় থাকি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই চিরকাল মন। এক মাড়োয়ারী ফার্মে কাজ শিখি। এগারো মাইল রাস্তা মেঠো পথ। হেঁটে আসতে আসতে কাপাসীপাড়ার হাটতলায় বাঁধানো পুকুরের চাতালে বসে একটু বিশ্রাম করচি এমন সময় খুব ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দু'টি লোককে আমার দিকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্য হ'লাম।

লোক দু'টির মধ্যে একজন ভট্‌চাজ বামুন, মাথায় টিকি, ফর্সা রং, গায়ে সাদা উড়ুনি। অন্য লোকটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের ছোকরা মাত্র। দু'জনেই খুব ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে হাঁপাতে যেন অনেক দূর থেকে আসচে। ভট্‌চাজ মশায় আমার কাছে এসে বল্লেন—ওঃ, ছুটতে ছুটতে এসে ধরেচি। পাওয়া গিয়েচে শেষকালে। তোমার পিসিমার বাড়ী গিয়ে শুনি তুমি আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েচ—তখুনি রমেশকে বল্লাম, পা চালা, রমেশ। ধরতেই হবে পথে।

আশ্চর্য হয়ে বল্লাম—ব্যাপার কি? আপনারা আমায় খুঁজচেন?

—হ্যাঁ, বাবাজী হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই আগে—

মনে মনে ভাবচি এমন তো কোথাও চুরি বা খুন করে পালাচ্চি নে, তবে এরা এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার পেছনে ছোটে কেন? কিন্তু কিছু পরেই ভট্‌চাজ মশায় আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন। আমায় বল্লেন—তোমায় এখুনি যেতে হবে বাবাজী। এই পাশেই গ্রাম, সীতানাথ বাবুর নাম শোনোনি? এ অঞ্চলের জমিদার। তোমার সঙ্গে তাঁর এক মেয়ের সম্বন্ধ আমিই প্রস্তাব করেচি। তুমি এসেচ খবর পেয়ে তোমার পিসিমার বাড়ী দৌড়েছিলাম। এটি আমার ভাইপো।—

এতক্ষণে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু সবটা নয়। বল্লাম—কিন্তু আমি সেখানে যাবো কেন হঠাৎ?

—মেয়ে দেখতে, মেয়ে দেখতে। তাঁরাই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমায়। সীতানাথ বাবু বল্লেন—নিয়ে এসো তাঁকে।

—তিনি কি করে জানলেন আমি পিসিমার বাড়ী গিয়েচি—

—তোমার যাবার দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম বাবাজী। সেদিন হাটে তোমার পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি বল্লেন, তুমি ওখানেই আছ। আমি এসে সীতানাথ বাবুকে বলতেই তিনি বল্লেন, নিয়ে এসো, মেয়ে দেখে যান তিনি।

আমার মনের খট্‌কা গেল না। কোথাও কিছু ভুল হয়ে থাকবে হয়তো। আমি বিবাহ করার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। আমার পিসেমশায়ের বাড়ী দু'বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই, তিনিই বা কি করে জানলেন আমি বিয়ে করবো কিনা।

হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল হ'ল। এমন ভাবে রাস্তা থেকে ডেকে কেউ আমাকে কখনো মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায় নি। সীতানাথ বাবু কেমন জমিদার, কেমন তাঁর মেয়ে, এ আমায় দেখতে হবে।

ওরা দু'জনে আমায় নিয়ে পাশের এক রাস্তা ধরলে। সে রাস্তার দু'ধারে ঘন বাঁশবন, কাপাসীপাড়ার কুম্ভকার পাড়া ছাড়িয়ে একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে কাদের একটা সাদা রংয়ের বাড়ী। ভট্‌চাজ মশায় বল্লেন—ওই হ'ল রায়দের বাড়ী—এ অঞ্চলে নামডাক আছে ওদের। বংশও খুব ভালো...নাম শোনো নি?

আমি বিনীতভাবে বল্লাম, আমার এ অঞ্চলে তত বেশি যাতায়াত নেই। কাজেই অনেক লোকেরই নাম শুনি নি।

একটা সাবেক আমলের বড় বাড়ীর সামনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীটা দেখেই বুঝলাম এক সময়ে এ বাড়ীর মালিকেরা দেশের জমিদার ও শাসক ছিল, যদিও এখন এদের সে অবস্থা নেই। থাকলে রাস্তা থেকে ডেকে এনে আমায় মেয়ে দেখাতো না।

একটি বেশ সুন্দর মত ছোকরা আমাদের ডাক শুনে বাইরে এল, তারপর এলেন কর্তা স্বয়ং সীতানাথ রায়। আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার মধ্যে। খুব বড় সাবেকী বৈঠকখানা, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো, বড় বড় পুরোনো বিবর্ণ ছবি ভেতরে বাইরে ঝুলনো। বৈঠকখানার এক পাশের তক্তপোশের ওপর অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র—সেতার তানপুরা, ডুগিতবলা ইত্যাদি। মনে হ'ল সেগুলো ব্যবহার করবার লোক আছে এ বাড়ীতে। বেশ যত্নে তদ্বিরে গুছিয়ে রাখা। এক কোণে আট দশ গাছা বড় হুইলের ছিপ। ভট্‌চাজ মশায় আমায় দেখিয়ে বল্লেন—এই ইনিই, এঁরই নাম রামলাল চাটুজ্যে—

এমন কিছু বিখ্যাত লোক আমি নই, অথচ কথার ভাবে মনে হ'ল আমার সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েচে। সীতানাথবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনার পিসেমশায় ভবশঙ্কর বাবু [illegible] সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়। তিনি আমার সঙ্গে একবার আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি কোথায় পশ্চিমে চুনের ব্যবসা করতে—খুব ব্যবসার ঝোঁক আপনার। এই তো চাই বাঙালীর। চাকরি চাকরি করে দেশ উচ্ছ[illegible]

বিনীতভাবে বল্লাম—চুনের ব্যবসা করি নি, করবার চেষ্টায় গিয়েছিলাম বটে।

—কোথায় যেন সেই?

—আজ্ঞে পশ্চিমে, বিন্ধ্যাচলের কাছে। ঘুটিং পাথর কিনে পুড়িয়ে চুন করে, সে[illegible] বড় বড় ভাঁটি আছে চুন পোড়ানোর।

—এখন কি করা হয় আপনার?

—বিজনেস করি কলকাতায় এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আপনি পিসেমশায়ের বন্ধু, আমাকে—

—তা'তে কি তা'তে কি বাবাজী। ব্রাহ্মণসন্তান, কুলীনের সন্তান, সব নমস্য। কত বড় কুলীন বংশ আপনারা—

এইবার খানিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সীতানাথ রায় মশায় পুরাতন-

পন্থী লোক, এখনও কৌলীন্য মানেন, আমাদের কুলীন হিসেবে এক সময়ে বেশ নাম-ডাক ছিল বাবা বলতেন। এখন আর ওসব কে মানে বা গ্রাহ্য করে? তবে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে—

সীতানাথ রায় মশায়ের চেহারা আমার খুব ভালো লেগেচে। বেশ লম্বা, দোহারা, ফর্সা চেহারা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মুখশ্রীতে একটা সদানন্দ, উদার অথচ একটু যেন নির্বোধের ভাব। তা'তে মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে তাঁর দিকে। আমি নিজে তো ধূর্ত মানুষের চেয়ে নির্বোধ লোক ঢের বেশি পছন্দ করি।

আমায় বল্লেন—আমার বড় আনন্দ হচ্চে আপনি আজ এসেচেন আমার বাড়ী—বিয়ে হোক না হোক, সে ভবিতব্য। কিন্তু আপনার আসাতেই—

গ্রামের দু'তিনটি ভদ্রলোক, কেউ কোঁচার টিক গায়ে, কেউ একটা আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, এসে বৈঠকখানায় ঢুকে আমাদের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বসলেন অন্যদিকে। রায় মশায় বল্লেন—ওদিকে কেন, সরে আসুন, সরে আসুন—এই ইনিই রামলাল বাবু—আলাপ পরিচয় করুন—

কিন্তু তাঁরা নিতান্ত গ্রাম্য লোক, আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাদৃশ সাহস করলেন না বোধ হয়। একটু পরে তাঁদের একজন নিজেই তামাক সেজে টানতে লাগলেন। ভট্‌চাজ মশায়ও তামাক খাবেন বলে ওদিকে উঠে গেলেন। আমি আর রমেশ এদিকে বসে রইলাম। সীতানাথ রায় মশায় একটু পরে বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বল্লেন—চলুন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।—অজ পাড়াগাঁয়ে এইটিই বলা রীতি। একটু শহর-ঘেঁষা জায়গা হ'লে বলতো—চলুন, চা খাবেন।

বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হলঘর পার হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই বারান্দাওয়ালা কুঠুরির সারি। অনেকগুলি কুঠুরি, আট দশটার কম নয়, তারপর আবার খোলা রোয়াক, পূব পশ্চিমে লম্বা। তারপর চাতাল বাঁধানো উঠান পার হয়ে ওদিকের আর একটা বড় টানা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন জমিদার-বাটী বটে। ভেতরটা আগাগোড়া চকমেলানো. খুব উঁচু কার্ণিস-যুক্ত ছাদ—তবে সেকেলে বাড়ী, ছোট ছোট দরজা জানালা।

বারান্দায় আট দশজন লোকের প্রচুর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। সীতানাথ রায় মহাশয়ের প্রৌঢ়া গৃহিণী সকলকে লুচি পরিবেষণ করলেন—কারণ এখানে বাইরের লোকের মধ্যে এক যা আমিই আছি, আর সবাই এই গ্রামেরই লোক। আমার মনে হ'ল তিনি লুচি পরিবেষণের ছলে আমায় দেখতে এসেচেন এবং বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার দেখচেন।

জলযোগান্তে রায় মশায় আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বল্লেন—এসো বাবা এসো—

মনে হ'ল ঠিক যেন নিজের মা।

আমায় আর একটি বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গৃহিণী নিজে। বল্লেন—বড় কুলীন বংশ, যদি এখন আমার মেয়ের শিবপুজোর জোর থাকে—তোমরা পাঁচজনে আশীর্বাদ করো—

এঁরা আমার সঙ্গে যে অমায়িক, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন, শুধু এই সব পল্লী-গ্রামেই তার তুলনা মেলে। নিজে আমি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লাম এঁদের আত্মীয়তায়। জানালা দিয়ে চোখে পড়চে ওঁদের চকমেলানো ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া নারিকেল বৃক্ষের কম্পমান শাখা প্রশাখা।

একটু পরে বাইরের ঘরে মেয়ে দেখানো হ'ল।

মেয়ে সুন্দরী না হোক, বেশ দেখতে শুনতে। বড় ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয় বটে।

সীতানাথ রায় মশায় নিজে যত্ন ক'রে মেয়েকে গান বাজনা শিখিয়েচেন। বল্লেন—ভট্‌চাজ মশায়, বিনু আমার গান বাজনা জানে, সেতার বাজাতে পারে—সেটা একটু শুনতে উনি যদি চান—

আমি সলজ্জমুখে চুপ করে রইলাম। ভট্‌চাজ মশায় বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—বিনু দিদি, ধরো একবার সেতারটা—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে গিয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় বসে সেতার বাজালে, সীতানাথ রায় মশায় নিজে ডুগি-তবলা ধরলেন। আমি গান-বাজনার বিশেষ কিছু বুঝি নে, করি কয়লা আর চুনের আড়তদারি, তবুও মনে হ'ল মেয়েটি কাঁচা হাতে সেতার ধরে নি। সেতার নামিয়ে খানিক পরে যখন সে দু'টি গান গাইলে, তখন মেয়েটির কণ্ঠ-স্বর আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। তবে, ঐ যে বল্লুম, ও জিনিসের সমঝদার নই আমি।

সেই অপরাহ্নটি আমার জীবনের এক অদ্ভুত অপরাহ্ন বটে। দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়ী থেকে ফিরচি। থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়ীতে কালেভদ্রে তখন হাঁটাপথে এগারো-বারো মাইল পথ নানা ধরনের পাড়াগাঁ, বিল, বাঁওড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার প্রলোভনেই পিসিমার বাড়ী যাই—বিশেষ কোনো আত্মীয়তার টানে নয়।

সেই পথে ফেরবার সময়ে এ যেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কখনো শুনিনি যাদের নাম, তাদের বাড়ীতে এসে এমন অমায়িক ব্যবহার পাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রাচীন জমিদারবাড়ী, ওই ভাঙা পুজোর দালানের কার্ণিসে বটচারাটা, জানালার বাইরে ওই গোলার সারি, এই সুগায়িকা মেয়েটি—সব যেন স্বপ্ন। আমি জানি এ বিয়ে হবে না, বিয়ে করার ইচ্ছে নেইও আমার, থাকলেও উপায় নেই—ব্যবসা-জীবনের সবে আমার শুরু, এখন বিয়ে ক'রে নিজেকে সংসার-জালে জড়িত করতে চাই নে আমি। তা ছাড়া ওঁরা অনেক কিছু ভুল খবর শুনেচেন আমার সম্বন্ধে, এটা ওঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম। আমি সামান্যই ব্যবসা করি, তাও একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। সামান্য পুঁজির ওপর ব্যবসা—এমন কিছু আয় হয় না যা'তে কলকাতা শহরে বাসা ক'রে পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে থাকা যায়।

এমন সময় ভট্‌চাজ মশায় এমন একটি কথা বল্লেন যা'তে আমি একেবারে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন—বাবাজীর নিজের বাড়ী আছে কলকাতায়, নিজেই করেচেন—

রায় মশায় বল্লেন—হ্যাঁ, সে তো আপনি বল্লেন সেদিন—

আমি অবাক। ভট্‌চাজ মশায় জেনে শুনে মিথ্যে কথা বলচেন ঘটকালি অগ্রসর করবার জন্যে, না উনি আমার সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছেন?

আমি তখনি প্রতিবাদ করতাম কিন্তু হঠাৎ কেমন দুর্বলতা এসে গেল মনে। ওই যে মেয়েটি এখানে বসে আছে, ওর কাছে এখুনি এত খেলো হব কেন? বিয়ে হবে না জানি, মেয়েটি উঠে যাক—আমিও এখান থেকে চলে যাই—তারপর আমি যা করবো তা আমার জানাই আছে।

রায় মশায়ই বল্লেন—তা'হলে মেয়েটিকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে পারি?

অপরাধের বোঝা যথেষ্টই ভারী হয়েছে তাঁর কাছে আমার। আর নয়—আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে বল্লাম। একটু পরে এল বাড়ীর মধ্যে থেকে মেয়ের হাতের নানারকম সূচের কাজকর্ম—একটি রাশ। কত রকমের তুলোর কুকুর, পশমের আসন, রুমাল, টেবিল ঢাকা কাপড়, মাছের আঁশের হাঁস ফ্রেমে বাঁধানো—ইত্যাদি! একটি সুদর্শন ছোট ছেলের সঙ্গে একজন ঝি সেগুলো নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলে। গিন্নিমা নাকি সেগুলি পাঠিয়েছেন।

আরও আধ ঘণ্টা।

এইবার রওনা হতে হবে। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সীতানাথ রায় মশায় আমাকে প্রথমে কিছুতেই আসতে দেবেন না, রাত হয়ে আসচে—এখন তিনি আমায় ছেড়ে দিতে পারেন না। রাত্রে এখানেই থাকতে হবে।

আমি বল্লাম—কোন অসুবিধে হবে না, মঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভাড়া ক'রে চলে যাবো। সে ঘাট তো মোটে দু মাইল। জ্যোৎস্নারাত্রে বেশ চলে যাবো।

সীতানাথ রায় মশায় আমার সঙ্গে একাই খানিক দূর হেঁটে চললেন। বল্লেন—আপনাকে আর বেশি কি বলবো মেয়ে আমার বড্ড ভালো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

—আপনার মতামতটা যদি জানাতেন—

—সেটা আমার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবো, কারণ মামাই বলতে গেলে এখন অভিভাবক—

বলা বাহুল্য, যে মাতুলকে কর্মকর্তা নির্দেশ করলাম, তাঁর খবর পর্যন্ত রাখিনি আজ তিন চার বছর।

বল্লুম—তাহ'লে আপনি আর এগোবেন না—সন্দে হয়ে এল—

স্থানটি নির্জন। গ্রাম ছাড়িয়ে বড় একটা বিল ডান দিকে, সামনে ধু ধু মাঠের বুক চিরে সাদা বালির রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই।

রায় মশায় এদিক ওদিক তাকিয়ে সুর নীচু করে বল্লেন—যা'তে এ হয়, তা তোমাকে করতেই হবে বাবাজী। আমার স্ত্রীর বড্ড পছন্দ হয়েচে তোমাকে, আমায় ডেকে বলছিল। আর কি জানো, বাইরে ঠাট যতই দ্যাখো, তেমন অবস্থা তো আর নেই। তোমার মত সুপাত্র কোথায় পাবো। দেনা পাওনার জন্য কিছু আটকাবে না—তোমার কলকাতার বাড়ী সাজানো আসবাবপত্তর দিতে পারব না হয়তো, তবে মেয়ের গা সাজানো গহনা দেবো। ত্রিশ ভরি সোনা দেবো, ওর গর্ভধারিণীর যা আছে, তা দুই মেয়েকে তিনি ভাগ ক'রে দেবেন। তাহলে মনে থাকে যেন বাবাজী—

এই প্রথম তিনি আমায় ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করলেন!

চলে এলাম সেদিন এবং কয়েকদিন পরে কলকাতাতেও এলাম। তারপর আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি এ বিষয়ে। সীতানাথ রায় মশায় পত্র দিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন। বহু অনুরোধ করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত যদি আমি বিবাহ করি, উৎকৃষ্ট ধানের জমি মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন,—প্রায় পনেরো বিঘে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল আমায়। তিনি আগাগোড়া ভুলের ওপর যে বাড়ীর ভিৎ পত্তন করেছিলেন, সে ভিতের ওপর আমি বাড়ী তুলতে পারি নি।

সব কথা খুলে বলি নি কেন?

তখন বয়স ছিল কম। গর্বে বাধে, মুখ ছোট হয়ে যায়। এখন হ'লে সব খুলে বলতাম, তখন তা পারি নি।

এখন দেশেই আছি। এই যুদ্ধের বাজারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো বড়ই কষ্ট। ব্যবসা অনেকদিন নষ্ট হয়ে গিয়েচে—বন্ধুই হ'ক আর যে-ই হ'ক ভাগে ব্যবসা না করাই ভালো—এই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ক্রয় করতে হয়েচে অতি কষ্টে উপার্জিত হাজার সাতেক টাকার বিনিময়ে।

সেদিন প্রভা বল্লে—সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি ক'রে এই পুরীপাল্লা চালাবো। সস্তায় নাকি কণ্ট্রোলের ধান দিচ্চে মহকুমায়—চেষ্টা দেখো না?

তাই আজ ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছি মহকুমায়। ধান সস্তায় দেবার মালিক এক

বড় অফিসার, তিনি কলকাতা থেকে এসে দিন পনেরো আছেন। তাঁর আরদালি ক'দিন ফিরিয়ে দিয়েচে।

আজ নকুড় চক্কত্তি বল্লে, এমনি না হয়—একজন উকিল ধরে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিতে হবে! রোজ হেঁটে আর পারিনে—

তাই দু'জনে মিলে একখানা নৌকো ভাড়া করে এসেছিলাম।

বেলা দশটার সময় হাকিমের বাসার ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। এমন সময় হাকিমের ছোক্‌রা আরদালিকে আসতে দেখে তাকে বল্লাম—ওহে শোনো, আমাদের দরখাস্তখানা নিয়ে যাও না সাহেবের কাছে?

হাকিম বাঙালী হলেও তাঁকে সাহেব বলাই নিয়ম।

লোকটা ইতস্তত করচে দেখে নকুড় চক্কত্তি তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে বল্লে—পান বিড়ি খেয়ো। আমরা গরীব লোক, নিয়ে যাও দরখাস্তখানা, আজ ন'দিন হাঁটাহাঁটি করচি। ধান মঞ্জুর হ'লে তোমায় আরো কিছু দেবো—

আরদালি কি ভেবে দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল।

দু' ঘণ্টা কারো দেখা নেই—কেউ ডাকে না। সাহেব তো দূরের কথা, আরদালিরও চুলের টিকি আর দেখা যায় না। নকুড় চক্কোত্তি বলে—কি ব্যাপার হে, দু' আনা পয়সাই গেল এ বাজারে—থাকলে তবুও ছেলেপিলের জন্য দু'খানা কুচো গজা টজা নিয়ে গেলে—

এমন সময় সেই ছোকরা আরদালি বারান্দায় বেরিয়ে বল্লে—রামলালবাবু কার নাম?

নকুড় চক্কোত্তি বল্লে—যাও হে, তোমার ডাক পড়েছে—দেখে এসো—আমার কথাটাও একটু ব'লো। না খেয়ে মরে যাবে ছেলেপিলে—

বারান্দা পার হয়ে সামনের সাজানো মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকেই আমি সামনে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে চমকে গেলাম। থতমত খেয়ে সরে যাব কি না ভাবচি, এমন সময়ে মেয়েটি হাত তুলে আমায় নমস্কার করলে। আমি আরও থতমত খেয়ে গেলাম।

হাতের একখানা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বল্লে—এ দরখাস্ত আপনি করেচেন? আমি আপনার নাম দেখে বুঝেচি আর গ্রামের নাম দেখে—আমায় চিনতে পারলেন না?

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মেয়েটির দিকে ভালো করে চাইলাম। কোথায় যেন দেখেচি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেচি।

মেয়েটি মৃদু হেসে বল্লে—আমাদের বাড়ী আপনি গিয়েছিলেন—আমার বাবার নাম শ্রীসীতানাথ রায়, কাপাসীপাড়া—

আমার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই সেই স্মৃতি, সীতানাথ রায়ের মেয়ে।

মেয়েটি আবার বল্লে—আমি আপনাকে আরও দু'দিন দেখেচি। দেখেই চিনেছিলাম, একটু সন্দেহ ছিল—আজ দরখাস্তে আপনার নাম দেখে আর সন্দেহ রইল না। উনি একটু বিশ্রাম করচেন। আপনার দরখাস্ত ওঁকে বলে মঞ্জুর করিয়েচি—নিয়ে যান। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েচে আগেকার চেয়ে। একটু চা খাবেন?

আমি যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বল্লাম—না—না—এখন থাক—

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—এবার এখানে এলে কিন্তু আবার দেখা করবেন। ওঁকে বলেচি আমার বাপের বাড়ীর দেশে আপনার পিসিমার বাড়ী। অবিশ্যি আসবেন, চা খাবেন সেদিন—

আমি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বার হয়ে এলাম। সস্তায় দু'মণ ধানের পারমিট পেয়েছি। স্ত্রী পুত্র এখন দু'মাস খেয়ে বাঁচবে।

শারদীয়া যুগান্তর ১৩৫১

ওর ভাল নাম বোধ হয় ছিল নিস্তারিণী। ওর যৌবন বয়সে গ্রামের মধ্যে অমন সুন্দরী বৌ ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেও ছিল না। ওরা জাতে যুগী, হরিনাথ ছিল স্বামীর নাম। ভদ্রলোকের পাড়ায় ডাকনাম ছিল, 'হরে যুগী'।

নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রী ক'রে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট মনোহারি জিনিসের ব্যবসা করে। রেশমী চুড়ি ছ গাছা এক পয়সা, দু'হাত কার এক পয়সা—ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে মনে হ'ল 'কার' মানে ফিতে বটে ; কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ নেই, হিন্দী বা উর্দুতে নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি। যাক্ সে। হরি যুগীর বাড়ীতে দুখানা বড় বড় মেটে ঘর, একখানা রান্না-ঘর, মাটির পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। অনেক পুষ্যি বাড়ীতে, দু'বেলা পনেরো ষোলোখানা পাত পড়ে। হরি যুগীর মা, হরি যুগীর দু'টি ছোট ভাই, এক বিধবা ভাগ্নী, তার দুই ছেলে-মেয়ে। সংসার ভালোই চলে, মোটা ভাত, কলাইয়ের ডাল ও ঝিঙে ও লাল ডাঁটা চচ্চড়ির অভাব কোনদিন হয়নি, গোরুর দুধও ছিল চার পাঁচ সের। অবিশ্যি দুধের অর্ধেকটা ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দিয়ে তার বদলে টাকা আসতো।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বৌ-ঝির কথা উঠলে সকলেই বলতো—'হরে যুগীর বৌয়ের মত প্রায় দেখতে'। গ্রামের নারী-সৌন্দর্যের মাপকাঠি ছিল নিস্তারিণী। গেরস্তঘরের বৌ, স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে ঘড়া কাঁকে নিয়ে যখন সে গাঙের ঘাট থেকে ফিরতো, তখন তার উদ্দাম যৌবনের সৌন্দর্য অনেক প্রবীণের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিত।

এ গ্রামে একটা প্রবাদ আছে অনেকদিনের।

তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠীর ওদিক থেকে ঘোড়া ক'রে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁত ফুলের মাদকতাময় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁকে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে—নতুবা তুঁত ফুল সুবাস ছড়াবে কেন?

তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা—'হয়'কে 'নয়' করবার অমন ওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও যে নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তাঁর হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জন নদীতীরের পথে দেখে। বধূটিকে সন্ধান করবার লোকও লাগালে। হরি যুগীকে দু'তিনবার থানায় যেতে হ'ল দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু নিস্তারিণী ছিল অন্য চরিত্রের মেয়ে, শোনা যায় তুলসী দারোগার পাঠানো বৃন্দাবনী শাড়ী সে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল তাদের কলাবাগানের কল্যাণে অমন শাড়ী সে অনেক পরতে পারবে ; জাতমান খুইয়ে বৃন্দাবনী কেন, বেনারসী পরবার শখও তার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তুলসী দারোগা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়।

আর একজন লোক কিন্তু কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল অন্যভাবে। গ্রামের প্রান্তে গোঁসাইপাড়া, গ্রামের মধ্যে তারা খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, প্রায় জমিদার। বড় গোঁসাইয়ের ছেলে রতিকান্ত নদীর ধারে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে, শীতকাল। হঠাৎ সে দেখলে কাদের একটি বৌ ঘড়াসুদ্ধ পা পিছলে পড়ে গেল—খুব সম্ভব তাকে দেখে। রতিকান্ত কলকাতায় থাকতো, দেশের ঝি-বৌ সে চেনে না। সে

ছুটে গিয়ে ঘড়াটা আগে হাঁটুর ওপর থেকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু অপরিচিতা বধূর অঙ্গ স্পর্শ করলে না। একটু পরেই সে দেখলে বধূটি মাটি থেকে উঠতে পারছে না. বোধ হয় হাঁটু মচকে গিয়ে থাকবে। নির্জন বনপথ, কেউ কোনদিকে নেই, সে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—মা, উঠতে পারবে, না হাত ধরে তুলবো?

তারপর সে অপরিচিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কোমল হাতখানি ধরে বল্লে—ওঠ মা আমার ওপর ভর দিয়ে। কোন লজ্জা নেই—উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো তো—

কুণ্ঠিতা সংকুচিতা বধূ ছিল না নিস্তারিণী। সে ছিল যুগীপাড়ার বৌ—তাকে একা ঘাট থেকে জল আনতে হয়, ধান ভানতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়—সংসারের কাজকর্মে সে অনলস, অক্লান্ত। যেমনি পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি মুখরা, তেমনি সাহসিকাও বটে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের গৌরবে তখন তার নবীন বয়সের নবীন চোখ দুটি জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।

সে উঠে দাঁড়ালো, রতিকান্তের সঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বল্লে না। বুঝতে পারলে গোঁসাইপাড়ার বাবুদের ছেলে তার সাহায্যকারী। বাড়ী গিয়ে দু-তিন দিন পরে সে স্বামীকে দিয়ে একছড়া সুপক্ক চাঁপাকলা ও নিজের হাতের তৈরী বাঁশশলা ধানের খইয়ের মুড়কী পাঠিয়ে দিলে গোঁসাইবাড়ী। বল্লে—আমার ছেলেকে দিয়ে এসো গে—

নিস্তারিণী সেই থেকে সেই একদিনের দেখা সুদর্শন যুবকটিকে কত কি উপহার পাঠিয়ে দিত। রতিকান্তের সঙ্গে আর কিন্তু কোনোদিন তার সাক্ষাৎ হয় নি। গোঁসাই-বাড়ীর ছেলে যুগী-বাড়ীতে কোনো প্রয়োজনে কোনদিন আসে নি।

রতিকান্ত কলকাতাতেই মারা গিয়েছিল অনেকদিন পরে। নিস্তারিণীর দু-তিন দিন ধরে চোখের জল থামেনি, এ সংবাদ যখন সে প্রথম শুনলে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল অন্যরকম। সকলের বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দু-তিনটি গোরু থাকতো। সব জিনিস ছিল সস্তা। নিস্তারিণীদের বাড়ীর পশ্চিম উঠানে ছোট একটা ধানের গোলা। কোনো কিছুর অভাব ছিল না ঘরে। বরং ব্রাহ্মণপাড়ার অনেককে সে সাহায্য করেছে।

একবার বড্ড বর্ষার দিনে সে বাড়ীর পিছনের আমতলায় ওল তুলচে—এমন সময় বাঁড়ুয্যে বাড়ীর মেয়ে ক্ষান্তমণি এসে বল্লে—

—ও যুগী বৌ?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়েরা কখনো তাদের বাড়ীর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। সে বল্লে—কি দিদিমণি?

—একটা কথা বলবো।

—কি বলো দিদিমণি—

—আমাদের আজ একদম চাল নেই ঘরে। বাদলায় শুকুচে না, কাল ধান ভেনে দুটো চিঁড়ে হয়েছিল। তোমাদের ঘরে চাল আছে, কাঠাখানেক দেবে?

নিস্তারিণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তার খাণ্ডার শাশুড়ী কোনোদিকে আছে কিনা। পরে বল্লে—দাঁড়াও দিদিমণি—দেবানি, চাল ঘরে আছে। শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিতি হবে—দেখতি পেলে বড্ড বকবে আমারে। তা বকুক গে, তা ব'লে বামুনের মেয়েকে বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দেবো?

আর একবার বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বৌ তার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল : সে বৌ ছিল গ্রামের মধ্যে নামডাকওয়ালা খাণ্ডার বৌ—শাশুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধাতো, কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে শাশুড়ীর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাড়ার কেউ ভয়ে বৃদ্ধাকে স্থান দিতে পারে নি, যে আশ্রয় দেবে তাকেই বড় বৌয়ের গালাগালি খেতে হবে। যুগী বৌ দেখলে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বেড়ার কাছে বড় সেগুনতলার

ছায়ায় ন'-ঠাকরুণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। ও গিয়ে বল্লে—ন'ঠাকরুণ, আসুন আমাদের বাড়ীর দাওয়াতে বসবেন—বড় বৌ বকেছে বুঝি?

ন'ঠাকরুণ শুচিবেয়ে মানুষ, তা ছাড়া বাঁড়ুয্যে বাড়ীর গিন্নী হয়ে যুগী বাড়ী আশ্রয় নিলে মান থাকে না। সুতরাং প্রথমে তিনি বল্লেন—না বৌ, তুমি যাও, আমার কপালে এ যখন চিরদিনের, তখন তুমি একদিন বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ে আমার কি করবে? নগের বৌ যেদিন চটকতলায় চিতেয় শোবে, সেদিনটি ছাড়া আমার শান্তি হবে না মা। ওই 'কালনাগিনী' যেদিন আমার নগের ঘাড়ে চেপেচে—

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বল্লে—চুপ করুন ন'গিন্নী, বৌ শুনতি পেলি আমার এস্তক রক্ষে রাখবে না। আসুন আপনি আমার বাড়ীতে। এইখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন কেন মিথ্যে—

ন'গিন্নীকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে নিজের হাতে পা ধুয়ে দিয়ে পিঁড়ি পেতে দাওয়ায় বসালে। কিছু খেতে দেওয়ার খুব ইচ্ছে থাকলেও সে বুঝলে বড় ঘরের গিন্নী ন'ঠাকরুণ এ বাড়ীতে কোনো কিছু খাবে না, খেতে বলাও ঠিক হবে না। সে ভাগ্য সে করে নি।

অনেক রাত্রে গিন্নীর বড় ছেলে নগেন খুঁজতে খুঁজতে এসে যখন মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন নিস্তারিণী অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বড় একছড়া মর্তমান কলা তাঁকে দিয়ে বল্লে—নিয়ে যান দয়া ক'রে। আর তো কিছু নেই, কলাবাগান আছে, কলা ছাড়া মানুষকে হাতে ক'রে আর কিছু দিতে পারিনে—

তার স্বামী সেবার রামসাগরের চড়কের মেলায় মনোহারী জিনিস বিক্রী করতে গেল। যাবার সময় নিস্তারিণী বল্লে—ওগো আমার জন্যি কি আনবা?

—কি নেবা বলো? ফুলন শাড়ী আনবো?

—না শোনো, ওসব না। একরকম আলতা উঠেচে আজ মজুমদার বাড়ী দেখে এলাম। কলকেতা থেকে এনেচে মজুমদার মশায়ের ছেলে—শিশিনিতে থাকে। কি একটা নাম বল্লে ভুলে গিইচি।

—শিশিনিতে থাকে?

—হ্যাঁ গো। সে বড় মজা, কাটির আগায় তুলো দেওয়া, তাতে করে মাখতে হয়! ভালো কথা, তরল আলতা—তরল আলতা—

—কত দাম?

—দশ পয়সা। হ্যাঁগা, আনবে এক শিশিনি আমার জন্যি?

—দ্যাখবো এখন। গোটা পাঁচেক টাকা যদি খেয়ে দেয়ে মুনাফা রাখতি পারি, তবে এক শিশিনি ঐ যে কি আলতা তোর জন্যি ঠিক এনে দেবো।

এইভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ার সাথে টেক্কা দিয়ে নিস্তারিণী প্রসাধন দ্রব্য ক্রয় করেছে। তাদের পাড়ার মধ্যে সে-ই সর্বপ্রথম তরল আলতা পায়ে দেয়। শূদ্রপাড়ার মধ্যে ও জিনিস একেবারে নতুন—কখনো কেউ দেখেনি। আলতা পরবার সময়ে যে দেখতো সে-ই অবাক হয়ে থাকতো। হাজরী বুড়ী মাছ বেচতে এসেচে একদিন—সে অবাক হয়ে বল্লে—হ্যাঁ বড় বৌ, ও শিশিনিতে কি? কি মাখাচ্চ পায়ে?

নিস্তারিণী সুন্দর রাঙা পা দুখানি ছড়িয়ে আলতা পরতে বসেছিল, এক-গাল হেসে বল্লে—এ আলতা দিদিমা। এরে বলে তরল আলতা।

—ওমা, পাতা আলতাই তো দেখে এসেচি চিরকাল। শিশিনিতে আলতা থাকে, কখনো শুনিনি। কালে কালে কতই দ্যাখলাম। কিন্তু বড় চমৎকার মানিয়েছে তোমার পায়ে বৌ—এমনি টুকটুকে রং, যেন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের মত দেখাচ্চে—

এ সব ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

শীতের সকালবেলা। ওদের বড় ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিস্তারিণী শুয়ে আছে। সংসারের সাবেক অবস্থা আর নেই, হরি যুগী বহুদিন মারা গিয়েচে—হরি যুগীর একমাত্র ছেলে সাধনও আজ তিন-চার বছর একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েচে। সুতরাং নিস্তারিণী এখন স্বামী-পুত্রহীনা বিধবা। তার শাশুড়ী এখনও বেঁচে আছে, আর আছে এক বিধবা জা, জায়ের এক মেয়ে, এক ছেলে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের সে উচ্ছলযৌবনা, সুন্দরী গ্রাম্য বধূটিকে আজ আর রোগগ্রস্তা, শীর্ণকায়া, মলিনবসনা প্রৌঢ়ার মধ্যে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। হরি যুগীর মৃত্যুর সঙ্গে তাদের সে গোয়ালভরা গোরু ও গোলাভরা ধান অন্তর্হিত হয়েচে—ঘরের চালে খড় নেই, তিন-চার জায়গায় খুঁচি দেওয়া খসে-পড়া চালে বর্ষার জল আটকায় না। গত বর্ষায় চালের ওপর উচ্ছেলতা গজিয়ে একদিকে ঢেকে রেখেচে, মাটির দাওয়ার খানিকটা ভেঙে পড়েচে, পয়সার অভাবে সারানো হয়নি। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সংসারের কর্তা, যার আয়ে সংসারের শ্রী, সে চলে যাওয়ায় নিস্তারিণীর আদর এ বাড়ীতে আর নেই। আগে ছিল সে-ই সংসারের কর্ত্রী, এখন তাকে পরের হাত-তোলা খেয়ে থাকতে হয়—তার ছেলে সাধন বাপের মনোহারী দোকান আর কলাবাগান কোনো রকমে বজায় রেখেছিল।

তিন বছর আগের এক ভাদ্র মাসে খুব বৃষ্টির পরে সাধন নদীর ধারে কলাবাগানে কাজ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায়। কেন মারা যায় তার কারণ কিছু জানা যায়নি। সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধন ফিরলো না দেখে তার ঠাকুরমা নাতিকে খুঁজতে বার হচ্চে এমন সময় বেলেডাঙার দুজন মুসলমান পথিক এসে খবর দিলে—সাধন মুখ গুঁজড়ে কলা-বাগানের ধারের পথে কাদার ওপরে পড়ে আছে—দেহে বোধ হয় প্রাণ নেই।

সকলে ছুটতে ছুটতে গেল। গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো। সকলে গিয়ে দেখলে সাধন সত্যিই উপুড় হয়ে কাদার ওপর পড়ে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখা, তার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েচে। যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা রক্ত প'ড়ে অনেকখানি জায়গা রাঙা, খানিকটা বৃষ্টির জলে ধুয়েও গিয়েচে। রক্তটা পড়েচে সাধনের মুখ থেকে।

গরীবের ঘরের ব্যাপার, দুদিনেই মিটে গেল। সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো ক্রমে—বাড়ীতে উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষের মধ্যে বাকী কেবল হরি যুগীর ভাই যুগলের ছেলে বলাই। যুগলও বহুদিন পরলোকগত, দাদার মৃত্যুর পর-বৎসরেই সে বিধবা স্ত্রী ও দু' বছরের শিশুপুত্রকে রেখে মারা যায়। বলাই এখন ষোলো বছরের বেশ কর্মঠ স্বাস্থ্যবান বালক।

নিস্তারিণীকে এখন আদর করে 'নিস্তার' বা 'বড়বৌ' বলে কেউ ডাকে না—যে ডাকতো সে নেই। এখন তার নাম 'সাধনের মা'। কেউ ডাকে পিণ্টুর ঠাকুমা। পিণ্টু সাধনের শিশুপুত্র—এখন তার তিন বছর বয়েস। সাধনের বিধবা বৌয়ের বয়স এই সবে সতেরো।

নিস্তারিণী ডাক দিল—ও পিণ্টু, পিণ্টু—

পিণ্টু উঠানের আমতলায় খেলা করছিল, কাছে এসে বল্লে—কি ঠাক্‌মা?

—তোর মাকে একবার ডেকে দে—

পিণ্টুর ডাকে তার মা এসে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি হয়েচে, ডাকচো কেন?

—আমি আজ দুটো ভাত খাবো, বল্ তোর ঠাকুরমাকে—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—ভাত বল্লিই অমনি ভাত, খাবা কোথা থেকে? সে আমি বলতে পারবো না ঠাকুরমাকে।

—তবে একগাল খই কি চিঁড়েভাজা যা হয় দে এখন—খিদেয় মলাম—

—হ্যাঁ, আমি তোমার জন্যি বামুনপাড়ায় বেরুই লোকের দোর দোর। অসুখ হয়েচে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো বাপু।

ওরা ওই রকম। সাধনের বৌ মুখঝঙ্কার দেয়, তাকে একেবারেই মানে না। সেকালের আর একালের মেয়েতে কি তফাৎ, তাই সে ভাবে এক এক সময়ে। তারও একদিন সতেরো বছর বয়স ছিল, কখনো শাশুড়ীর একটা কথার অবাধ্য হতে সাহস হ'ত তার? আশ্চর্য্যি।

একটু পরে নিস্তারিণীর শাশুড়ী এসে দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি, হ্যাঁ বৌ, তোমার আক্কেলখানা কি? আজ নাকি ভাত খেতে চেয়েচ? জ্বর রয়েচে চব্বিশ পহরের জন্যি। ভাত খেলেই হল অমনি?...বলি, সোয়ামী খেয়েচ, পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ—এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?

নিস্তারিণী বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে অসুখে—তবুও সে বল্লে, সোয়ামী-পুত্তুর তো তুমিও খেয়েছিলে, তবুও তিন পাথর ক'রে ভাত মারো তো তিনটি বেলা। লজ্জা করে না বলতি?

নিস্তারিণীর শাশুড়ী এ'কথার উত্তরে চীৎকার ক'রে গালাগালি দিয়ে এক কাণ্ডই বাধালে। সাধনের বউকে ডেকে ব'লে দিলে—ওকে কিছু খেতে দিবিনে আজ ব'লে দিচ্চি। এ সংসারে যে খাটবে, সে খাবে। আমরা সবাই মায়ে ঝিয়ে খাটি, ও শুধু শুয়ে থাকে। রোগ নিয়ে শুয়ে থাকলি এ সংসারে চলে না। তার ওপর আবার যে সে রোগ নয়, ওকে বলে পাণ্ডুর রোগ। মুখ হলদে, হাত পা ফুলেচে, ও কি সহজ রোগ? ও আর উঠবেও না, খাটবেও না, কেবল শুয়ে শুয়ে পাথর পাথর খাবে।

নিস্তারিণী ব'ল্লে—খাবো—খাবো, বেশ করবো। আমার খোকা কলাবাগান সামলে রাখতো, তারই আয়ে বাড়ীসুদ্ধু খাওনি? সেই কলাবাগান তদ্বির করতে গিয়েই বাছা আমার চলে গেল। তোমরা ওদের বাপছেলের রক্ত জল করা কলাবাগান, মনিহারি ব্যবসা ঘোচালে। এখন আমায় বসিয়ে খেতে দেবে না তো কি করবে? নিশ্চয়ই দিতে হবে।

—বাসি আখার ছাই খেয়ো দেবো। ডাইনি রাক্ষুসি—আমার সংসার তোর দিষ্টিতে জ্বলে পুড়ে গেল—নইলে কি না ছেল, গোলাভরা ধান ছেল না? হাঁড়ি ভর্তি ডালডুল, গোয়াল ভর্তি গোরু ছাগল—ছেল না কি?

উভয় পক্ষের চেঁচামেচি শুনে ওর জা নির্ম্মলা সেখানে এসে পড়লো। এটি হরি যুগীর ছোট ভাই যুগলের বিধবা স্ত্রী। এর একমাত্র পুত্র বলাই এই সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষ। বলাইয়ের বয়েস এই উনিশ বছর।

বলাই বাঁশ কিনে গাড়ী বোঝাই দিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে মালগাড়ীতে উঠিয়ে কলকাতায় পাঠায়। গত বছরখানেক এ ব্যবসা ক'রে সে গোটা পঞ্চাশ টাকা হাতে জমিয়েচে—মার হাতেই এনে দিয়েচে সে টাকা। নির্ম্মলা আবার সে টাকাটা থেকে কুড়িটি টাকা শাশুড়ীকে দিয়েচে। বুড়ী সেই টাকায় পাশের গ্রাম থেকে দুধ কিনে এ গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দেয়, তাতেও সামান্য কিছু লাভ থাকে। বুড়ীর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেলেও সে এখনও দুপুর রোদে সারা পাড়া, সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়—দূর দূরান্তরে চাষাগাঁয়ে হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম সংগ্রহ করতে যায় ব্রাহ্মণপাড়ায় বিক্রির জন্যে।

নির্ম্মলা নিজেও বসে থাকে না, তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ী ঝিয়ের কাজ ক'রে মাসে দু' টাকা মাইনে পায়।

সুতরাং এ সংসারে এখন নির্ম্মলার প্রতিপত্তিই বেশি। নিস্তারিণীর দিন সকল রকমেই চলে গিয়েচে। এখন নির্ম্মলার ছেলে বলাই পয়সা আনে, নির্ম্মলা নিজে পয়সা আনে, বলাইয়ের পয়সায় ওর ঠাকুরমা দুধের যোগান দিয়ে কিছু আয় করে। নিস্তারিণী শীর্ণ পাণ্ডুর দেহে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে রোগের দুষ্ট-ক্ষুধায় অবোধ বালিকার মত। হরি যুগী বেঁচে থাকলে তার যে অন্যায় আবদার খাটতো, সাধন বেঁচে থাকলেও খাটতো। আজ তার আবদার কান পেতে শোনবার লোক কে আছে এ সংসারে।

নির্মলার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ—বেশ ধবধবে ফর্সা, কৃশাঙ্গী, মুখচোখ ভালোই, মাথায় এখনো এক ঢাল চুল, চুলে একটিও পাক ধরে নি। যুগীদের মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়ে থাকে—নির্মলার মেয়ে তারা বেশ সুন্দরী। তারা বলাইয়ের ছোটো, এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। আজ বছর দুই হ'ল এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়েচে।

নির্মলা এসে বল্লে—দিদি, চেঁচিও না। ঝগড়া করে মরচো কেন?

নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—দ্যাখ দিকি ছোট বৌ, আমায় কিনা রাক্ষুসি, ডাইনি বলে। আমি নাকি এসে ওনার সংসারে আগুন লাগিয়ে দিইচি। আমার সোয়ামী পুত্তুরের অন্ন উনি কোনো দিন বুঝি দাঁতে কাটেন নি—

নির্মলা বল্লে—সে তো তুমিও ওনাকে বলেচো। যাক্, এখন চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো।

—ও ছোট বৌ, আমি দুটো ভাত—

—না, আজ না। তোমার গাল ফুলেচে, মুখ ফুলেচে—তুমি ভাত খাবে কি বলে আজ?

—তা হোক, তোর পায়ে পড়ি—

—আচ্ছা এখন চুপ করো, বেলা হোক। ভাত রান্না হোক, আমি বলবো অখন।

নিস্তারিণীর হাত, পা, মুখ ফুলেচে একথা ঠিকই। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে তার, ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না—এমন খারাপ দেখতে হয়েচে ও। যত্ন করবার কেউ না থাকাতে আরও দিন দিন ওর অবস্থা খারাপ-তর হয়ে উঠেচে। খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগ্রহ ক'রে খেতে দেবার কেউ নেই। রোগীর পথ্য তো দূরের কথা, দুটি ভাত তাই কেউ দেয় না।

ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সে নাতিকে ডেকে চুপি চুপি বল্লে—পিন্টু, দুটো পেয়ারা পেড়ে আনতে পারিস?

পিন্টুর মা ছেলেকে বলে—খবরদার, যাবি না বুড়ির কাছে। ওর পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, ছোঁয়াচে রোগ। ছেলে খেয়ে বসে আছে ডাইনি, আবার নাতিকে খাবার যোগাড় করচে। ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো যদি ওর কাছে যাবি—

বেলা দুপুরের পরে সে ভীষণ জ্বরে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল—কখন যে এ বাড়ীর লোক খাওয়া দাওয়া করেচে তা সে কিছুই জানে না। যখন তার খানিকটা জ্ঞান হ'ল, তখন ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় রাঙা হয়ে উঠোনের আমগাছটা, বাঁশঝাড়গুলোর আগায় উঠে গিয়েছে। মুখের কাঁথাটা খুলে দিয়েই ও চিঁ চিঁ ক'রে প্রথমেই ডাকলে—ও পিন্টু, পিন্টু—

পিন্টু কোথা থেকে ছুটে এসে বল্লে—কি ঠামা?

—আমার জন্যি সেই পেয়ারা এনেলি?

—না ঠামা।

—আনিস্ নি? ছেলেমানুষ ভুলে গিয়েচিস। বোস এখানে।

কিন্তু পিন্টু বসতে ভরসা পায় না, মা দেখতে পেলে মার খেতে হবে। সে আনমনে খেলা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরে নিস্তারিণী আবার ডাকলে—ও ছোট বৌ—ছোট বৌ—

কেউ উত্তর দিল না, কারণ এ সময়ে বাড়ীতে কেউ থাকে না।

আবার দু'বার ডাক দিয়ে নিস্তারিণী অবসন্ন হয়ে পড়লো, তার বেশি চেঁচামেচি করবার ক্ষমতা নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নির্মলার মেয়ে তারা এসে বল্লে—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, ডাকছিলে?

নিস্তারিণী চিঁ চিঁ করতে করতে বল্লে—কাত্‌রে কাত্‌রে মরে গেলাম। তা যদি তোমাদের একজনও উত্তর দেবে। একজন এমন রুগী বাড়ীতে রয়েচে—বোস এখানে

একটু—

তারা ওর মায়ের মত ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী বালিকা। নতুন বিয়ের কনে, পাশেই শ্বশুরবাড়ী। নবীন যুগীর ছেলে অভিলাষ তার স্বামী। এই মাত্র শ্বশুরবাড়ী থেকেই আসছে। আসবার কারণ অন্য কিছু নয়। অভিলাষ এখুনি গরম মুড়কি মেখেচে, বালিকা স্ত্রীকে আদর করে বলেচে, তোদের বাড়ী থেকে ধামি নিয়ে আয় মুড়কি খেতে দেবো। এই জন্যেই তার আগমন। রোগগ্রস্ত জ্যাঠাইমা বুড়ীর বকুনি শুনবার জন্যে সে এখন এখানে বসতে আসেনি। সুতরাং সে বিব্রত মুখে বল্লে—ও জ্যাঠাইমা, আমি এখন বসতে পারবো না, তোমার জামাই মুড়কি মেখেচে, নিয়ে বেলেডাঙায় ফিরি করতে বেরুবে—

—তোর মা কোথায়?

—বাড়ীতে কেউ নেই। মা গাঙ্গুলী বাড়ী কাজ করতে গিয়েছে, ঠাকুমা নরহরিপুরে হাঁসের ডিম আনতে গিয়েচে—

—পিণ্টুর মা কোথায়?

—ঐ যে শিউলীতলায় বসে বাসন মাজচে—

—একটু ডেকে দিয়ে যা দিকি মা—

পরে সুর খুবই নীচু ক'রে বল্লে—মা, দুটো মুড়কি অভিলাষের কাছ থেকে নিয়ে আয় না? আমার নাম যেন করিস নে—

তারা বল্লে—সে আমি পারবো না। অসুখ গায়ে মুড়কি খাবে কি? তারপর শেষকালে ঠাকুমা টের পেলে আমায় বকে ভূত ঝাড়াবে। চল্লাম আমি—ও বৌদিদি, শুনে যাও জেঠিমা ডাকচে—

পুত্রবধূ বিরক্ত মুখে এসে দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি ডাকের ওপর ডাক কেন অত? আমার সংসারে কাজকর্ম নেই, না তোমার কাছে বসে থাকলে চলবে? কি বলচো বলো—

নিস্তারিণী কাতরসুরে বল্লে—তা রাগ করিস নে আমার ওপর বৌমা—আমায় দুটো ভাত দে—

—দিই। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ, ভাত না খেলে কি চলে!

—তবে আমি কি খাবো, খিদে পায় না?

—আমি জানিনে। আদিখ্যেতার কথা শোনো। খিদে পায় তা আমি কি করবো? ঠাকুমা এলে বলো! ঠাকুমা না বল্লি আমি ভাত দিতি পারবো না।

—পিণ্টু কোথায়? একটু ডেকে দে আমার কাছে—বড্ড ইচ্ছে করে দেখতি—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো—অত সোহাগে আর কাজ নেই। ছেলের মাথা খেয়ে বসে আছে, এখন নাতিটি বাকি!

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—অমন ক'রে বলতি নেই, বৌমা। তা দে ডেকে, কিচ্ছু হবে না, দে একবার ডেকে—

পুত্রবধূ হাত পা নেড়ে বল্লে—না—না—হবে না। তোমার পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। আমি ছেলে পাঠাতি পারবো না তোমার কাছে। গেলি আমারি যাবে—তোমার কি?

কথা শেষ ক'রেই মুখ ঘুরিয়ে পুত্রবধূ চলে গেল। নিস্তারিণীর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে' ছেঁড়া, ময়লা, তেলচিটে বালিশটা ভিজিয়ে দিলে। এমন কথাও লোককে লোকে বলে—তাও নিজের পুত্রবধূ। সাধনের নাম রেখেচে ওই ধুলো-পুঁড়োটুকু—ওই অবোধ শিশু। মা সাতভেয়ে কালী, তার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন। সে না তার ঠাকুরমা? বৌমা বলে কিনা, গেলে তারই যাবে!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নির্মলা বামুন বাড়ীর কাজকর্ম সেরে ফিরে এল। বড় জায়ের কাছে গিয়ে বল্লে—কেমন আছ দিদি? দেখি, গা দেখি—

নিস্তারিণী না-ঘুম না-জ্বরে আচ্ছন্নমত হয়ে পড়ে ছিল, পকালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠে বল্লে—কে? ছোট বৌ? তুই আবার আমায় ছুঁলি কেন, তোর পাছে পাণ্ডুর রোগ হয়—আজ আমায় বৌমা বলেছে—হ্যাঁ ছোট বৌ. সাধনের ছেলে আমার কেউ নয়? বলো তুমি—

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগলো। নির্মলা বল্লে—চুপ করো চুপ করো দিদি, সবই তোমার কপাল। পিরীতিমের মত বৌ ছিলে, সব তো দেখেচি। স্বভাব চরিত্তির সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলতি পারে নি কোনো দিন।

—কেন, দেওরকে কোলেপিঠে করে মানুষ করি নি? আমি যখন ঘর করতি এলাম, তোর সোয়ামী তখন ন' বছরের ছেলে। আমার পাত থেকে বেগুন পোড়া ভাত মেখে খেতো—আর আজ আমি হইচি নাকি ডাইনি—

—চুপ করো দিদি। এসব কথা আমি সব জানি। এখন কি খাবে তাই বলো—

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—দুটো ভাত—

—না, আমায় বকিও না। সারাদিন কাজ ক'রে দুঃখধান্দা ক'রে এলাম। দুটো মুড়ি নিয়ে এসেচি—

—শোন ছোটবৌ, অভিলাষ আজ গরম মুড়কি মেখেচে, তারা বলে গেল—

—না, সে সব হবে না। গুড়ের মুড়কি জ্বর হ'লে খায় না। দুটো তেল নুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিগে, খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে আজ রাত্তির মত পড়ে থাকো। শুনেচ কাণ্ড, বাজারে নাকি চালের পালি দেড় টাকা! ভাত আর খাতি হবে না। বলাই আর কত রোজগার করবে? কি ক'রে এই বিধবার পুরী চালাবে? ধান ফুরিয়ে এসেচে, এবার আমাদের মত গরীবদের না খেয়ে মরণ।

নিস্তারিণী স্তব্ধ হয়ে শুনলে। অসুস্থতার দরুণ সে বহুদিন অবধি বৈষয়িক ব্যাপারে নিস্পৃহ, তবুও দেড় টাকা এক পালি চাল শুনে সে যেন অত জ্বরের ঘোরের মধ্যেও চমকে গেল। সেকালে যে তাদের গোলার ধান বিক্রি হয়েচে—আঠারো আনা ক'রে সরু বাঁশসলা কি চামরমণি ধানের মণ। মনে আছে একবার তার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য গোলা থেকে পঁচিশ টাকার ধান বিক্রি হয়—পাঁচ সিকা ছিল এক মণ ধানের দাম।

নিজের হাতে সে কত ধান বিলিয়ে দিয়েচে.....একবার গাঁয়ে আকাল হয়েছিল, টাকায় সাড়ে তিন সের হয়ে উঠলো চালের দাম। বামুনপাড়ার মেজ গিন্নি একদিন তাকে বাড়ীতে ডেকে বল্লেন,—"বৌ, তোমায় একটা কথা বলি। খাওয়াদাওয়ার বড্ড কষ্ট, দু'মণ ধান আমাকে ধার দিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমার কোনো অভাব নেই। গোলা আরও উথলে উঠুক তোমার।" সে শাশুড়ীকে লুকিয়ে দু'মণ ধান বার করে দিয়েছিল গোলা থেকে। শাশুড়ী চিরকালের খাণ্ডার, কাউকে কিছু জিনিস দেওয়া পছন্দ করতো না কখনো। কিন্তু তখনকার দিনে এ সংসারে তার প্রতিপত্তি ছিল অন্যরকম। সে যা করবে তাই হবে। তার ওপর কথা বলবার কেউ ছিল না। কোথায় গেল সে সব দিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। নির্মলা এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বল্লে—ও দিদি, খেয়ে নাও একটু দুধ।

নিস্তারিণী বল্লে—আমার এখানে একটু বোস ছোটবৌ—কেউ বসে না।

নির্মলার বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসবার জো নেই। এক্ষুনি সব খেতে চাইবে, শেষ রাত্রে উঠে চার কাঠা ধানের চিঁড়ে কুটতে হবে বাঁড়ুজ্যেদের।

তারপর আবার যে একা, সেই একা। সারা দিনরাত আজ একটি মাস ধরে একাই শুয়ে থাকতে হচ্ছে। নির্মলা তকে ধরাধরি ক'রে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একদিন দু'দিন করে কতদিন যে কাটলো, নিস্তারিণীর কোনো খেয়াল নেই। কেবল আব্‌ছা আব্‌ছা দিনগুলো আসে, সে সব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিঃসঙ্গ, কেবল ছোট্ট খোকা পিণ্টুকে দেখতে ইচ্ছে করে.....কিন্তু তার মা তাকে পাঠায় না, একটু বসতে দেয় না কাছে। পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়ীকে দেখতে পারে না.....তার নাকি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে বলে। আর কেবল সবাই বকে, সবাই বকে।

একদিন সে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করলে আর আকাশে বৃষ্টি হয় না। হল্‌দে রঙের রোদ বাঁশঝাড়ে, আমগাছের মাথায়। তেলাকুচো লতায় সাদা সাদা ফুল ধরেছে, বলাইয়ের হাতে পোঁতা উঠোনের বাঙা ডাঁটা শাক ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বর্ষাকাল তা হ'লে চলে গিয়েছে।

পুত্রবধূ আমতলায় কাঠ কাটছে। জিগ্যেস করলে—ও বৌমা, এটা কি মাস?

—সে খোঁজে কি দরকার তোমার?

—বল না বৌমা?

—শেষা ভাদ্দর। তোমার কি হুঁশ পোড়েন আছে? সেদিন চাপড়া ষষ্ঠী গেল, খোকাকে তোমার আশীর্বাদ করা দরকার। তোমার কাছে গিয়ে ডাকলে, তা যদি একটা কথা বলে—

বিকেলে ও-পাড়ার বুধো গোয়ালার মা দেখা করতে এসে বল্লে—ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে! আহা, কতদিন হয়েছে আসি নি—বলি, শুনচি বড্ড অসুখ, একবার দেখে আসি। উদুরী হয়েছে বুঝি, পেট যে ফুলেচে বড্ড। সোনার পিরতিমে চেহারা ছিল বৌমার। আমি তো আজকের লোক নই, যখন হরি প্রথম বিয়ে ক'রে এল—ওই আমতলায় দুধে আলতার পিঁড়িতে দাঁড়াল, বেশ মনে আছে। রূপে একেবারে ঝলক্ দিয়ে গেল যেন। সে চেহারার আর কিছু নেই। এমন নক্ষি বৌ—আহা, তার এত কষ্টও ছেল অদেষ্টে।

নিস্তারিণী যেন সব বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসী হয়ে পড়েছে। এ সব কথা শুনে যায় বটে, কিন্তু কার বিষয়ে কে যেন কথা বলছে। সেকালের সে বড়বৌ তো কোন্ কালে মরে হেজে গিয়েছে। সে রূপসী, লক্ষ্মীর মত সংসারজোড়া বড়বৌ কোথায় আজ?... কেবল খেতে ইচ্ছে হয়। পান্তাভাত কতকাল খায় নি। কেউ দেয় না—দেখাই করে না এসে। সন্ধ্যার পরে নির্মলা এসে একটু কাছে বসে। বলে—ও দিদি. তোমার জন্যি একটা জিনিস এনেছি মনিববাড়ী থেকে।

নিস্তারিণী ব্যগ্রভাবে বলে—কি—কি?

—চুপ করো। দু'টো তালের বড়া—গিন্নি ভাজছে তা আমাকে খেতে দেলে—

—কতকাল খাইনি। দে—

নির্মলা বেশীক্ষণ বসতে পারে না. রান্নাঘরে খই ভেজে দিতে হবে জামাই অভিলাষকে। তারা ব'লে দিয়েছে—কাল মুড়কি মাখবে সকালবেলা। সে মুড়কির ব্যবসা করে, কিন্তু খই ভাজা কাজটা মেয়েমানুষের. পুরুষের নয়—ওটা শাশুড়ীর বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না।

রান্নাঘরে যেতে সাধনের বৌ বল্লে—কাকীমার বুড়ীর কাছে রোজ বসা চাই-ই। অমন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—পাপের দেহ তাই কষ্ট পাচ্ছে—নইলে ম'রে যেত কোন্ কালে।

নির্মলা ধমক দিয়ে বল্লে—অমন বলিস্ নে বৌমা. মুখে পোকা পড়বে। সতী নক্ষি মেয়ের নামে কিছু বোলো না। তোর আপন শাশুড়ী না? তুই ও-সব কথা মুখে বের করিস্ কি ক'রে? আজই না হয় ও অমন হয়ে গিয়েচে—ও যে কি ছিল, আমি সব দেখিচি। এই সংসারের যা কিছু ঝক্কি চিরডাকাল ও পুইয়েছে। দেওরদের মানুষ করা, বিয়ে থাওয়া দেওয়া—ও না থাকলে সংসার টিকতো না। আজই না হয় ওর—

সাধনের বৌ ঠোঁট উল্টে বল্লে—হোক গে যাক বাপু। ও নিজের ছেলে খেয়েছে—ওর

ওপর আমার এতটুকু ছেদ্দা নেই। যতই বলো।

—ও খেয়েছে, কি বলিস্ বৌমা? ও ছেলে খেয়েছে! যাবার অদেষ্টে যায় চলে। কার দোষ দেবো। তা হোলে তো তোকেও বলতে পারি—তুই সোয়ামী খেয়েছিস।

এই কথার উত্তরে শ্বশুড়শাশুড়ী ও বৌয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে উঠলো।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে পড়েছে। নিস্তারিণী একেবারে উত্থান-শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। দিনের অর্ধেক সময় তার জ্ঞান থাকে না। এক একবার চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে, তখন কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে নাতিকে খোঁজে, নির্মলাকে খোঁজে। ওর মলিন বিছানা ও সারা দেহে কেমন একটা দুর্গন্ধ ব'লে আজকাল কেউই কাছে আসতে চায় না। কেবল খাওয়ার সময় কোনোদিন নির্মলা, কোনোদিন বা সাধনের বৌ দুটি ভাত দিয়ে যায়। সেদিন ও চোখ মেলে ভাত খাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। অনেকক্ষণ পরে পুত্রবধূ বল্লে—ভাত খাওনি যে, খাইয়ে দেবো?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল অসুখের ঘোরের মধ্যেও। বল্লে—তাই দে বৌমা।

সাধনের বৌ ভাত দুটি খাইয়ে এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। একটু পরে নির্মলা বাড়ী এল। রোগীকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হ'ল অবস্থা ভালো নয়। আপন মনে বল্লে—ঠাকুর, ওকে মুক্তি দাও, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন নিস্তারিণীর জ্ঞান হয় আজও তেমনি হ'ল। জা'কে অবোধ বালিকার মত আবদারের সুরে বল্লে—দুটো পান্তভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো—

নির্মলা দু' তিন দিন চেষ্টার পরে অতি কষ্টে এই যুদ্ধের বাজারে ইলিশ মাছ জুটিয়ে এনেছিল, কিন্তু জা'কে খেতে দিতে পারে নি।

নিস্তারিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ঝুঁকলো পরদিন দুপুর থেকে।

সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে! বাঁড়ুজ্যেদের ন'গিন্নী যেন এসে হেসে হেসে বলচেন, 'আমায় আজ দু'কাঠা চাল ধার দিতে হবে বৌ। বৌমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ী থেকে—তুমি না দিলে দাঁড়াবো কোথায়?' ...যে সব লোক কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্বের শরৎ-অপরাহ্ণের মত হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসিমুখে বলচে—ও বড়বৌ, কলা বিক্রির দরুণ টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও—আর এই ইলিশ মাছটা—ভারি সস্তা আজ হাটে—

ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হ'ল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোন্‌টা স্বপ্ন—কোন্‌টা সত্য। সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশ মাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

নির্মলা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—সতী লক্ষ্মী সগ্‌গে চলে গেল—বৌমা পায়ের ধুলো নে—

তারপর সে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মাতৃসমা বড় জায়ের পায়ে হাত ঠেকায়।

অনেক দিন পরে শাবলতলার মাঠ দেখলাম সেদিন। আমার পিসিমার বাড়ীর দেশে ছেলেবেলায় যখন পিসিমার বাড়ী থেকে দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় পড়তাম সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। পিসিমা মারা যাওয়াতে সে গ্রামে আর যাই নি কখনও।

সেদিন আবার কার্যোপলক্ষে গরুর গাড়ী চড়ে যেতে যেতে শাবলতলার মাঠ চোখে পড়ল, কিন্তু মস্ত বড় কি এক কারখানা হচ্ছে সেখানে। রেল লাইন বসেছে মাঠের ওপর দিয়ে—বড় রেল লাইন। কত যে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে! লোকজন কুলি-মজুরের ভিড়, দুমদাম শব্দ, সে এক বিরাট ব্যাপার।

চালাঘর ও তাঁবু চারিধারে। ইন্‌জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের দল খেটে খেটে সারা হয়। পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টরের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের খুঁটি বসানো হচ্ছে, ইলেকট্রিকের ও টেলিফোনের তার খাটানো হবে। ইট-বোঝাই লরির ভিড় নতুন তৈরী চওড়া রাস্তাগুলোর ওপরে। চুনের ধুলো, সিমেন্টের ধুলো উড়ছে বাতাসে।

আমার সেই ছেলেবেলাকার শাবলতলার মাঠ কোথায় গেল? সত্যিই তা নেই। তার বদলে আছে কতকগুলো তাঁবুর সারি, ইটখোলা, পাথুরে কয়লার স্তূপ, চুনের ঢিবি, কাঠের ঢিবি, লোকজনের হৈ চৈ লরির ভিড়।

আজ সকালে মার্টিন লাইনের ছোট স্টেশনে নেমেছি, গরুর গাড়ী করে চলেছি পিসিমার বাড়ীর গ্রামের পাশের একটা গ্রামে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে। রাস্তার ধারে পড়ে শাবলতলার মাঠ। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা তার।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে বলি—হ্যাঁরে, এটা শাবলতলার মাঠ, না?

—হ্যাঁ বাবু।

—কি হচ্ছে এখানে?

—কি জানি বাবু, কলকারখানা বসছে বোধ হয়।

—কতদূর নিয়ে?

—তা বাবু অনেক দূর নিয়ে—উই বাজিতপুর, মনসাতলা, ছাওয়াল-মারি, বেদেপোতা, হাঁসখালির চড়া পর্যন্ত।

—গ্রামগুলো সব কোথায়?

—সব উঠিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল আমার এগার বছর বয়সের একটি মধ্যাহ্নদিন। আর মনে পড়ল দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে।

উমাচরণ মাস্টার কতদিন থেকে দুর্গাপুর ইউ পি পাঠশালায় হেডমাস্টারি করছিলেন তা আমি বলতে পারব না। গ্রামের রায় জমিদারদের ভাঙা কার্নিসে পায়রার বাসাওয়ালা বৈঠকখানার একপাশে সেকেলে তক্তপোশে ছিল তাঁর বাসা। দেওয়ালে তাঁর হুঁকো ঝুলত পেরেকের গায়ে, বাঁশের আলনায় তাঁর দুখানা আধময়লা ধুতি ও এক এবং অদ্বিতীয় পিরানটি আলতো করে ঝোলানো থাকত—আর থাকত তক্তপোশের নীচে একজোড়া কাঠের খড়ম। একটা টিনের বিবর্ণ তোরঙ্গ। একটা চটের-থলে-ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। একখানা পাকা বাঁশের লাঠি এবং—সেইটেই বেশি করে মনে আছে—একগাছা তেলে-জলে

পাকানো বেত।

উমাচরণ মাস্টার আবার বই লিখতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক, লেখক বা সাহিত্যিকের যশোগৌরব সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন খুবই অস্পষ্ট—তবুও মাস্টারমশায় যখন ক্লাসের টেবিলের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে তাঁর, লেখা 'আক্কেল গুড়ুম' বই পড়তেন—তখন আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘ-গুম্ফযুক্ত বসন্তের দাগ-আঁকা প্রৌঢ় মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

হ্যাঁ—তার বই-এর নাম ছিল 'আক্কেল গুড়ুম'—তিনি বলতেন 'প্রহসন'। আমার যা বয়স তখন তাতে 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'প্রহসন' দুটো কথার একটারও মানে বুঝতাম না। মনে আছে বইএর মধ্যে একটি ইংরেজি-পড়া ছোকরার কথা আছে এবং পড়ার ভঙ্গিতে মনে হত উক্ত ইংরেজী-পড়া ছোকরা খুব ভাল লোক নয়।

উমাচরণ মাস্টার আমাদের দিকে চেয়ে সগর্বে বলতেন—এই বই পড়ে গোবরডাঙার সেজবাবুর শালা কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, উমাচরণবাবু, আপনি কালে গিরিশ ঘোষের সমান লেখক হবেন।—বুঝলে?

আমি বলেছিলাম—গিরিশ ঘোষ কে পণ্ডিত মশাই মশাই?

উমাচরণবাবু অনুকম্পার হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—গিরিশ ঘোষ? জান না? হুঁ। কি-ই বা জান?

আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। কি উত্তর দেব? যখন সত্যিই জানি নে গিরিশ ঘোষ কে। নামও কোনদিন শুনি নি! উমাচরণ তাঁর এই মূল্যবান প্রহসন আমাদের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি অনেক করেছিলেনও। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ী একখানা বা দুখানা করে 'আক্কেল গুড়ুম' ছিলই। মাইনের টাকা দিলে খুচরো ফেরত দেওয়ার রীতি ছিল না তাঁর। বলতেন—কত বাকি? সাত আনা? নাও একখানা ভাল বই নিয়ে যাও। বাড়ী গিয়ে পড়তে দিও সবাইকে।

একদিন পিসিমা বললেন—হ্যাঁরে, মাইনের টাকা দিলাম, ন আনা পয়সা ফেরত দিলি নে?

—না পিসিমা। মাস্টার মশাই বই একখানা দিয়েছেন তার বদলে।

—কি বই?

—আক্কেল গুড়ুম।

—ওমা, সে আবার কি বই? তুই কি বলে সেই বই আনতে গেলি? যেমন পোড়ার-মুখো মাস্টার তেমনই পোড়ার-মুখো ছেলে! বইএর নাম শোন না—'আক্কেল গুড়ুম'। কেষ্টর শতনাম পাওয়া যায় তো একখানা আন্ গে বরং—ও বই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

—সে হবে না পিসিমা, তিনি ওসব বাজে বই লেখেন না। এ হল প্রহসন।

—সে আবার কি রে?

—সে তুমি বুঝবে না। গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ?

—সে কে আবার? আমাদের গাঁয়ে তো ও নামের কেউ নেই। দুগগোপুরের লোক নাকি?

—সে তুমি বুঝবে না। তিনি আমাদের মাস্টার মশাইয়ের মত প্রহসন বই লেখেন।

পিসিমা ধমক দিয়ে বলতেন—তুই চুপ কর বাপু—বড্ড পণ্ডিত হয়েছিস তুই। আমি জানি নে—ওর গাল টিপলে দুধ বেরোয় উনি জানেন—ফাজিল কোথাকার! ওসব গিরিশ ঘোষ সতীশ ঘোষ বুঝি নে—কাল ও বই ফেরত দিয়ে কেষ্টর শতনাম আনতে পারিস ভাল, নয়তো ন আনা ফেরত আনবি—যা—

একদিন উমাচরণ মাস্টার মশায় আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, বড় বড় লেখকরা সবাই প্রথম জীবনে তাঁর মত ইস্কুল-মাস্টারি করেছিলেন। কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের ক্লাসের সারদা হঠাৎ বলে বসল—আপনার বয়স কত মাস্টার মশাই?

—কেন রে?

—তাই বলছি।

উমাচরণ মাস্টার তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটার খটকা বাধছে কোথায়। এই বয়সেও যদি এখন উমাচরণ মাস্টার আমাদের এই স্কুলে মাস্টারি করতে রয়ে গেলেন, তবে কোন্ বয়সে গিয়ে তিনি কোথায় কি বড় কাজ করবেন? আমাদের ক্লাসের সতু কিন্তু বলত—মাস্টার মশাই খুব বড় পণ্ডিত। ওরকম হয় না।

আমি বললাম—কেন রে?

—উনি চালতাবাগানের মাঠের ধারে বসে বসে রোজ কি করেন! বোধ হয় লেখেন। কবিমানুষ কিনা।

আমি একদিন সতুর সঙ্গে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। চালতাবাগান বহু কালের প্রাচীন আম তেঁতুল গাছের ছায়ায় দিনমানেই সন্ধ্যার মত অন্ধকার। অনেক রকম মোটা লতা গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে। বাগান পার হয়েই একটা ছোট মাঠ, উমাচরণ মাস্টার সেই মাঠের ধারে বসে আছেন, বাগানের ছায়ার আশ্রয়ে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে। মাদুরের ওপর কাগজ বই ছড়ানো। পাছে উড়ে যায় বলে মাটির ছোট ছোট ঢেলা চাপানো সেগুলোর ওপর। আমরা সেওড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, তিনি কখনও উপুড় হয়ে কি লিখছেন, কখনও সামনের মাঠের দিকে চেয়ে কি ভাবছেন, কখনও আপন মনে হাসছেন, বিড় বিড় করে কি বকছেন।

সতু সসম্ভ্রমে চুপি চুপি বললে—দেখলি? কবিমানুষ!

আমি বললাম—কি করছেন?

—লিখছেন।

—বিড় বিড় করে কি করছেন?

—ও রকম কবিরা করে থাকে।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে কবির কাণ্ড অনেকক্ষণ দেখলাম। এই আমার জীবনে প্রথম একজন জীবন্ত কবির ক্রিয়াকলাপ দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটল। মনে আছে, সেওড়া ঝোপের পাশেই ছিল বড় একটা কতবেল গাছ, তলা বিছিয়ে পড়ে ছিল পাকা পাকা কতবেল। সেই বয়সের লোভ, বিশেষ করে কতবেলের ওপর লোভ দমন করেছিলাম কবি দেখবার আনন্দে ও বিস্ময়ে। উমাচরণ মাস্টারের বয়স তখন কত? আমার মনে হয় চল্লিশের ওপর। কারণ আমার মায়ের বড় ভাই, বড় মামা—যাঁর বয়স শুনতাম পঁয়ত্রিশ—তিনি মাস্টার মশায়কে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

আমরা যেমন নিঃশব্দে সেখানে গিয়েছিলাম তেমনই নিঃশব্দে চলে এলাম মনে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে।

এর পর উমাচরণ মাস্টার যখন পড়াতেন, তখন হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতাম। একজন কবি বটে! উনি ঠিকই বলেছেন—বড় বড় লোকেরা প্রথম জীবনে মাস্টারি করে। ওঁর বয়স বেশি হয়েছে বটে কিন্তু উনি একজন কবিও তো হয়েছেন। সারদাটা কিছুই বোঝে না।

বছরখানেক কাটল। আমরা কটি ছেলে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি

হয়েছি। সেই বছর উমাচরণ মাস্টার আমাদের নিয়ে রানাঘাটে যাবেন পরীক্ষা দেওয়াতে। চারটি ছেলে—মনে আছে চক্কত্তিদের কানাই, আমি, সতু ও সারদা। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে বেরিয়ে শাবলতলার মাঠে যখন পড়েছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

বড্ড মনে আছে সেই অপরাহ্নের কথাটি। তখন শাবলতলার মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মস্ত বড় মাঠের এখানে ওখানে কুলগাছ সেওড়া-ডাঁটা আর বনতুলসীর জঙ্গল। ধূ ধূ করছে মাঠ যেন সমুদ্রের মত, কূলকিনারা সেই কোনওদিকে! এত বড় মাঠ কখনও দেখি নি। দুর্গাপুর থেকে শাবলতলার মাঠ প্রায় দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ পথ। কাছাকাছি কোন গ্রাম নেই এ মাঠের কোনওদিকে। একটা সরু মেঠো পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কি একটা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে দুপুরের রোদে। আমরা সবাই ছেলেমানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। উমাচরণ মাস্টার বললেন—যাও সব গাছতলায় একটু বসে নাও।

আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঁচকা। তার মধ্যে আমাদের বইপত্তর আছে, কাপড় গামছা ও কাঁথা আছে। থাকতে হবে নাকি হোটেলে। আমরা বোঁচকা নামিয়ে একটা কুলগাছের তলায় সবাই বসলাম। মাস্টার মশায় বললেন—দেখো তো কুল হয়েছে কিনা।

সতু দেখে বললে—কুল হয়েছে, ছোট ছোট—খাওয়া যায় না।

কানাইএর মা ওকে সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে নারকোলের নাড়ু আর রুটি করে দিয়েছিলেন পুঁটুলিতে। সতু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলে। আমি চাইতে গেলাম, কানাই বললে, নেই।

আমরা একটু পরে সবাই বোঁচকা রেখে হুটোপাটি করে মাঠের মধ্যে বনতুলসীর জঙ্গলে খেলা করতে লাগলাম। কি সুন্দর যে লাগছিল। ক্ষুদ্র গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খেলা করে বেড়াই, এত বড় মাঠের এত ফাঁকা জায়গায় খেলা করবার সুযোগ কখনও পাইনি। ওদের কেমন লাগছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোন নতুন রাজ্যে রূপকথার জগতে এসে পড়েছি—তুলসী মঞ্জরীর সুগন্ধভরা অপরাহ্নের বাতাসে যেন কোন্ সুদূরের ইঙ্গিত। যে দেশ কখনও দেখিনি, যার কথা কিন্তু আমার মনে সর্বদাই উঁকি দেয়, আজ এই শাবলতলার মাঠে এসে সেই দূর-দূরান্তরকে দেখতে পেলাম। ঝোপে ঝোপে শালিক আর ছাতারে পাখীর কলরব, এখানে ওখানে বেলে জমিতে খেঁকশেয়ালের গর্ত, রাঙা কেলেকোঁড়া ফুলের লতা জড়িয়ে উঠেছে বুনো কলচটকা আর তিত্তিরাজ গাছে, জন-মানুষের বাস নেই, একটা কলা গাছ কি আম গাছ চোখে পড়ে না, যেন এ জগতে মানুষের বাস নেই, শুধুই বনঝোপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করে পাতার ধুলো উড়িয়ে এ দেশে চলে যাও, লেখাপড়ার বিরক্তিকর বাধ্যতা এখানে নেই। খেলা ছেড়ে লেখাপড়া করতে কেউ বলবে না এ দেশে। উমাচরণ মাস্টার সেই পুরনো, একঘেয়ে, বালকের পক্ষে মহা বিরক্তিকর জগতের মানুষ, এ নতুন জীবনের উদাস মুক্তির মধ্যে, দিনরাতব্যাপী খেলা আর অবকাশের মধ্যে ওঁর স্থান নেই আদৌ।

বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সতু বললে—হ্যাঁরে, মাস্টার মশাই কোথায় রে?

আমি বললাম—কেন, কুলতলায় নেই?

—কতক্ষণ তো তাঁকে দেখছি নে। গেলেন কোথায়? আমাদের যেতে হবে না ইস্টিশনে? দু ঘণ্টার ওপর তো এখানে আছি। গাড়ী ধরতে হবে না?

আমার মনে হচ্ছিল গাড়ী ধরে আর কি রাজা হব আমরা! এই তো বেশ আছি, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে না-ই বা গেলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর এসে সেবার স্কুলে বলে গিয়েছিল রানাঘাট গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার নাকি নানা গোলমাল। খাতায় লিখে পরীক্ষা হয়, গার্ড আছে সেখানে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে, একটু যে দেখাদেখি করবে কি

বলাবলি করবে তার কোন উপায় নেই। বলাবলি করলেই মহকুমার হাকিমের সামনে গিয়ে হাজির করবে, তিনি জেলেও দিতে পারেন, জরিমানাও করতে পারেন। একটু ফিসফাস করবার জো নেই সেখানে। নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ঢুকতে হবে হল-ঘরে। কি ভীষণ পরিণাম ছাত্রজীবনের।

সত্যি বলছি, শাবলতলার মাঠ দেখবার পরে, এখানে এসে এই দু ঘণ্টা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর পরে আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই রকম বিশাল মুক্ত বনময় ধূলিভরা মাঠের অবাধ শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যে খেলা করে বেড়ানো। পরীক্ষা দিয়ে কি হবে! কানাই এসেও বললে—আমরা যাব কখন? মাস্টার মশাই কোথায়?

সত্যিই তো, তাঁকে কোনওদিকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই মিলে খুঁজতে বার হওয়া গেল। সতু ডাকতে লাগল—ও মাস্টার মশাই, মাস্টার ম-শা-ই—

কোনও সাড়া নেই।

সতু ভীতমুখে বললে—বাঘে নিয়ে গেল নাকি রে?

কানাই বললে—দূর, এখানে মানুষ-খেকো বাঘ থাকবে?

—না নেই! তোকে বলেছে!

—তবে গেলেন কোথায়?

আমি বললাম—তোমরা খুঁজে দেখ। আমি এখানে খেলা করি!

এমন সময় সারদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—শীগগির—শীগগির আয়—দেখে যা—

আমরা সবাই বলে উঠলাম—কি হয়েছে রে? বেঁচে আছেন তো?

কথা বলতে বলতেই আমরা সারদার পেছনে ছুটলাম। বেশ খানিকটা দূর দৌড়ে সারদা থেমে পড়ল এবং আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে আমাদের চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

একটা শুকনো খাল মত নীচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন সেই আর-একদিনের মত। জায়গাটাতে খুব ছায়া পড়েছে। কুঁচঝোপটায় পাখীরা কিচির কিচির করছে—সামনে অনেকদূর ফাঁকা। সুন্দর জায়গাটি। এই মাঠের মধ্যে এই জায়গাটাই সব চেয়ে ভাল। কবি উমাচরণ মাস্টার ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড় বিড় করে আপন মনে কি বকছেন, এমন কি আপন মনে ফিক ফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল। অমন তন্ময় হয়ে লিখতে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি, অমন ভাবে আপন মনে হাসতেও তাঁকে কখনও দেখিনি!

সতু মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই একজন আসল কবি।

সারদা ওর মতে মত দিয়ে বললে—ঠিক তাই।

কানাই ও আমি কোন কথা না বলে একদৃষ্টে এই সত্যিকার জীবন্ত কবিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের কত ভাগ্যি যে আমরা এমন মাস্টার পেয়েছি!

কানাই একটু পরে বললে—কিন্তু ভাই, সন্ধ্যে হল। ওঁকে না ডাকলে আমাদের উপায় কি হবে? ডাকি ওঁকে। কি বলিস?

কেউ সাহস করে না।

সারদার মনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা একটু ফিকে, সে দু-একবার আমাদের উপস্থিতি জ্ঞাপক কাসির আওয়াজ করলে।

সতু চুপি চুপি বললে—এই! আস্তে!

সারদা বললে—হ্যাঁ আস্তে বই কি! আমরা মরি এখন এই মাঠের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা!

বাঘে ধরুক সবসুদ্ধ—বলে সজোরে একবার কাসির আওয়াজ করতেই উমাচরণ মাস্টার চমকে পেছন ফিরে চাইলেন।

সারদা বললে—আসুন মাস্টার মশাই, সন্ধ্যের দেরি নেই যে—ইষ্টিশান এখনও অনেকখানি রাস্তা—

উমাচরণ মাস্টার ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র গুটিয়ে বগলে করে নিয়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন শুকনো খাল থেকে। অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন—তাই তো, বেলা গিয়েছে দেখছি। চল চল।

তার পর পেছন দিকে চেয়ে বললেন—জায়গাটা বড় চমৎকার—না?

সতু সশ্রদ্ধ সুরে বললে—ওখানে কি করছিলেন মাস্টার মশাই? কি আছে ওখানে?

উমাচরণ মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন—সে কি তুই বুঝবি? সিনারি কাকে বলে জানিস? চমৎকার সিনারি ওখানটাতে। কবিতা লিখছিলাম। কি চমৎকার মাঠটা বুঝিস কিছু?

আমারও চোখে যে এই অপরাহ্নে এই মাঠ অদ্ভুত ভালো লেগেছে, মাস্টার মশায়ের কথার মধ্যে তার সায় পেয়ে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি নতুন দৃষ্টি পেলাম সেই দিনটিতে, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে যাবার পথে। উমাচরণ মাস্টার কত বড় শিক্ষকের কাজ করলেন সেদিন—তিনি নিজেও কি তা বুঝলেন?

আমার কথা এইখানেই শেষ। উমাচরণ মাস্টারের ইতিহাসও এইখানেই শেষ। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা সে সব। উমাচরণ আজ আর বোধ হয় বেঁচে নেই। বড় হয়ে উমাচরণ চক্রবর্তী বলে কোন কবির লেখা কোথাও পড়িনি বা কারও মুখে নামও শুনি নি। তাতে কিছু আসে যায় না। যশোভাগ্য সকলের কি থাকে।

আজ এতকাল পরে শাবলতলার মাঠে এসে আবার মনে পড়ে গেল বাল্যের সেই অপূর্ব অপরাহ্নের কথা, মনে পড়ে গেল উমাচরণ মাস্টারকে। দুঃখ হল দেখে—সে শাবলতলার মাঠ একেবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সে সৌন্দর্য, সে নির্জনতা। উমাচরণ মাস্টারের জন্যে মনটা এতদিন পরে যেন কেমন করে উঠল।

দুর্মতি

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রান্তে হরিচরণ রায়ের ছোট একখানা কোঠাবাড়ি ছিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে তাহার স্ত্রী আর এক ছেলে। হরিচরণ রায়ের বয়স বছর ত্রিশেক, স্ত্রীর বয়স একুশ-বাইশ। হরিচরণ রায়ের লেখাপড়া এমন বিশেষ কিছুই জানা ছিল না, তাহার উপর নিতান্তই পাড়াগাঁয়ে মানুষ। কাজেই কোথাও না যাইয়া তিনি বাড়ি বসিয়া পৈতৃক আমলের সামান্য একটু জমিজমার খাজনা সাধিতেন। কচু কুমড়া বেগুন— আবাদ করিতেন ঠিক বলা চলে না—পুঁতিতেন; ইহাতেই তিন প্রাণীর একপ্রকার কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইত।

পৌষ মাস। খুব শীত। সন্ধ্যার সময় এক দূর প্রজাবাড়ী হইতে খাজনা আদায় করিয়া হরিচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী বীণাপাণি উঠানের তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতেছিল, স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তুলসীতলার প্রণাম সারিয়া, হাসিমুখে কাছে আসিয়া বলিল—তবে যে বলা হল ফিরতে অনেক রাত হবে? আমি এখনও ডাল বাটিনি।

হরিচরণ হাতের পুঁটুলি নামাইতে নামাইতে বলিল—এলাম চলে। খাজনা তো এক পয়সাও দেবে না, মিথ্যে হায়রান হওয়া।

বীণাপাণি হাতের প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া বলিল—একটু দাঁড়াও, আমি কুয়ো থেকে টাটকা জল তুলে দি, তবুও একটু গরম হবে এখন! এবার যে শীত পড়ল তাতে পুকুরের জলে আর কাজ চলবে না।

হরিচরণের ছেলে নীপু বাবার গলার স্বর পাইয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে নিশ্চিন্তমনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে তাকের হাঁড়ি হইতে আমসত্ত্ব চুরির কাজে ব্যাপৃত ছিল। বাবার গলার স্বরে বুঝিল বিপক্ষ সজাগ হইয়াছে। সে ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া আসিয়া বাবার বড় পুঁটুলিটা দেখিয়া হঠাৎ নিজের অসাফল্যের দুঃখটা ভুলিয়া গেল। বাবাকে সে একটু ভয় করিত। হঠাৎ কাছে না আসিয়া আঙুল দিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা এতে?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁরে, এই বাঁদর, এই শীতে একটা কিছু গায়ে দিতে নেই তোর? ওগো, নীপুর সে দোলাইখানা কোথায় গেল?

বীণাপাণি জলের বালতি নামাইয়া বলিল—সেই বিকেল বেলা থেকে বলছি ছেলেকে, ও কি কারুর কথা শোনে! গায়ে দিয়ে দিলেও গায়ে রাখবে না। ওই তো কাঠের আলনায় দোলাই রয়েছে।

হরিচরণ বলিল—হুঁ! সে বেতখানা কোথায় গেল?

নীপু প্রমাদ গনিয়া মার মুখের দিকে চাহিল। বীণাপাণি বলিল—থাক গো, আজ আর কিছু ব'লো না। তার পর ছেলেকে কাছে টানিয়া বলিল—এবার ফের কিন্তু যেদিন—

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল বীণাপাণি রান্নাঘরে বসিয়া ডাল বাটিয়া কি একটা পিঠা তৈয়ারির যোগাড় করিতেছে, বাহিরের কনকনে শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরিচরণ উনানের পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছে ও স্ত্রীর সহিত খোশগল্প করিয়া সমস্ত দিনের শ্রম নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। নীপু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বীণাপাণি ভুলই শুনুক কি যাই হক, স্বামী বাহির হইয়া যাইবার সময় সে শুনিয়াছিল তাঁহার ফিরিতে রাত হইবে, কাজেই যে ডাল পূর্বে বাটা উচিত ছিল তাহা সে এখন বাটিতে বসিয়াছে। ইহার পর কখন কি হইবে? বীণাপাণি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বাটিতে লাগিল।

হরিচরণ ভাল করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—অত করে তাড়াতাড়ি করছিস কেন রে? না হয় একটু রাতই হবে এখন। এই তো সবে সন্ধ্যে, শেষে আঙুল-টাঙুল ছেঁচে ফেলবি?

নিতান্ত ঘরোয়া লোক হরিচরণের স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণের রীতি এই রকমই। অবশ্য ছেলেপিলের সম্মুখে এবং বাহিরের লোকের কাছে সম্ভাষণের অন্য রীতি আছে। এটা নির্জনের একটু গাঢ় রকমের আদরের ডাক।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কেন? আঙুল কি রোজই ছেঁচি নাকি?

বীণাপাণি দেখিতে মন্দ নহে—রংটি খুব ফরসা না হইলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের গড়নটি বেশ সুন্দর, চোখদুটিও ডাগর ডাগর। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবধূ, কাজকর্মে থাকে বলিয়া শরীরেও বেশ নিটোল স্বাস্থ্য।

হরিচরণ তামাক টানিতে টানিতে বলিল—না, সত্যি বৌ, দেখ কতদিন ভাবছি, একজোড়া ভালরকম অনন্ত তোকে গড়িয়ে দেব, তা 'এই হবে, এই হবে' করে—বুঝলি না?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আজ দশ বৎসর ধরিয়া এ কথা শুনিয়া আসিতেছে। একজোড়া সোনার অনন্ত গড়াইয়া দেওয়া যে তাহার দরিদ্র স্বামীর পক্ষে কতটা অসম্ভব, তাহা সে বুঝিত। স্বামীকে

একটু ভুলাইবার জন্য সমদুঃখে বলিল—তা এবার তো হয়েও যেত ; ঐ সেটেলমেণ্টের খরচা দিতেই তো অনেকটা বেরিয়ে গেল।

হরিচরণের সামান্য যাহা কিছু জমিজমা ছিল, এবার সেটেলমেণ্টের খরচ বাবদ তাহার দরুন গভর্নমেণ্টের লোককে ত্রিশ টাকা দিতে হইয়াছিল। সে কিন্তু স্ত্রীর কাছে, ও যে-সব লোকে জমিজমার ধার ধারে না তাহাদের নিকট, প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, তাহার পৈতৃক অনেক জমি লোকে ফাঁকি দিয়া খাইত, এখন সেটেলমেণ্টে সেগুলি সে ফিরিয়া পাইয়াছে, প্রায় 'শদাবধি টাকা এজন্য তাহাকে খরচা দিতে হইয়াছে, সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পে তাহার খুব খাতির হইয়াছে, ইত্যাদি। স্ত্রীর চোখে বড় হইতে সকলেই চাহে।

স্ত্রীর মুখে সেটেলমেণ্টের কথা শুনিয়া হরিচরণ আরম্ভ করিল—দেখ্ সেদিন তো ক্যাম্পে গেলাম। আমাদের গাঁয়ের অনেক সব বড় বড় (হরিচরণ আঙুল দিয়া দেখাইল) হুঁ—হুঁ—ডেকে জিজ্ঞাসাও করলে না কানুনগো। আমি যেতে মাত্রই কানুনগো একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বললে 'আসুন জমিদার মশায়, আসুন!' সাতবেড়ের দরুন সেই জমার যে কাগজপত্র গোলমাল হয়েছিল বুঝলি তো—তা বলতেই কানুনগো মুহুরীদের সব বকে উঠল, বললে—'রায় মশায়, আমি না থাকলেই এরা সব গোলমাল করে ফেলে ; আপনি বসুন, আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'—সে খাতির কী!

স্ত্রীর ডাগর চোখের প্রশংসমান দৃষ্টিতে উৎসাহিত হইয়া হরিচরণ অধিকতর ভিত্তি-হীন কি একটা ফাঁদিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের বাহিরের বাড়ীর সদর দরজায় কে যেন ঘা দিতেছে শোনা গেল।

বীণাপাণি বলিল—ওগো, দরজায় কে যেন ঘা দেয়?

হরিচরণ বলিল—কই না, এত রাত্রে কে ঘা দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আঘাতের শব্দ ও কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বীণাপাণি বলিল—ঐ যে কে ডাকছে, দেখ না একবার?

হরিচরণ শঙ্কিত হইল। পূর্বেও যে আঘাতের শব্দ সে না শুনিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু এই শুনিতে না পাওয়ার ভান করিবার মূলে একটু প্রত্নতত্ত্ব নিহিত আছে। আজ তিন বৎসর পূর্বে ঠিক এই পৌষ মাসেই সে রামনারায়ণপুরের হাটে এক কাবুলী আলোয়ানবিক্রেতার নিকট ধারে দশ টাকা মূল্যের একটা আলোয়ান খরিদ করিয়াছিল। হতভাগ্য কাবুলীওয়ালা দুই বৎসর যাবৎ হাঁটাহাঁটি করিয়াও এ পর্যন্ত টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, হরিচরণের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পায় নাই। হরিচরণ শঙ্কিত চিত্তে সামনের উঠানে গেল। সেই কাবুলীওয়ালাটা এত রাত্রে আসে নাই তো? বিচিত্র কি! সঙ্গে কি সে তাহার দুই একজন দেশভ্রাতাদের আনিয়াছে? তাহা হইলে উপায়?

সন্তর্পণে বাহির-বাটীর দরজার নিকট যাইতে যাইতে হরিচরণ শুনিতে পাইল দরজার বাহির হইতে বাংলায় কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—'রায় মশায় কি বাড়ী আছেন? যাক বাঁচা গেল। তাহা হইলে কাবুলীওয়ালাটা নয়।'

হরিচরণ খিল খুলিয়া দিল। দেখিল বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রবেশী প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটেই কি হরিচরণ রায় মশায়ের বাড়ী?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে আমারই নাম।

প্রৌঢ় বলিলেন—তা বেশ। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আসছি কলকাতা থেকে—এই ট্রেনেই আসছি। তোমার শ্বশুর রামজীবনবাবু আমার একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর ওখানে একসময় আমার খুব যাতায়াত ছিল। তবে এখন আমিও বাইরে বাইরে থাকি, এইজন্যে ততটা আর—। তা বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবাজীবনকে দেখে। বীণা

এখানেই আছে তো?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসুন বাড়ীর মধ্যে।

মুখে অভ্যর্থনা করিলেও মনে মনে সে অত্যন্ত চটিয়া গেল। দিব্য শীতের রাত্রে স্ত্রীর সহিত গল্প জমাইয়া আনিয়াছিল, তা নয়, এখন আবার রাঁধ ভাত, নিয়ে এস জল-খাবার—কোথায়ই বা পিঠা, আর কোথায় বা কি! শ্বশুরগিরি ফলাবার আর সময় পেলেন না। এর চেয়ে সে কাবুলীওয়ালাও যে ছিল ভাল! নাঃ—এই সব দুর্বৃত্তের জন্য দুনিয়ায় আর সুখশান্তি নাই।

প্রৌঢ় বলিলেন—বাবাজি, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার হরিহরাত্মা ছিল। আমার নাম শুনেছ কিনা জানি না—আমার নাম কৃষ্ণলাল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব—তার ছেলেপিলে সব আমার কোলেপিঠে মানুষ। তোমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি লাহোরে চাকরি করি, কাজেই আসতে পারিনি। আহা, ছোকরা অল্প বয়সেই মারা গেল। সবই ভবিতব্য।

হরিচরণের বাড়ীর দালান ছিল নিতান্ত ছোট; পৈতৃক আমলের বাড়ী, অনেকদিন মেরামত হয় নাই। জানালার কবাট খুলিয়া পড়িয়াছে, কোন-কোনটি নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়া গরাদের সহিত বাঁধা। হরিচরণ কৃষ্ণলালবাবুকে দালানে একটা ছোট টুলের উপর বসাইয়া বলিল—বসুন, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।

কৃষ্ণলালবাবু বসিয়া দেখিলেন, দালানের দরজা জানালা একটাও ভাল অবস্থায় নাই। সবগুলির ফাঁক দিয়াই হু হু করিয়া হিম আসিতেছে। বন্ধুর এ কন্যাটি সকলের ছোট, তিনটি মেয়ের বিবাহ দিবার পর সর্বস্বান্ত হইয়া তাহার বিবাহ দেন। সে যে ভাল পাত্রে পড়ে নাই তাহা তিনি জানিতেন। কৃষ্ণলালবাবু মনে মনে কষ্ট অনুভব করিলেন।

মিনিট চার-পাঁচ পরে উত্তরদিকের দরজা ঠেলিয়া বীণাপাণি দালানে প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—এস এস, বীণু মা আমার এস। ওঃ, সেই তোর বিয়ের আগে মা—তখন আমি।

বীণাপাণি গলায় আঁচল দিয়া কৃষ্ণলালবাবুকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণলালবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন—এস এস, সাবিত্রী-সমান হও মা। দেখি মা বীণু মুখখানা তোর, কতদিন দেখিনি।

বীণাপাণির মাতাপিতা কেহ ছিল না। বাপের বাড়ী ভাই-এরা থাকিলেও পিতার মৃত্যুর পর তাহার বড় খোঁজখবর করিত না। আজ পাঁচ-ছয় বৎসর সে বাপের বাড়ী যায় নাই বা বাপের বাড়ীর কাহাকেও দেখে নাই। নির্জনে তাহার মায়ের মুখ মনে পড়িত, বাপের মুখ মনে পড়িত, শৈশবের সাথীদের মুখ মনে পড়িত, উঠানের বকুলতলায় সেঁজুতি ব্রতের কথা মনে পড়িত। তার বিরহী প্রাণটি পুকুরের ঘাটের চালতাতলায়, শত শৈশবের স্মৃতিভরা তাহাদের পাড়ার ধূলামাটির পথে পথে, সেই বকুলফুলদের বুকে মুখ লুকাইয়া মনের সমস্ত দুঃখকষ্ট উজাড় করিয়া দিত—অসহ্য তৃষ্ণায়। ভাইএরা তাহার খোঁজও করে না। সে ভাবিত, আজ মা-বাপ বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহাকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন? হাজার হউক, মেয়েমানুষ—অনেক দিন পরে পিতৃসম পিতৃবন্ধুকে পাইয়া তাহার সেই অভিমানই সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। ডাগর চক্ষু-দুটি ছাপাইয়া চোখের জল ঝরঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—ছিঃ বীণু, মা আমার—কেঁদো না। কাঁদে কি মা, ছিঃ!

বীণাপাণি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলেন জেঠামশায়?

—আমি তো লাহোরে ছিলাম অনেকদিন। তার পরে দেশে এসে সব শুনলাম। তোর বিয়ের সময়ও আমি চিঠি পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আসতে পারলাম না। বড় জরুরী কাজ পড়ে গেল। এই তো সেদিনকার কথা—

—নরুদা ভাল আছে জেঠামশায়?

—নরু ভাল আছে, পড়ছে। এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে।

—আমার কথা বলে নরুদা?

—বলে না মা! খুব বলে। নিজের বোন নেই, তোকেই বোনের মত ছেলেবেলা থেকে জানে। ছেলেবেলা খেলা হতে হতে তুই একবার ঝগড়া করে নরুর মুখ আঁচড়ে দিয়েছিলি, তোর মনে আছে বীণু?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিল; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শৈশবের সাথী নরুদার কথা মনে পড়ায় তার চোখের পাতা পুনর্বার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বলিল—নরুদা আমায় একবারটি দেখতে আসে না কেন জেঠামশায়? আপনি গিয়ে একবার পাঠিয়ে দেবেন?

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেব বই কি মা দেব। তবে এখন তো আসতে পারবে না, এবার যে তার পরীক্ষা কিনা। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন একবার দেখে যাবে বলে দেব।

বীণাপাণির মনে পড়িল, রাত হইয়াছে, জেঠামশায়ের আহারাদির বন্দোবস্ত তো করিতে হইবে। সে বলিল—আপনি বসুন জেঠামশায়—

কৃষ্ণলালবাবু শশব্যস্ত প্রায় চৌকি হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—শোন মা, শোন। আমার জন্যে রাত্রে কিছু রাঁধতে-টাধতে হবে না। আমি রাত্রে বরং—

বীণাপাণি ঘাড় বাঁকাইয়া জননীর মত শাসনের সুরে বলিল—আচ্ছা সে হবে, বসুন জেঠামশায়। আমি সে বুঝব।

কৃষ্ণলালবাবু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বীণাপাণির বড় ইচ্ছা হইল জেঠামশায়কে শীতের রাত্রে গরম গরম লুচি ভাজিয়া খাওয়ায়। কিন্তু পয়সা কই? তাহাতে এখনই তো প্রায় একটাকা খরচ। সংসারে অসচ্ছলতা যে কতদূর তাহা তো সে জানে। সে রান্নাঘরে গিয়া দেখিল স্বামী উনুনের পাড়ে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়াই হরিচরণ বলিল—তা, কি, ভাত-টাত তো আবার রাঁধতে হবে?

বীণাপাণি বলিল—একটা কথা বলি, রাখবে? জেঠামশায়ের বয়স হয়েছে। আমার কাছে এসেছেন, এ সময় যদি একটু সেবা-যত্ন করতে না পারব তবে মেয়েজন্ম মিথ্যে নিয়েছিলাম। আমি ভাবছি জেঠামশায়কে খানকতক লুচি ভেজে দিই। তুমি তোমার সেটেলমেণ্টের টাকা থেকে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে বিপিনের দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এস না?—আনবে?

হরিচরণ কিছু পূর্বে স্ত্রীর নিকট যে জমিদারগিরির আস্ফালন করিয়াছিল, আসন্ন বিপদের মুখে সে কথা ভুলিয়া গেল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—তা তো আনলে ভালই হত—মানে আনা তো কিছু উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে কি, এই চব্বিশের মধ্যে টাকা দাখিল না করলে আবার সার্টিফিকেট জারী হবে। ঐ যা যোগাড় করা আছে—তা থেকে—

বীণাপাণি উপায় ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল, বলিল—তুমি তার জন্যে ভেবো না, আমার কানের ছেঁদা ভাল হয়নি, মাকড়ি পরতে বড় ব্যথা হয়—আজই খুলে রাখতাম, তা নীপুর জন্মবার বলে খুলিনি। তুমি ঐ থেকে টাকা নিয়ে যাও, কাল সকালে বরং মাকড়ি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা কোথাও পাবে না? মাকড়ি তো সেই খুলতেই হবে?

ইহার পর আর কোন প্রতিবাদ করা ভাল দেখায় না বলিয়া হরিচরণ বলিল—তবে

একটা বাটি দাও, ঘিটা আনতে হবে। যাই দেখি—

হরিচরণ চলিয়া গেলে বীণাপাণি দালানে গিয়া দেখিল কৃষ্ণলালবাবু চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া কি সব জিনিসপত্র বাহির করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মা বীণু শোন, এদিকে আয়। আমার একটা সাধ তোকে পুরোতে হবে মা।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কি জেঠামশায়?

—তুই ছেলেবেলা আমার কাছে বসে আমার জলখাবার থেকে তুলে খেতিস তোর মনে আছে? আমি কলকাতা থেকে খাবার এনেছি ব্যাগে করে, তোকে ছেলেবেলার মত খাওয়াব বলে। আয় এখানে বোস বীণু—তোকে কতদিন খাওয়াইনি! তখন এই সব খেতে তুই খুব ভালবাসতিস তোর মনে আছে? আয় মা, এখানে বোস দিকি।

জেঠামশায়ের কথা শুনিয়া বীণাপাণির খুব আমোদ অনুভব হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, বাপ-জেঠা ভিন্ন কি কেউ মেয়ের কষ্ট বোঝে? সে খাইতে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সেজন্য এখানে তো কেউ কোনদিন তাহাকে আদর করিয়া ভাল কিছু খাইতে দেয় নাই, পূর্বে তো তাহার শ্বশুরশাশুড়ী বর্তমান ছিলেন! আর জেঠামশায় আজ কলিকাতা হইতে ব্যাগে বহিয়া খাবার আনিয়াছেন তাহাকে খাওয়াইবার জন্য! শুধু যত্ন ও স্নেহ দান করিতে করিতে তার মনটি যে গৃহিণী ও জননীর প্রবীণত্বে উপনীত হইতেছিল, আজ এই প্রৌঢ়ের সংস্পর্শে তাহার সে মনটি আবার দশ বৎসরের ছোট মেয়ের মত হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ঘুমন্ত খোকা নীপুর কথা মনে পড়িল—সেও খাবার খাইতে ভালবাসে। এ পর্যন্ত জেঠামশায় নীপুর কথা কিছু বলেন নাই, বোধ হয় তাহার কথা তিনি জানেন না—জানিলে নিশ্চয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নিজে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল।

বীণাপাণি আসিয়া জেঠামশায়ের কাছে গিয়া বসিল। কৃষ্ণলালবাবু আহ্লাদে আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইলেন। বাম হাতে বীণাপাণির মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে তিনি তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন। স্নেহ মায়ায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন—মা বীণু, সেই তুই ছেলেবেলায় আমার জল-খাবার থেকে জোর করে টপ টপ খাবার তুলে খেতিস, তোর মনে আছে কি? তখন তুই খুব ছোট। মা আমার কত রোগা হয়ে গিয়েছে (এ কথা সত্য নহে, কারণ বীণাপাণি পূর্বাপেক্ষা বরং সুস্থই ছিল)—আজ যদি রাম থাকত—! এইটে খেয়ে দেখ মা, একে রাজভোগ বলে—এ তুই কখনও খাসনি, এ কলকাতা ছাড়া সব জায়গায় বড় একটা মেলে না! কেমন ভাল নয়?

বীণাপাণির মনে হইল নীপু কখনও রাজভোগ খায় নাই। সে খাইতে খাইতে নতমুখে ঘাড় নাড়িল।

আরও কিছু খাইবার পর বীণাপাণি বলিল—জেঠামশায়, আর কত খাব?

—আচ্ছা, এই অমৃতিখানা শুধু খা। আর খাবারগুলো তুলে রেখে দে, জামাইকে—। তার পর বলিলেন—একটু দাঁড়া, এই দেখ্ দিকি, এই ব্রেসলেট-জোড়াটা তোর জন্যে গড়িয়েছি মা, দেখ্ দিকি, হাতে হবে তো?

কৃষ্ণলালবাবুর নিজের মেয়ে ছিল না। বন্ধুকন্যাকে শৈশব হইতেই তিনি নিজের কন্যার ন্যায় দেখিতেন। বহুদিন দেশে আসেন নাই—বিদেশ হইতে দেশে আসিবার সময় প্রথমেই তাঁহার বীণাপাণির কথা মনে পড়িল। প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া দিল্লীতে তিনি বীণার জন্য এই ব্রেসলেট-জোড়া করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণলালবাবু ব্রেসলেট-জোড়াটি বীণাপাণিকে দেখাইবার জন্য প্রদীপের সম্মুখে ধরিলেন। ক্ষীণ আলোয় তাহার চারিদিকের পাথরগুলি ঝক ঝক করিয়া উঠিল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট দেখিয়া শুধু আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হইয়া গেল, সে এরূপ জিনিস কখনও দেখে নাই। ওগুলি কি জ্বলিতেছে, পাথর? পাথর ঐরকম জ্বলে নাকি?—ওমা! বিস্ময়ে তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেখি মা, তোর হাত?

বীণাপাণির হাতের সবুজ ও লাল রঙের জারমানি কাঁচের চুড়িগুলোকে বিদ্রূপ করিয়া ব্রেসলেটের দামী চুনি, পান্না, হীরা-জহরতগুলি যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রদীপের আলোক শতভাগে ভাগ করিয়া ব্রেসলেট-জোড়া বীণাপাণির হাতে যেন লাল সবুজ নীল আগুনের ফুলকি উড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

বীণাপাণি নিজের হাতের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিল না। গহনা আবার এ রকম হয় নাকি?

কৃষ্ণলালবাবু বীণাপাণির ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে গহনাটি তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিতরূপে সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেন। আহা, গরীবের ঘরে পড়িয়া মেয়েটা কত কষ্টই পাইতেছে, তবু এ বুড়ো তো তাহাকে একটু আনন্দ দিতে পারিল।

এই সময় হরিচরণ দোকান হইতে ফিরিল। দালানের বাহিরে তাহার আসিবার শব্দ শুনিয়া বীণাপাণি দালান হইতে সরিয়া গেল। একটু পরে সে যখন রান্নাঘরে লুচি ভাজিতে বসিয়াছে, হরিচরণ সেখানে আসিলে বীণাপাণি হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ কি দেখাব বল দিকি?

কৃষ্ণলালবাবু হরিচরণকে গহনার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কারণ বলা তাঁহার পক্ষে একটু অশোভন হইত।

হরিচরণ বলিল—কি?

ব্রেসলেট পাইয়া বীণাপাণির আনন্দ আর ধরিতেছিল না। সে ব্রেসলেটটা স্বামীকে দেখাইবার জন্য কেসে পুরিয়া কেসটা রান্নাঘরে আনিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে একটু কৌতুক করিতে ইচ্ছা হইল, বলিল—আচ্ছা, একটুখানি চোখ বুজিয়ে থাক দিকি নি, আমি একটা ভেল্‌কি দেখাব।

হরিচরণ বলিল—কি, শুনি না?

বীণাপাণি বলিল—আচ্ছা, বোজাও না একটু চোখ, দেখাচ্ছি।

—আমি পিছন ফিরছি, কি দেখাবে দেখাও।

বীণাপাণি কেস খুলিয়া নিজের হাতে পরিল, তার পর হাসিমুখে বলিল—চেয়ে দেখ এদিকে।

হরিচরণ হঠাৎ চাহিয়া দেখিতেই যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল—কি ও?

বীণাপাণি বলিল—কি বল দেখি?

হরিচরণ নীচু হইয়া স্ত্রীর হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। সেও দরিদ্রসন্তান, এরকম জিনিস কখনও দেখে নাই—হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ ব্রেসলেট-জোড়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

বীণাপাণি সকৌতুকে বলিল—কোথায় পেলাম বল দেখি?

হরিচরণ বলিল—উনি দিলেন বুঝি? দেখি—। তাহার পর ব্রেসলেটের পাথরগুলির উপর সন্দিগ্ধভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এগুলো বোধ হয় কাঁচ। এরকম কাঁচবসানো আংটি তো দেখেছি—কলকাতা থেকে হরিগাঁয়ের মেলায় বিক্রি করতে আনে—এর দাম বেশী নয়।

বীণাপাণি বিজ্ঞ জহুরীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল—হ্যাঁ, কাঁচ! এসব

পাথর, খুব দামী পাথর।

হরিচরণ বলিল—তুই কি করে জানলি পাথর? তুই পাথর চিনিস?

বীণাপাণি মুখ হইতে বিজ্ঞতার বোঝা ভাল করিয়া না নামাইয়াই বলিল—জেঠামশায় বললেন যে।

হরিচরণ ব্রেসলেট-জোড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিল, তার পর বলিল—তা যদি হয় তাহলেও কিন্তু এর দাম তিন শ টাকার এক পয়সা বেশী নয়।

বীণাপাণি সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—তুমি কি করে বুঝলে? জেঠামশায় যে বললেন পাথরগুলোর দাম খুব বেশি?

হরিচরণ বলিল—এ রকমই হবে। তিন শ না হক, সাড়ে তিন শ-ই হল—তার বেশি আর কত হবে। আজকাল পাথরের দাম কি। আর পাথরেই তো সব জায়গা ছেয়ে ফেলেছে, সোনা আর ওতে কতটুকু আছে!

বীণাপাণির একথা বিশ্বাস হইল না। এক জোড়া অনন্ত গড়াইতে সে শুনিয়াছে পাঁচশ টাকার বেশি পড়ে, আর এক জোড়া পাথরবসানো ব্রেসলেট যে তিন শ টাকায় হইবে, ইহা তাহার আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

রাত্রি বেশি হইবার ভয়ে বীণাপাণি খুব শীঘ্র শীঘ্র খাবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। তার পর জেঠামশায়কে ও স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া শুইতে গেল।

পরদিন ভোরে জেঠামশায় নীপুকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। সেদিনকার বীণু—তাহার ছেলে অত বড় হইয়াছে! সমস্ত সকাল নীপুর সঙ্গছাড়া হইলেন না, দুঃখ করিতে লাগিলেন, বীণুমার খোকা হইয়াছে জানিলে তিনি তাহার জন্য একটা চেন গড়াইয়া আনিতেন।

কলিকাতায় কৃষ্ণলালবাবুর জরুরী কাজ। দুপুরে ট্রেনে রওনা হইবার ইচ্ছা থাকিলেও, বীণাপাণির চোখের জল এড়াইতে না পারিয়া তিনি বৈকাল পর্যন্ত রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্বে হরিচরণ তাঁহাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

সাত-আট দিন হইয়া গেল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট-জোড়া মাত্র বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য পরিত, অন্য সময়ে বাসন মাজা, উঠান ঝাঁট, রান্নাবান্না করা—ইহার মধ্যে কখন সে ব্রেসলেট পরে। ব্রেসলেট-জোড়া তাহার কাছে যেন নিত্য নূতন ঠেকিত। প্রদীপের মৃদু আলোয়, নীল-লাল-সবুজ আলো যখন ব্রেসলেটের গা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িত, বীণাপাণি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠিত হাত দুটিতে ব্রেসলেট জোড়াটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।

হরিচরণ একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া বলিল—বৌ, তোর হাতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু। বীণাপাণির মুখ লজ্জায় ও আনন্দে রাঙা হইয়া উঠিল।

সাত-আট দিন পরে মাঘ মাসের মাঝামাঝি রায়-বাড়ীতে একটা বড় নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইল। বীণাপাণির অনেক দিনের একখানা জরিপাড় কাপড় তোরঙ্গের ভিতর তোলা ছিল। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে এই কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিত। হরিচরণ মুখে যতই আস্ফালন করুক, স্ত্রীকে ভাল কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। অত্যন্ত পুরাতন হইলেও বীণাপাণি কাপড়খানাকে অতি যত্নের সহিত ব্যবহার করিত। এই নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিল ও মেয়েমহলে দিগ্‌বিজয়ের লোভ সামলাইতে না পারিয়া ব্রেসলেট জোড়াও হাতে পরিয়া যাইতে গেল। তাহার ইচ্ছা নিজেকে লোকের চক্ষে বড় করা। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষদের জ্ঞান ও বিদ্যা

আছে, তাহারা লোকসমাজে তাহাই দেখাইয়া বেড়ান, কিন্তু বেচারী মেয়েদের সে সম্বল নাই, কাজেই তাহারা শুধু গহনা দেখাইয়া বড় হইতে চাহে।

সন্ধ্যার একটু পরে বীণাপাণি নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিল। একাদশীর জ্যোৎস্না অল্প অল্প উঠিয়াছে, বাড়ীতে কেহ নাই—নীপুকে রায়-গৃহিণী ভালবাসিতেন, রাত্রের জন্য তাহাকে রাখিয়া দিয়াছেন—সকালে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিবেন। বীণাপাণি ভাবিল স্বামী এখনও বাড়ী আসেন নাই, ততক্ষণ গা ধুইয়া ও কাপড়খানা কাচিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিবে। পুকুরের ঘাটে যাইবার সময় দেখিল, বাগানের বেড়ার ওপারে বসিয়া স্বামী কি কাজ করিতেছেন। গা হাত ধুইয়া পুকুর হইতে উঠিবার সময় সে দেখিল স্বামী বেড়ার ধারে নাই, বোধ হয় উঠিয়া বাড়ী গিয়া হাত-পা ধুইতেছেন। বাড়ী আসিয়া দেখিল, দুয়ার যেমন তেমনই তালা লাগানো আছে—স্বামী বাড়ী নাই। ভাবিল বোধ হয় পাড়ায় কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন। জলের ঘড়া দালানের মুখে নামাইয়া সে ঘড়ার জলে হাত-পা ধুইয়া রকে উঠিল—কুলুঙ্গি হইতে চাবি লইয়া ঘর খুলিল, তার পর শুকনা কাপড় পরিয়া প্রদীপ জ্বালিল। জলের ঘড়া বাহির হইতে আনিয়া ভিতর হইতে দালানের দোর বন্ধ করিয়া রান্নাঘরে যাইবে, এমন সময় তাহার ব্রেসলেটের বাক্সের কথা মনে পড়িল। নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া ব্রেসলেট খুলিয়া কেস-সুদ্ধ গহনা দালানের উপর রাখিয়াছিল, তুলিয়া রাখিবার জন্য সেখানে গিয়া বীণাপাণি দেখিল—ব্রেসলেটের কেস দালানে নাই! ভাবিল, তবে কি নীচে পড়িয়া গেল? আলো ধরিয়া দেখিল, সেখানেও নাই!

বীণাপাণির মুখ ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই মনে হইল বোধ হয় স্বামী ঘরে আসিয়া জিনিসটা অসাবধানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া থাকিবেন। তাহার নিজের তোরঙ্গের চাবি নিজের কাছে—স্বামীর নিজস্ব একটা তোরঙ্গ ছিল, তাহার চাবি ছিল না, সেটা খুলিয়া দেখিল তাহাতেও নাই। এ-কুলুঙ্গি সে-কুলুঙ্গি খুঁজিল, বাক্সের উপর-নীচে দেখিল, ঘরের কোণে খুঁজিল—কোথাও নাই। গরিবের গৃহস্থালি, বাক্স-প্যাঁটরার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। যাহা ছিল তাহার কোথাও ব্রেসলেটের কেস খুঁজিয়া পাইল না। বীণাপাণি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—তাহা হইলে অন্য কেহ কি ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিল? সে কথা ভাবিতেও পারিতেছিল না—ভাবিতেই তাহার বুক কেমন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

চুরি গিয়াছে এ কথায় আমল না দিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তবে কি তাহার স্বামী কৌতুক দেখিবার জন্য গহনার বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছেন? নিশ্চয় তাই—নতুবা আর কে লইতে পারে?

হরিচরণের সেদিন বাড়ী ফিরিতে বেশ বিলম্ব হইল। সে কোনদিন এত রাত্রি করিয়া ফিরে না। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত অনেক। তাহার একহাঁটু ধুলিকাদা, যেন অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে। হরিচরণ ঢুকিয়াই বলিল—ওঃ, আজ যা ঘোরাঘুরি হল। সেই বেলা দুটোর সময় তুমি নেমন্তন্ন গেলেই বেরিয়েছি আর অনবরত ঘুরছি। তা তুমি এসেছ কখন?

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আহা, আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারিনি, কচি খুকি কিনা! সে তুমি বের হয়ে গেলেই আমি ধরেছি।

হরিচরণের মুখ হঠাৎ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। একটু পরেই সে কথা বলিল বটে, কিন্তু সে যেন অনেক চেষ্টা করিয়া—কি বল দেখি? সত্যি বলছি আমি তো বাড়ী ছিলাম না। আমি সেই দুটোর সময়েই চলে গেছি খাজনা আদায় করতে। তুই কিসের কথা বলছিস?

তাহার স্বরে লেশমাত্র কৌতুকের আভাস ছিল না।

বীণাপাণি স্বামীর কথায় ও চোখমুখের ভাবে চিন্তিত হইল, বলিল—সেই ব্রেসলেটের বাক্স কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না। সন্ধ্যের আগে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে দালানের ওপর রেখে গেলাম, তার পর ঘাট থেকে এসে দেখি আর নেই! তুমি সত্যি জান না? না, জান। সত্যি সত্যি বল লক্ষ্মীটি।

হরিচরণ লাফাইয়া উঠিল—অ্যাঁ, বল কি! ব্রেসলেটের বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না? কি সর্বনাশ! অ্যাঁ! সে যে অনেক টাকার জিনিস। আমি কি করে জানব বল, আমি তো এখানে ছিলাম না। আমি কি মিথ্যে বলছি! সেই দুটোর সময় বেরিয়ে গিয়েছি—আমি তো কিছুই জানি না।

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া বুদ্ধি হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—বেলা দুইটার সময় বাহির হইয়া যাওয়ার কথাটা। স্বামী এত জোর করিয়া বলিতেছেন কেন? সে যে তাঁহাকে সন্ধ্যার পর বেড়ার পাশে গাবতলায় বসিয়া কঞ্চি কাটিতে দেখিয়াছে। স্বামীর আস্ফালন ও বিস্ময়ের মধ্যে একটা মিথ্যার ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া যেন বাজিতে লাগিল।

হরিচরণ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বল কি! সে তো এক-আধ টাকার জিনিস নয়; তুমিই বা সেটাকে ফেলে অমন করে যাও কেন? যাঃ—সর্বনাশ হয়ে গেল। ভাল করে ঘরদোর খুঁজেছ? চল দেখি, আমি একবার খুঁজে দেখি। ওসব মেয়েলি খোঁজার কাজ নয়—যাবে কোথায়, ঘরেই কোথাও পড়ে আছে।

বীণাপাণি দালানের মেঝেতে বসিয়া পড়িল। একটা নূতন রকমের ভয় তাহার মনের মধ্যে দেখা দিল। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? বীণাপাণি কখনও স্বামীকে অবিশ্বাস করে নাই—স্বামীর কথা এবারও সে অবিশ্বাস করিত না, যদি সে সন্ধ্যার সময় তাহাকে না দেখিত। বুদ্ধির দিক হইতে না হইলেও তাহার নারী-হৃদয়ের অনুভূতিশক্তি কেমন করিয়া বুঝিয়া ফেলিল, স্বামী প্রতারণা করিতেছে।

তাহার ভয়টা অস্পষ্ট রকমের। কিসের জন্য এ ভয় তাহা সে বুঝিল না। ব্রেসলেট তো তুচ্ছ—তাহার জন্য এ ভয় নয়। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? তবে কি—? কথাটা সে ভাবিতেও পারিল না, কিন্তু মনের মধ্যে সেকথা স্পষ্টভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও একটা মহাযন্ত্রণাকর অনুভূতি মনের কোন্ গোপন তল হইতে যেন ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই—তাহা আবছায়ার মতই অস্পষ্ট, অথচ তীক্ষ্ণ ও কঠিন—রাত্রিশেষের হিমকণার মত ঠাণ্ডা তাহার গোপন সঞ্চার।

সেই তীক্ষ্ণ শৈত্য ক্রমে ক্রমে তাহার হৃৎপিণ্ডে পৌঁছাইয়া সেখানকার উষ্ণ রক্তস্রোতকে যেন জমাট বাধাইয়া দিল। তাহার চোখের সামনে হরিচরণ হাঁকডাক করিয়া ঘর তোলপাড় করিতে লাগিল। বাক্সের নীচে, সিন্দুকের নীচে, চৌকির নীচে, এবং তাহা ছাড়া যত অসম্ভব স্থানে খুঁজিতে লাগিল—বীণাপাণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীকে কি বলিবে? একবার ভাবিল, বলে যে সে তাহাকে সন্ধ্যার সময় ঘাটে যাইবার পথে দেখিয়াছে—কিন্তু—নাঃ, ছিঃ.....

সেদিন তো বটেই, পরের দিনও কাটিয়া গেল। ব্রেসলেটের কোন সন্ধান হইল না। হরিচরণ বলিতেছে যে, সে থানায় গিয়া ডায়েরি করিয়া আসিয়াছে, এখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল—আর চলে না, ইত্যাদি।

শীতের সেই ঠাণ্ডা রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল—ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো বিছানায় আসিয়া পড়িল। বিবাহের পর হইতে আজ পর্যন্ত যে মধুর

অনুভূতি তাহার মনের মধ্যে চিরজাগরিত ছিল, দুঃখে কষ্টে যাহা তাহার নীরব অবলম্বন, জানালার বাহিরের ঐ ভোরের জ্যোৎস্নার মত তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। সংসারের শত অনটনেও মুখে যে হাসি তাহার চিরদিন ফুটিয়া থাকিত, এ কোন্ নিষ্ঠুর অপহারক তাহার সরল নারী-হৃদয়ের সে গোপন ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে লুটিয়া লইল! আজ দশ বৎসর ধরিয়া তিল-তিল সঞ্চয়ের সে যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার!

গাছে গাছে পাখীরা সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়া কলরব করিতে লাগিল, বীণাপাণি বিছানা হইতে উঠিয়া তখন বাহিরে গেল। সমস্ত রাত না ঘুমাইয়া তাহার চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশগাছের মাথা অন্যদিনের মত আজও ভোরের হিঙ্গুলরাগে রাঙা, পুকুরের পথে কচি কচি ঘাসদলে শিশিরের জলের আলো আজও রামধনুর রঙ ফলাইয়াছে—আস-শেওড়ার ঝোপের মাথায় রাঙালতার সাদা ফুলগুলি অন্যদিনের মতই নবপ্রস্ফুট; কিন্তু পৃথিবীর চেহারা একরাতেই তাহার কাছে বদলাইয়া গেল কিসে?

সমস্ত দিন কোনও রূপে কাটিল। বীণাপাণির মুখে ব্রেসলেটের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন কথাই আর শোনা যায় নাই। চুপ করিয়া কলের পুতুলের মত সে সংসারের কাজ একে একে করিয়া গেল। রাত্রে শুইয়া তাহার আর ঘুম হইল না। তাহার সকল নির্ভরতা-ভরা নারীহৃদয় যেন নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে যখন হরিচরণ উঠিল তখনও বীণাপাণি শুইয়া। হরিচরণ কাজে বাহির হইয়া গেল; ফিরিল যখন, দেখিল নীপু রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল বীণাপাণি তখনও বিছানায় শুইয়া। স্ত্রীকে গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল তাহার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। সংজ্ঞা নাই—জ্বরের ঘোরে অঘোর-অচৈতন্য।

হঠাৎ অনুতাপের দংশনে হরিচরণের মন তীব্র বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সেদিন সে-ই সন্ধ্যার সময় গহনা চুরি করিয়াছিল নানাদিকে দেনা ও পাওনাদারের জ্বালায় বিব্রত হইয়া। তাহার পূর্বে কয়েকদিন হইতেই তাহার স্ত্রীর ব্রেসলেট জোড়াটার উপর লোভ হয়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিল, দালানের উপর ব্রেসলেটের বাক্স। লোভ সামলাইতে না পারিয়া সে-ই ব্রেসলেট চুরি করিয়া রামনারায়ণপুরে এক মারোয়াড়ীর দোকানে গিয়া বিক্রয় করিল মোট সাত শত টাকায়! ভাবিয়াছিল, পরে না-হয় একদিন সব প্রকাশ করিবে।

স্ত্রীর মাথার কাছে গিয়া ডাকিল—বৌ, ও বৌ!

বীণাপাণি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ জবাফুলের মত লাল! হরিচরণ পাগলের মত রামহরি ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—জ্বরটা খুব বেশিই হয়েছে, তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। শিশিটা পাঠিয়ে দেবেন, ওষুধ দেব।

সেইদিন বৈকাল হইতে কিন্তু বীণাপাণির অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল। শেষ-বেলা হইতেই ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল—ওগো, আমায় বললে না কেন? মুক্তোর মালাছড়াটা তোমায় এমনিই পরিয়ে দিতুম—আমি তো রাখতে চাইনি—

ডাক্তার বলিলেন—আজকের রাত আর টিকিবে কিনা সন্দেহ।

দশ-বারো বৎসর পরের কথা।

নীপু এখন বড় হইয়াছে। সে বেশ ভাল ছেলে হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আই-এ পরীক্ষা দিবে। হরিচরণের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মেঘলতা তাহাকে নিজের ছেলের মতই বেশ আদরযত্ন করে। এ পক্ষে হরিচরণের আরও দুই ছেলেমেয়ে হইয়াছে। গ্রামে একখানা ছোট মুদিখানার দোকান করিয়া এখন তাহার একপ্রকার ভালই চলে। শীতের সন্ধ্যায়

চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে অনেক সময় তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগে রান্নাবাড়ীর উঠানে বীণাপাণি একটা ডালিমের চারা পুঁতিয়াছিল। শীতকালে যখন রাঙা রাঙা ফলের ভারে গাছটার ডালগুলি নুইয়া পড়ে, তখন ভাত খাইতে খাইতে সেদিকে চাহিয়া হরিচরণের গলায় ভাত বাধিয়া হঠাৎ বিষম লাগিয়া যায়। তাহার ছোট মেয়ে পুঁটি বলে—মা, তুমি তরকারিতে এত ঝাল দাও কেন? ঝালের চোটে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে!

ফকির

ইচু মণ্ডলের আজ বেজায় সর্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হল তার।

ইচু বললে—আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে—জনে যাবে না তবে চলবে কিসি?

—কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে?

—এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

—তবে আর কি? পানি দে—নমাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নমাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নমাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।

নিমি বললে—উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না। ও ভাল না।

ইচু বললে—নমাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নমাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে—খিদে পেয়েছে। কি আছে রে?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দুটো-কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থৈ থৈ করছে তার জল, ধারে ধারে কাশ বনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমি লতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখী ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে

—যাবা কোথায়?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছে?

—সাত সিকি করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা?

—নিয়ে যাও, ওই বেনা ঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হাঁফ জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু-পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে মজুরদের একবেলা খোরাকি।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে—ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভালমানুষ, কারও কোন কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ীর চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে?

—কেন, কি হয়েছে চাচা?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

—ওবেলা এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয়নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে, তখন খুব হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়ীতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন? দিন-দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ী হাজির হল।

মুখুয্যে মশায় বললেন—কি রে ইচু, কি মনে করে?

ইচু বললে—সালাম বাবু! একটা বড্ড ভুল করে ফেলেছি!

—কি রে?

—আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতে চাই।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তার পর পরম্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়ী সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার-পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশী হয়ে বললেন,—যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ীর মধ্যে তোর কাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলে পেঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পেঁছয়নি। এটা পছন্দ করে না সে। বেশি রেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ-চলতি লোকে জিজ্ঞেস করে—কি ধান এটা গো?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয়?

—বিঘেয় না কি কাঠায়?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে—কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলিকি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

—বাড়ী কোথায় তোমার?

—শাইলপাড়া।

—নাম?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ী দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুর-দের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘণ্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ এট্টু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পাবে না।

—নুন কনে পাবা? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি ঢ্যালা বেরুল। কেরাচিনি তেলের মুখ দেখিনি কত-

কাল।

—কুমড়োর ঝালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটা ভরি খেতি দেয়। কেরাচিন্নি পাবা কোথায়?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আখের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজালে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললে—হ্যাদে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়স হল ক কুড়ি?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হল পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায় যায়। পাঁচটার গাড়ী গড় গড় করে মাদলার বিলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নমাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা?

—না গো।

—কেন?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ী, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা, সর্দারের বাড়ী তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ করো না সর্দার।

—রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন?

—অনেয্য তো কিছু বলছি নে।

—অনেয্য নয় চাচা? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা! হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দুজনে খেয়ো।

—শসা পুতেছিলে? মাচার শসা, না মেঠো?

—মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা—কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বলো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু সের তিন সের—তাই এখন বলো আট আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

—তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে—দুটো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।

—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিও সর্দার, কারও কাছে পেরকাশ করো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধেছিস?

—এ বেলা শরীরটে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারিনি—আবার কি ধার করতি ছোটব?

—পোড়া?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাবা গো! ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও শুনিনি। খেতি পারবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হোল পাকাটির আলো জেবলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে, উঁচু-নীচু—উঁচু-নীচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ীর উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর গলা—ও ইচু, ইচু বাড়ী আছ?

বছিরদ্দি শেখ ডাকছে—ও ইচু, বলি ওঠ—শোন ইদিকি।

ভোর সবে হয়েছে। কাক-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছলে। ফজরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে। বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গা মোড়লের পো?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বললে—ইদিকি এস।

—আগে নমাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে।

ইচু ঘরের পেছনের নমাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে এক-সঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল? হয়েছে কি?

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেল লাইনে উঠল। একটা খেজুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার? ইচু এগিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচুকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যই গ্রামের লোক তার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা. আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বললে? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচু সে রকম লোক নয়। চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ সাত জন ওকে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ লিয়ে ফেলি। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—ট্যাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন। তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বললে—তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা দ্যাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশ ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেননি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরী দুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন—কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ী, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল দুখানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কেথেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ী কোথায়?

হাফেজ মণ্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালাম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বৌ গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল?

—বাড়ীতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার নিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না! সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে!

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভালমানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিচ্ছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বললেন—তুমি কি করে জানলে? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি? যা তুমি জান তাই বল; যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি করো না। যাও বস ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবে ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিজ্ঞেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

—আত্মহত্যা নয়?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে?

—বাবু, মোর ভাই আর নাবি শেখ সকালে রেল লাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে। গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ তো? বেশ করেছ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মণ্ডলের উপরই পড়বে। বৌ-এর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে?

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে না—দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবে। বাড়ী গিয়ে পয়সা-কড়ি যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁয়ে মোক্তারবাবুর টাকাই যোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলায় কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি যোগাড় হয়ে উঠবে? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বললে—বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এই রকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম—বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছে।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই; আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিন-দুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না—কি—কি বল—

—বাবু, যেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে যেন পাঁচ-ওক্ত নমাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হোত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেননি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে—শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে—নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন—সত্য অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে—সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে—ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নমাজ পড়তে বসল। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নমাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে—কত আদর-যত্ন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসেনি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা দুটোর সময় বাড়ী ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ী। লোক গিজগিজ করছে। ডাকহাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল। ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে একটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মন্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে

নেই।

দারোগাবাবু বললেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেছে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন, ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নমাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে!

সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলি নে?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না সে এক-বস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালির কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু-একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েছে।

খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুর-চটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নমাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

মেঘমল্লার

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল ; অনেক মালাকার নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গ'ড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্যে এনেছিল। একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী রেশমী শাড়ি এনেছিল বেচবার জন্য। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন

তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠোনে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষ -মানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখবার পর তার চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্যে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু ক'রে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি ক'রে?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হ্যাঁ, সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

প্রৌঢ় বললেন—তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না ক'রে আসতাম না। তোমাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

—আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?

—নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে জান?

—হ্যাঁ জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্বে থাকতেন না?

—তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোন একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তুমি এখানে কোথায় থাক?

—এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন?

—সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।

প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি ; মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তাকে একটু বেশি শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত ক'রে বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ের আড়ালটা সরে গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াচ্ছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা সাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধারে তার শীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধ'রে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিরে চাইতেই যে কাপড় ধ'রে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোরী, তার দোলন-চাঁপা রং-এর ছিপছিপে দেহটি বেড়ে' নীল

শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ানো।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের সুরে ব'লে উঠল—কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কৈ দেখতে পেলাম না তো?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তারপরে সে একটু অভিমানের সুরে বললে—আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি! যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি!

—সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকে খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি ; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু ক'রে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল থেকে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথ ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি ক'রে? আচার্য পূর্ণবর্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রে যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে মহাকোট্‌ঠি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানসসুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য সে-ই কি দায়ী।

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙ্গা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্বাঙ্গে আলো-আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশী হ'ল, মুখে বললে—নাঃ, তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করবেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে! সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি ক'রে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে—তুমি বড়মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভানে দরকার নেই। কি কথা মনে ক'রে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল—বুঝতে পেরেছি—সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কিনা। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি! একে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর—যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে তো আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধ'রে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলছ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণবাজিয়ে আসবেন; তুমি তো জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবছি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ, তোমার কি এতটুকু কণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তারপর বললে—আচ্ছা থাক্, ব'লে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলছি, তোমায় শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভালো ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজাল বটে, কিন্তু সে যেন ভাসা-ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নির্জনে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালোবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি!

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড় একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত-

আট মাস হ'ল সেখানে বাস করছেন। তাঁর দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—চল, বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জানতাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হ্যাঁ, তোমার পিতা তো এক-জন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা তো উচিত। তোমার বাবাকে জানত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণ-পত্র আসত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার!

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময়ে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন ক'রে রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্না-রাতের মর্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে-রস যেন মূর্ত হয়ে উঠল; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্বেও আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি ক'রে—

সুরদাস বললে—তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হলে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করলে সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো? তার সামনেই বড় মাঠ। ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীনকালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ ক'রে সকলেই আগে ওই মন্দিরে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙে-চুরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সংগীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সংগীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'রে হয়? আচার্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—এ কি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ ক'রে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে—সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, এটা কি ক'রে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ক'রে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন—বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেবো।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরল।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং। শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য বসুব্রত বলেন বটে·····

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সেবার ঘনঘোর বর্ষা নামল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর ঘাটে গেল। তারা যখন সেখানে পেঁছিল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে এক-

জন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পুজোর আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে এক-জন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না। কিন্তু তবু সে ব'সে একমনে বাঁশীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনে মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নাই। শালবনের ডালপালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে! বড় মাঠের পারে শাল-বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার পুষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দসঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সাদা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল। প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্না-বরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী। তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তমকলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে.....হাঁ, এই তে দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গলঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্যতৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী।

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখলে—এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে—আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন বোধ হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে, তাঁর চোখ দুটো যেন অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হল্‌দে রং-এর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনানী

আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং.....কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কি! একেই তো সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী তো!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, সেই অপরূপ দ্যুতি-শালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয়—তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল গাছ-গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নের মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে এ কি কান্ড!

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন ; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে.....ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার ক'রে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত!

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন—আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জনতাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের

ধর্মকর্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা না করতে পারে এমন কোন কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক্, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাস নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্যসিদ্ধির জন্য তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে—

প্রদ্যুম্ন অধীর ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্ধন বললেন, সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুরের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়ক মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লার-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা ক'রে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেই জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কিনা, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল:—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবংবাদী মহাসমনো...

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখল—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্যন্ত নেই। দু'একটা যবাগুপানের ঘট, আগুন জ্বালাবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুকনো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান্ তথাগতের মূর্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সে দেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন!

মহাকোট্ঠি বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তের একটা বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মত জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রী-লোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! ভদ্রাবতীর তীরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোস্নারাতে এঁকেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিয়ে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেমন একপ্রকার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি

করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ'লে যান,—পাঁচ-ছদিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব'সো।

দেবী মাটির ঘর পূর্ণ ক'রে তাকে যবাগূ পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মত, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, যদি আচার্য পূর্ণবর্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে এই তো দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার জানবার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন!

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনার দেশ কোথা?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন! সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা' আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথার সূর্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আনবার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দু'টি বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক'রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসছিল।.....ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধুলোরও যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধুলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে?

খাওয়া শেষ হ'লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে! আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব'সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব'লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,—আচ্ছা রাত্রে থাক্‌ব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব'সে কাটালে। দেবীও কাছে ব'সে রইলেন। বললেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব'সে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেই দিন থেকে প্রতি রাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে কুটীরের দিকে

চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ-পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাত্রে একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণধারার আদিম ঝর্ণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পথিক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য, পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি কেন তা বুঝতে পারেন নি?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি এ-কাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে মনে করলে আমি যাকে ইচ্ছে বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনশক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয়তো পরজগৎ আছে, কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর? তা আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দু'টির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মল প্রাণে পেঁছিয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন, আপনার সঙ্গে যাব, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময় প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা

নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বলেল—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বললেন—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ, কোন মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হয়ে যাবে ; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস! আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।

তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই আমায় মন্ত্রপূত জল দিন তবে?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য আবার ঊরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘটকক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তারপর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীরের মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিকে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়তো প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। ঐ পূর্ব আকাশের নবমীর চাঁদ কেমন উজ্জ্বল হয়েছে! মগধ যাবার রাজপথে গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল। বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময়ে সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল ; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল। প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রদ্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন—কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী চমকে উঠলেন।

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়হস্তে আর এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে —দর গৃহে সন্ধ্যার-আকাশে-বন্ধ-আঁখি বাতায়নপথবর্তিনী তার মা!

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সামন্তদাসের মেয়ে। পিতা-মাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয় নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত ; মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে ব'লে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথচাওয়া.....প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এরকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না...তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে .....আসবে, কাল আসবে.....পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল!

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্ধভগ্ন পাষাণমূর্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে সির্‌সির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণমূর্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে মেঘ-মল্লার!.....

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!

অধ্যয়ন শেষ ক'রে লোকনাথ যখন তাঁর আচার্যের কাছে বিদায় চাইলেন, আচার্য তাঁকে বলেছিলেন—একটা কথা সব সময় মনে রেখো তুমি, অনেক লোকের ওপরে "লোকনাথ" নামটি সার্থক ক'রে জীবনের পথে অগ্রসর হবে।

অলোকসামান্য প্রতিভাবান এবং প্রিয়তম ছাত্রকে বিদায় দিয়ে, আচার্য দু'তিন দিন পর্যন্ত মৌনী ছিলেন।

মঠ থেকে বার হয়ে লোকনাথ কোন বড় রাজসভায় গেলেন না। অধ্যাপনা করবার কোন আগ্রহ দেখালেন না, বিবাহ ক'রে সংসারী হবার বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেলেন। কিছুদিন লক্ষ্যহীন অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরিবার পর শেষে পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমিতে কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস ক'রতে সুরু করলেন। এতে বেশির ভাগ লোকই তাঁকে বললে পাগল।

বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ একটু অন্য প্রকৃতির। যে দিন প্রভাতের আলো খুব ফুটত, বালক লোকনাথ তার গ্রামের ধারের মাঠে একা বেড়িয়ে বেড়াত, সমবয়সী অন্য কোন ছেলের সঙ্গে সে মিশত না। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের তলে গ্রামের অদূরে ছোট পাহাড়টা যখন বড় আকাশের গা থেকে খসে-পড়া বড় একখণ্ড মেঘস্তূপের মত দেখাত, লোকনাথ দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে মাঠের ধারের বনের কাছে বসে এক মনে কি ভাবত, তার অপলক শিশু নয়ন দু'টি দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে ও পাহাড়ের দিকে আবদ্ধ থাকত। তার বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়টাই পৃথিবীর প্রান্তসীমার পাহাড়। 'আচ্ছা, যদি ও ছাড়িয়ে চ'লে যাই, দূরে দূরে,—ক্রমেই দূরে,—আরও দূরে,—খুব খুব দূরে—খুব খুব খুব খুব দূরে—তা হলে কোথায় গিয়ে পৌঁছব? দৃশ্যমান সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে অজ্ঞাত রাজ্যে—এতদূর যাবার কল্পনায় বালকের মন বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়ত, নিজের ঘর, নিজের ভাই-বোনের কথা সে ভুলে যেত, শুধু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে পরিবর্তনশীল মেঘ রাজ্যের পেছনে, অনেক অনেক পেছনে সে কোন দেশ, যেখানে এই এমনি ধূসর, মৌন চারিদিক, সে দেশের কথা মনে হ'তেই তার মন অবশ হয়ে আসত। তার দিদিমা যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করেন, সে সব ঘটনা সেই দেশেই ঘটে, রাম-রাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চলেছে, সে দেশের সীমাহীন গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আজগুবি জিনিসের দেশ যেন সেটা!

কিন্তু সে সব অনেক দিনকার কথা। বড় হয়ে উঠে লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হয়ে উঠলেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যে তাঁর আকৃতি দিন দিন লালিত্যহীন হয়ে উঠতে লাগল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘ চুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়ত তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক ব'লে মনে হ'ত। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেলতে দেখা যেত, কিন্তু এক এক সময় আবার সে দীপ্তি শান্ত হয়ে আসত, তাঁকে খুব সৌম্য, খুব সুদর্শন, খুব উদার ব'লে মনে হ'ত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই দৃশ্যমান জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হ'ল। জগতের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে কিনা এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায়

কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি ধরণের। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব হ'তেই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতীশদের মধ্যে আচার্য যাকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে ক'রে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে। রাজসভার সূরিপদতিলক মহাচার্য জীবনসূরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে। আচার্য একমাত্র লোকনাথকেই এ পদের উপযুক্ত ব'লে ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজী না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত হলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীরখানিতে একা বাস করছেন। জৈন ধর্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দুখানা বহির্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কাপাসের তুলা থেকে তিনি অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়বার উপক্রম হ'ল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জন মাঠ তখন স্থানে স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনে উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জলধারার উপর সব সময় দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেব-দারুশ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত ক'রে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করে-ছিলেন এবং বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্য তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি ক'রে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত—ষড়্-দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, অশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের কিছু কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি মেঝেতে এমন যদৃচ্ছক্রমে ছড়ানো প'ড়ে থাকত যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান ক'রেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন নিম গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক-দিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ন ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান উপদেশ করতেন, বুনো পাখীরা অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থকতেন, দুর্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে প'ড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাটে পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত এক-মনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ করে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না সে, কেন তিনি এতক্ষণে মনে মনে

ভাষাতত্ত্ব অলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করেছিলেন!

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন, এগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে ভেবে স্থির করলেন, নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফটিক পিণ্ড ব'লে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায় তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতিক রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না, সকলকে তাঁর মত প'ড়ে দেখে বিচার করতে অনুরোধ করে-ছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চ-জ্ঞান, নয় তো একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তাঁর একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধ'রে বহু পরিশ্রম ক'রে সাংখ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। লেখা শেষ ক'রে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন ভাষা তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকনাথ সে খুঁত কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্তলিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথিখানিকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একখণ্ড ইটের মতই সেখানা সেই মুহূর্তে ডুবে গেল, শুধু সাংখ্যের উগ্র পাণ্ডিত্যের সাংঘাতে বন্য নদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে উঠল মাত্র।

দিন যেতে লাগল। লোকনাথ পূর্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বসতে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন দিন হারাতে লাগলেন। এক-একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে ধারে সারা দিনমান ধ'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে ফেলতেন, কালো আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যে সব নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সংকুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলতেন। রাত্রে নির্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি রাশি প্রশ্ন জেগে উঠত। ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়তে সুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে সময় কেউ দেখত সে বেশ বুঝত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েছে তাঁর বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবার যে সহজ উপায় দার্শনিকরা নিরূপণ ক'রে গিয়েছেন, প'ড়ে শুনে দেখে লোকনাথের দুঃখ যেন তাতে বেড়েই চলেছে। রাত্রে বাঁশের আড়ার পুস্তকাধার থেকে ভূর্জপত্রের পতঞ্জলি বক্রচক্রে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্বমিশ্রিত ব্যঙ্গহাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মুখর্গুলোর সঙ্গে

এক আসনে বসতে হয়েছে ভেবে গভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিন দিন শুকিয়ে উঠতে থাকতেন। রাত দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে শয্যাগ্রহণ ক'রে লোকনাথের মনে হ'ত অর্ধ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে। দর্শনাচার্যগণ যেন কেউ কারুর কথা না শুনে পরস্পর মহা তর্ক তুলেছেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপ-ভাষ্যকারগণের বাগ্‌যুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, কথার উপর কথা চড়িয়ে দু'দিক থেকেই কথার পাহাড় গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকনাথের আর ঘুম হ'ত না, পুরাতন ভূর্জপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বদ্ধ বাতাসে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, শয্যা ছেড়ে উঠে তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখাত, কোন দিন কষ্টিপাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীট-পতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকতে থাকত, বনঝোপের মাথায় জোনাকি পোকার ঝাঁক জ্বলত .....নদীর ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সব নীরব নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বসত। এবার সেটা আসত অন্ধকারের রূপ ধ'রে। আলোর যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ? স্বয়ম্ভু? .....সৃষ্টির পূর্বের জিনিস?

লোকনাথ আবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকতেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙুল দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন।

সেদিন তিনি পড়ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছিলেন। যে রহস্য ভেদ করবার জন্য তাঁর মন সর্বদাই আকুল, সে রহস্য ভেদ করবার আশা ক্রমেই যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার, কোন দিক থেকে কোন আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর মনে হ'ত কোন কোন আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন যুগে তাঁদের জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্তে এ জীবনরহস্যের সন্ধান বোধ হয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাসবাণী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন .....'পেয়েছি.....পেয়েছি.....'। তাঁর মনে হ'ল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখনকার চেয়ে কুড়ি বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল, স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জন মাঠ বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধনহীন বাতাস হু হু ক'রে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল, স্তিমিতপ্রদীপ কুটীরে একা বসে পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পস্পৃষ্টের মতন শিউরে উঠেছিল.....পুঁথি বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে শিউরে উঠছে। এখন তাঁর সে কথা মনে প'ড়ে হাসি পেল। অল্প বয়সের সেই কাঁচা, ভাবপ্রবণ মনের দিকে নীচু চোখে চেয়ে দেখে তাঁর বর্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুক-স্নেহে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষের মন নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না—যে বলে জেনেছি, হয় সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক মূর্খ! কি বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে তার কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীল শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্ত পলাশের বনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথের বয়স একুশ বৎসর।

—কিছু না, মায়া লক্ষ্মীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আস্‌ব.....পড়া শেষ হ'তে কি আর এর বেশী নেবে? বড় জোর সাত বছরই হোক। তোমায় ফেলে এর বেশি কি আর থাকতে পারব? বুঝলে?

সতের বৎসরের মায়া সলজ্জ হেসে বলে—সাত বচ্ছর.....এত কম সময়? এ আর এমন বেশি কি?

লোকনাথ গাঢ়স্বরে উত্তর দেয়, সেই কথাই তো বলছি মায়া, সাত বছর কি আর বেশি আমাদের পক্ষে? তারপর মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—নয় কি, মায়া?

মায়া মুখে হাসি টিপে উত্তর দেয়—নাঃ, তা আর বেশি কি! মোটে সাত বছর—এবেলা ওবেলা—ব'লেই প্রগ্‌লভ উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে।

লোকনাথ অপ্রতিভ মুখে বলেছিল—না, শোনো মায়া—আমি বলছি—না—আমার বল্‌বার কথা.....

যে মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সখীর মতন আগু বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

মঠে থাকতেই লোকনাথের মন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুললেন, জীবনের সুখকে মনে মনে ঘৃণা করতে শিখলেন। তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষিদার্শনিকদের যাতায়াত শুরু হল ; সে এক অন্য জগৎ, মনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে সেখানে শুধু এক বিরাট রহস্যময় দার্শনিক.....কে তুচ্ছ মায়া? মূর্খেই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশি আনন্দ পায়, হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্‌-কালে জাগে না ব'লেই।

তবু কখনো কখনো, কোনো অসাবধান মুহূর্ত যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জা-নম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবনলক্ষ্মীর বরণ-ডালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকতে লোকনাথ শুনেছিলেন, মায়া বিবাহ করেনি, কোন্‌ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছে। সেও অনেক দিনের কথা, তার পর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না, যেখানে যায় যাক, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হয়ে এল। কুটীরে যেতে যেতে লোকনাথ আকাশের দিকে চাইলেন, মনে মনে বললেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তিপ্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জানতে চাই, এই কার্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন্‌ কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কিনা। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শোনাবার ক্ষমতা আছে কি না, থাকে তো জানিও।.....ভোলাবার চেষ্টা কোরোনা,—তাতে আমি ভুলবো না।

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিকপন্থী মাধবাচার্য বাস করতেন। লোকনাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য বোঝাতে গিয়ে প্রথমত মুক্তি

কি, মুক্তি কয় প্রকার, মুক্তির ও নির্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কিনা, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বলতে লাগলেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন যে লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্য-প্রিয় হলেও তাঁর মনে হ'তে লাগল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেছেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান করতে করতে একদিন তাঁর মনে হ'ল তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেকছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন, লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেকছে। গাছটাকে তিনি টান দিয়ে উপরে তুলে ফেললেন, দেখলেন একটা শেওলা-গাছ—এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্বে দেখেছেন, তেমন লক্ষ্য করেননি ভাল ক'রে, চোখ পড়তে দেখলেন যে, শেওলার ডাঁটার যে অংশটা তাঁর গায়ে সুড়সুড় ক'রে ঠেকেছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে অংশের পাতাগুলি ঝাউপাতার মতন —কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি প্যানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে, নীচের অংশের পাতা ও রকম হলে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তারা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্যে দিয়ে বেশ কেটে চ'লে যায়, যখন যেদিকে স্রোতের গতি পাতাগুলি তখন সেদিকে হেলে পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান ক'রে ফিরলেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরেছেন।

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়েছে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা কোথা থেকে এল? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন ক'রে গড়লে?

লোকনাথের আর একটা কথা মনে হ'ল। কয়েকদিন পূর্বে তিনি অত্যন্ত অধীর-ভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ করলে?

ন্যায়যুক্তির দিক্ থেকে এ সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হ'ল যে তিনি এ কথা জোর ক'রে মন থেকে দূর ক'রে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত শীঘ্র তিনি কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে ভেতরে দিন দিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই জলজ শেওলার শুক্‌নো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সামনে প্রায়ই পড়ে থাকতে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন। নদীর ধারে ধারে যেখানে বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার স্রোতের জলে ঝুঁপসি হয়ে প'ড়ে থাকত, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ফুল স্তূপে স্তূপে ফুটে জলের ধার আলো ক'রে থাকত, পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায় জলচর পক্ষীরা ডিমগুলি গোপনে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখত, লোকনাথ বেশির ভাগ সময় সেই সব স্থানে কি দেখে দেখে ফিরতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কুটীরের সামনের মাঠে এক রকম ছোট ঘাসের কুচো কুচো সাদা ফুল রাশি রাশি ফুটত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ্য করছেন—ঘাসের ফুল সম্বন্ধে লোকনাথের মনে হ'ত যে সব ফুলগুলি একই গঠনের—পাঁচটি করে পাপ্‌ড়ি মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ রকম ফুল দু'হাজার, দশহাজার, দু'লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে থাকত, লোকনাথ, যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ফুল তুলে দেখতেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা ক'রে পাপ্‌ড়ির মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে উঠল। কত কি প্রশ্ন তাঁর মনে [illegible] ভয়ানক বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য। লোকনাথ বলতেন—জানাও হে

চৈতন্যময় কারণ-শক্তি, আমায় আরও জানাও। দিনকতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হ'তে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ দ্বারপার্শ্বে সংকীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোকরেখা যেন তাঁর চোখে ফেলেছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট করতে লাগল;—রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে বলতেন—চোখ খুলে দাও, হে মহাশক্তি চোখ খুলে দাও।

ইতিমধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা কি পতঙ্গ আর একটা ছোট পতঙ্গকে শরীর-নিঃসৃত রসে অল্পে অল্পে অচেতন ক'রে ফেলেছে, বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখে তাঁর মনে হ'ল সেটায় শুঁড়ের মত ছুঁচলো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ ফাঁপা,—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হয়ে ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার বেশ সুন্দর, সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।.....

লোকনাথের মন একমুহূর্তে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন! মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর?

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং সারা গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কেটে গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহলপ্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত রকমের উপসংহার ঘটল। সে সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্রতাপে মাঠের ঘাসগুলো জ্ব'লে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, বাতাস আগুনের ঝলকের মত তপ্ত। বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জমল। নদীর বড় বাঁকটায় বড় বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব দিক্‌চক্রবালে নবীন বর্ষার মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ তাঁর ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কামড়ালে। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে হাতের সেখানে মুহূর্তে আর একটা ছোবল মারবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা নীচু ক'রে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল। কি করছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠার মধ্যে চেপে ধরলেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে দু'টো বাঁধন দিলেন, বাঁধন তেমন শক্ত হ'ল না, অনেকটা আল্‌গা রয়ে গেল। তাঁর মনে হল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ.....মাঠের ইতস্তত শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে গাছ চোখে পড়ল না.....হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে বলে তাঁর মনে হ'ল। বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠছে.....লোকনাথ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আনবার চেষ্টা করলেন,—কুসুম ফুলের বীজ, রক্তচন্দনের ছাল ইত্যাদি কোনটাই হাতের কাছে নেই। এদিক্ ওদিক্ খানিকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পারছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে একটা ঝোপের কোলে তিনি ব'সে পড়লেন —অসহ্য-দংশনবিষে তাঁর সর্বাঙ্গ তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে।.....

ধীরে ধীরে তাঁর মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল.....আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর নির্মল করাল রৌদ্র সুর, দূরশ্রুত মুক্তস্রোত গিরিনির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে.....তোমার পাষাণ-কারা এবার ভাঙ্‌ব—তোমার চোখের বাঁধন খুলব.....

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন্ সুদূরতম, অপ্রকল্প রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য

রেখেছ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে? সেদিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি—আজ বোধ হয় বুঝেছি—হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবীর অপেক্ষা মহান্, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্, স্বর্গের অপেক্ষা মহান্, সর্বভূতের অপেক্ষা মহান্.....মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য তুমি তেমনি আমার প্রাণধারার উপজীব্য। তুমি আমার প্রাণের কথা শুনতে পাও? বেশ, তা হ'লে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো, দেব, এই অন্ধ রাজ্যের পারে, এই দিগন্তসীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে।.....কোথায় তোমার চিরবিকশিত জ্যোতিঃপ্রভাত, কোথায় দৈন্য-মুক্ত জ্ঞানসম্পদের অপরাজিত আয়তন দেখব.....

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে ব'লে উঠল, তোমার বিচারশক্তি চ'লে যাচ্ছে,—বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার? মনের এই তরল ভাব দুর্বলতার পরিচায়ক, মন থেকে দূর ক'রে দাও.....

লোকনাথ কিছুই ঠিক করলেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ করতে পেরে উঠছিল না .....আফিমের নেশার মত মরণের তন্দ্রা তাঁর ক্রমেই গাঢ় হয়ে এল.....

কোথায় কোন্ দুটি বালক-বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে ঝোপে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে.....সময়ের দীর্ঘ পাষাণ-অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পাগুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে—ওধারে তারা দুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে.....

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে, বালিকাটি ভাল রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ, দেখ তুমি খেয়ে.....

নীলব্যোমপথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু সমিধ্ বাহী, জ্যোতির্ময় ঋষিরা চলেছেন—তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে সংগীদের নিকট প্রস্তাব করেছেন—ওহে সংগীগণ আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা ফেলে দিয়ে পুনর্বার নূতন জল সংগ্রহ করি.....এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্ট জলের উৎসের সন্ধান পেয়েছি.....তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালি গোলার মতো কি ঝরে পড়ছে!

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলো-মেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে তুমি?..... এ পাড়ায় আসি বলে?.....আর কক্‌খনো আসব না..... দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি.....

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্বের শৈশবকালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশুনয়ন দুটি যে ভাবে আবদ্ধ রইত.....প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল.....প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না.....

নব-বৃন্দাবন

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না। স্ত্রী পাঁচ-ছয় বছর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয়া পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সে-গুলি সব জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রে কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ...জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া কর্ণপুর পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণবের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিক দুই তীরের বন-তুলসী মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন্ শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই-একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈদ্যকশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাইতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল, প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে শুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী, তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি-ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে বাজিজ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন, ফিরিবার কোন আশঙ্কাই নাই, তখন সে আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল—আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ ইত্যাদি!.....উদারচিত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাঁহার প্রার্থনা মত তাল-দীঘির পাড়ের আশুধান্যের এক-টুকরা উৎকৃষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন—এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণমুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার জন্য সত্যকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটি হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডী-মণ্ডপ, স্বহস্তরোপিত কত ফল-ফুলের গাছ, কত খেলাধূলার জন্মভিটার আঙিনা পিছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রামসীমার অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন।.....অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েকমাস পূর্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই, সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়া-ছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল। কর্ণপুর অবাক হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।.....ধূ ধূ গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, উপরে এখানে-ওখানে এক-আধটা দিকহারা মেঘশিশু আকাশের কোন কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠে পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র, সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকাবাঁকা একগাছি দৃঢ় যষ্টি, বাম হস্তে

একটি পিতলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপুর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন। .....জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল—সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক-একদিন সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামের চটিতে, নয়তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌমদর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্য-দ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত ; তিনি কোন দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোন দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের গঞ্জ, কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি বসতি-বিরল খুব বড় বড় নির্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল নিতান্ত ঘরোয়া-ধরনের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই, সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্ত-বিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত ; কর্ণপুর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত যদি কোন বনজন্তু বা কোন দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে।.....পরক্ষণে ভাবিতেন, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে? অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বৃক্ষতলে এক ধূসর হেমন্ত-সন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপুরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোন দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল, কোন দিন বা ছোট তালচারার নবোদ্গত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন ; অঞ্জলি পুরিয়া পার্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন। মাঝে মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্ চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য ডুবিয়া গেল।.....সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।

সেদিন পথে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন-চার মাস পূর্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট ছোট দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা রাঙা পাথরের নুড়ি, নূতন ধরনের পাখীর রঙিন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিস সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে—বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের খেলনা করিতে।.....কর্ণপুরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব!.....আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা তাঁহার চেয়ে সুখী। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গৃহ কোথায়?.....পরক্ষণেই দুর্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে?

তাহার পর বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথার পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোৎস্নায়, মাঠের নির্জনতায়, শ্লোকের পদ-লালিত্যে তাঁহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের মূর্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার-প্রাণ ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর-বনের মত শান্ত

তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তাঁর স্নিগ্ধ কান্তি.....কিন্তু তাঁহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। সেই মুখ ছাড়া অন্য কোন মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিতে চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে একথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রের রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ! যদি কখনও দেখা পান, তবে যেন পুত্রের সেই রূপেই পান।

শেষ রাত্রের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন, জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে.....তাঁর মৃতপুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোটখাট খুঁত ছিল, সেই সুন্দর অতি-প্রিয় খুঁতগুলি ঠিক সেই ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্তশিষ্টতার জয়-তিলকটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি।.....আস্তে আস্তে সে তাঁর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি ডাক দিল—বাবা!.....অনেকদিন-হারা-পুত্রকে ক্ষুধার্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তালবনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথে কয়েকখানা গ্রাম পাইলেও তিনি কোথাও বিলম্ব করিলেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দূর হইতে একটি ছোটখাট গ্রাম দেখা গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তিবোধ হইল। আশ্রয় স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামপ্রান্তের প্রথম দুই-চারিখানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্প-দূর অগ্রসর হইতে হইতেই গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন কেমন ঠেকিল। কোন গৃহস্থবাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধূম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী কোনদিকে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গৃহস্থবাটির বাহির দরজা খোলা—খোলা দরজা দিয়া চাহিলে বাটির ভিতর একখানা কাপড় পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে—অতশত ভাবিবার, বুঝিবার বা ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখে এক গৃহস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটুলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।.....দণ্ড দুই কাটিয়া গেল, অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা একটি গৃহপালিত পশুকে পর্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন ; ভাবিলেন, এই বাড়ীটার মধ্যেই ঢুকিয়া দেখা যাউক, লোকজনেরা কি করিতেছে।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেক-ক্ষণ পূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে, মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর গৌরবর্ণ শিশু খল্‌বল্‌ করিয়া শয্যার পাশে বেড়াইতেছে ও ঘরের আড়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটি মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতেছে।

ভাবগতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন কোন ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবে দুই

একদিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপুরকে দেখিয়া শিশু একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ, এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্য পান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন, সূর্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি রাশি আসিয়া জুটিত এবং খানিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি ছাইয়া মরিয়া থাকিত.....কর্ণপুরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডূষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে পিপাসার তাড়নায় সে আগ্রহের সহিত উপরি উপরি বহু গণ্ডূষ জল খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কর্ণপুর আবার পৈতৃক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করিয়া বিষয়-সম্পত্তি ও ধান্য-রোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে দু'বেলা তাগাদা করেন। দুপুর-রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বৃক্ষবাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল-ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুতলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটি সেই বহির্বাটিতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী নববিবাহিত দম্পতি—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলে, কর্ণপুরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে। হৃত সম্পত্তি রসরাজ পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়, মর্কট-বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আর মিথ্যা হইবার? হাতের কাছে দেখিয়া লও প্রমাণ! শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপুরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপুর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়, যখন তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল। পিতামাতা বর্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলো কত প্রভাতের বিহঙ্গকাকলীর সঙ্গে, কত পরিশ্রম-ক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারনত বাতাবী লেবু গাছটির সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তার পরে তাঁহার পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখ-স্বর্গ গড়িয়া তোলা! আবার মনে হয়, জীবনটাকে বিশ

বছর পিছু হঠাইয়া দিয়া কে যেন পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়। অনবরত হামাগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিতেছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছলাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদুটি ডাগর হইয়া উঠিয়াছে।..... এ নিজের ভালও বুঝে না, এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র পাগলের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বন্ধন এইরূপে করিয়াই জড়ায়। ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে সাত-আট বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টামির জ্বালায় কর্ণপুর দিনেরাত্রে একদণ্ড শান্তি পান না। এখানকার দ্রব্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য করিতেই তাহার আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে পড়িতে সে ছুটি লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন—বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠানের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তে মহা খুশির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে। কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছি বাবা নীলু, দুষ্টুমি ক'রো না। উঠে এসো।.....আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসিমুখে দাওয়ায় উঠিয়া আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা? সে সন্ধ্যা-বেলা যদি উঠিয়ে না আনতাম, মুখে জলের গণ্ডূষ না দিতাম—তবে?.....মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া পুনরায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন্ ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বুঝে, বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক এক দিন নির্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখের হাসি দূরাগত করুণ সঙ্গীতের মত মনে আসে। মনের ইতিহাসে এই বালকের সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকের চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দেন। মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাঁহার বড় বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনা-কারণে সে মিথ্যা কথা বলে যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্নবোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে মিথ্যাকথনের দোষ ও সত্যভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ-গাছের লেবু, ও-গাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কোন্ বংশের ছেলে, কি কুলগত স্বভাবচরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে! তাঁহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরেও কোন অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই—কিন্তু এ

বালক তাঁহাকে এ কি মুস্কিলে ফেলিল?.....ধর্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এসব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া সময় সময় ভীত হইয়া পড়েন। বালকস্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন; ভাবেন—উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল! কি জানি পরিণামে কি দাঁড়াইবে?

অন্য সময় বসিয়া বসিয়া ভাবেন, তাঁহার অবর্তমানে বালকের ভরণপোষণের কি হইবে? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করিবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। বিষয় চিন্তা!

মনে মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল? সারাদিন একদণ্ড ইষ্টচিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দৈব মন্দ নয়!

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য অভিযোগ করিলেন, কর্ণপুরের পালিতপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়না পাখীর খাঁচা খুলিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়াছে। বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনছি তুমি নাকি ওদের পাখী উড়িয়ে দিয়ে এসেছ?

বালক বলিল—না বাবা—আমি না.....

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাঁহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন বালক ইহা ভাবে নাই—কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—যাও, বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তার স্থান নেই আমার বাড়ী.....

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়-হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অর্ধ দণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সেখানে বালক নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক-ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেশীদূর কোথায় গেল? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন—বালক ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই-একটা, সে যাহা খাইতে ভালবাসে, এমন ব্যঞ্জন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজিলেন; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈদ্যক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া থাকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায়? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পার্শ্বের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন, গোশালায় রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শিবানন্দের ডাকা-

ডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া, অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে। কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না—বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে মনে ভাবিলেন—কাল হইতে ইহাকে একটু একটু ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাই, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ স্বভাবটা শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর মত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠাণ্ডা হয়ে বসো, একটা গল্প করি।

পরে মাধবেন্দ্রপুরী উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডের বৃক্ষ-তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাও না কেন? বোধ হয় সারাদিন উপবাসী আছ—এই ধরো দুগ্ধ। পুরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না; তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুহিয়া আসিয়া লইয়া যাইব।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না।.....রাত্রে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া নিকটবর্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের আক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, কেহ দেখে নাই; শীত-বৃষ্টি-দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রো। অনেকদিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি—মাধব আসিয়া কবে আমার সেবা করিবে!

মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়-চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, ঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত। কথায় কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে? পূজারী বলিল, গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর স্বাদশমুখপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃতসমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে মনে ভাবিলেন, অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপ আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান—গোপীনাথ স্বয়ং তাহাকে বলিতেছেন, দেখ, এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, তার নাম মাধবপুরী ; তাঁহার জন্য এক-খণ্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এসো।.....

পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন?.....ক্ষীর-পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে আসিয়া তাঁহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিলেন। মাধবপুরী একা অন্ধকার হাটচালাতে বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাঁহার হাতে ক্ষীর-পাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই ; পায়ের ধূলা দাও, উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক এক মনে শান্তভাবে শোনে।

বার বার সে তাঁহাকে প্রশ্ন করে—বাবা, কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? বৃন্দাবনে?

প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলেন—হাঁ হাঁ থাকেন।

ইহার পর হইতেই সে সুর ধরে—বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবনে যাবো!

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পণ্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না, শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বার বার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দূর গ্রামে তাহার এক ধান্য-ক্ষেত্রের কার্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন, বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখে রাখাই ভাল, এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলিলেন—চল নীলু, আমরা বৃন্দাবনে যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা করে, যাইবার আর কয় দিন বাকি।.....গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাব বাবা! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে যাব।

পরদিন স্বীয় ধান্যক্ষেত্রে যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে এদিক-ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখতে পাবে না। চুপ ক'রে ব'সে থাক।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ক্ষেত্রের কার্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল- -দেখেছি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখতে পেলে না!

কর্ণপুর বুঝিলেন, নির্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে। বলিলেন—চলো, বাড়ী চলো—আমি অনেক দেখেছি—তুমি দেখেছ তো, তাহলেই ভাল।

তার পরদিন হইতে বালক প্রায়ই বাবার সঙ্গে মাঠে যায় ও পথের ধারে নির্দিষ্ট

স্থানটিতে বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে, কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকো না, কেন দেখো না! কোন কোন দিন বলে—কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, আয় না গরু চরাবি! আমি তোমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে যেতে পারিনি। যাবো বাবা কাল?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে খটকা লাগিল। বালক যেভাবে কথাগুলো বলে তাহাতে মিথ্যা কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে-সময় যেন তাঁহাকে সে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শীগ্‌গির এসো বাবা, কৃষ্ণ আসছেন।

কর্ণপুর বালকের পাছু পাছু পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারে নির্জন পথ.....কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহে বলিল—ঐ দেখ বাবা—গরুর দল। ঐ যে—ঐ দেখ.....আসছেন.....

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ কৈ .....কোন কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল—এইবার দেখেছ তো বাবা? দেখেছ কত গরু?.....ঐ দেখ, কৃষ্ণ কেমন পোশাক প'রে?.....

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিতভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন, ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নয় তো?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জন পথে কর্ণপুরের কানে গেল, সত্য সত্যই যেন একদল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য একদল গরু কে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশীর তান তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে.....খুব মৃদু বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট!.....

অপূর্ব মধুর তান! জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই।

কর্ণপুরের সর্ব শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বাঁশীর সুর একটানা বাজিতে বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দূরে আরও দূরে গিয়া আম্‌শিমুলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

বালক বলিল—দেখলে বাবা? আমি বুঝি মিথ্যা কথা বলি?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রত্নতত্ত্ব

আমি এ গল্প আমার বন্ধু সুকুমারবাবুর মুখে শুনেছি।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা কিছু আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই কাছে ডাক্তার সুকুমার সেনের নাম সুপরিচিত। ডাক্তার সেন অনেক দিন গবর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। পাটনা excavation-এর সময়ে তিনি স্পুনার সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। মধ্যে দিনকতক তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের Curator-ও ছিলেন। বৌদ্ধ Iconography-তেও তিনি সুপণ্ডিত। "প্রাগ্-গুপ্ত যুগের মূর্তি-শিল্প" ও "ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বই দু'খানা ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে এবং বহু দেশী সাময়িক পত্রিকায় এ

বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর পড়বার ঘরটায় নানা স্থানের ভাঙা পুরনো ইট, ভাঙা কাঠের তক্তিবসানো তুলট কাগজ ও তালপাতার পুঁথির স্তূপ এবং কালো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্তির ভিড়ে পা দেওয়ার স্থান ছিল না। এই সব মূর্তির শ্রেণীবিভাগ করতে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কোনো নতুন-আনা মূর্তি পেলে তিনি বেশ ভাল করে দেখতেন, তারপর টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—তারা"। দিনকতক পরে এ বর্ণনা তাঁর মনঃপূত হোত না। তিনি আপন মনে বলতেন—উঁহু, ওটা ললিতক্ষেপ pose হোল যে, তারা কি করে হবে? তারপর আবার 'লেন্স' হাতে মূর্তিটার এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল করে দেখতেন। মূর্তিটার যে হাত ভাঙা সেটার দিকে চেয়ে বলতেন—এ হাতটায় নিশ্চয় পদ্ম ছিল। হুঁ—মানে—বেশ বোঝা যাচ্ছে কি না? তারপর আবার পুরানো টিকিটের ওপর নতুন টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—জম্ভলা"। তাঁর এ ব্যাপার দেখে আমার হাসি পেত। আমার চেয়েও বিজ্ঞ লোকে ঘাড় নেড়ে বলতো—হ্যাঁঃ, ওসব চাকরিবাজী রে বাপু, চাকরিবাজী! নইলে কোথাকার পাটলিপুত্র কোথায় চলে' গেল, ওঁরা আজ খোঁড়া ইটপাথর সাজিয়ে হুবহু বলে দিলেন—এটা অশোকের নাট-মন্দিরের গোড়া, ওটা অশোকের আস্তাবলের কোণ; দেখতে দেখতে এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ী মাটির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠলো!.....চাকরি তো বজায় রাখা চাই? কিছু নয় রে বাপ, ও-সব চাকরিবাজী!

তবে এ-সব কথার মূল্য বড়ই কম; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ও এ-সব বিজ্ঞ লোকের চিরদিন ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

সেদিন দুপুর বেলা ডাঃ সেন যখন তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে সেনরাজাদের শাসনকাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তখন একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মত সেখানে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলাম। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খানিকক্ষণ খোশ-গল্প করে সেখানে সারাদিনের মানসিক পরিশ্রম দূর করতে বুঝলাম তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। এ-কথা সে-কথার পর ডাঃ সেন বললেন—চা আনাই, একটা গল্প শোনো। এটা আমি কখনো কারুর কাছে বলিনি, তবে স্পুনার সাহেব কিছু কিছু শুনেছেন।

বাইরে সে দিন খুব শীত পড়েছিল। দরজা বন্ধ করে সুকুমার বাবুর গল্প শোনবার জন্য বসলাম। চা এল, চা খেতে খেতে সুকুমারবাবু তাঁর গল্প বলতে লাগলেন।

বিক্রমপুরের পুরানো ভিটার কথা বোধহয় কিছু কিছু শুনে থাকবে। এটা কতদিনের, তা সেখানকার লোকে কেউ বলতে পারে না। অনেক দিন ধরে ঢিবিটা ঐ রকমই দেখে আসছে—এটা কার বা কোন সময়ের তা তারা কিছুই বলতে পারে না।

ঢাকা মিউজিয়ম থেকে সেবার ঐ ঢিবিটা খোঁড়বার কথা উঠলো। এর পূর্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ শাখা থেকে ওটা কয়েকবার খোঁড়বার প্রস্তাব হয়—কিন্তু টাকার যোগাড় করতে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে যান। আমার কাছে যখন কথা উঠলো, তখন আমারও মত ছিল না। কারণ, আমার মনে মনে ধারণা ছিল খরচ যা পড়বে তার তুলনায় আমাদের এমন বিশেষ কিছু পাবার আশা নেই। অবশেষে কিন্তু আমার আপত্তি টিকলো না। ওটা খোঁড়বার জন্যে টাকা বরাদ্দ হোল। আমি বিশেষ অনুরোধে পড়ে তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম।

গিয়ে দেখলাম, যে-ঢিবিটা কাটাতে হবে তার কাছে আর একটা ঠিক তেমনি ঢিবি আছে। এই ঢিবির কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তা প্রায় মজে এসেছে। ঢিবি দুটো খুব বড় বড়। ময়নাকাঁটার বন আর বড় বড় আগাছায় পশ্চিমদিকের ঢিবিটার ওপরের অংশ একেবারে দুর্গম। পূর্বদিকের ঢিবিটা একটু ছোট, তার পেছনের ঢালু দিকটায়

খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমি আছে। স্থানটা কতকটা নির্জন।

সাধারণতঃ খননকার্য আরম্ভ করবার সময় আমরা প্রথমটা প্ল্যান তৈরী করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। তারপর কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আন্দাজে কতকটা খুব ক্ষীণ সূত্র ধরে, আমরা সেই প্ল্যান ক্রমে ক্রমে বদলে চলি। পাটনা excavation-এর সময় এতে খুব কাজ হয়েছিল। কিন্তু ছোটো দুটো গ্রাম্য ঢিবি খুঁড়ে তুলতে আমি এ-সব করবার আবশ্যক দেখলাম না। আমাদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্য চালিয়েছে এমন কোনো লোক ছিল না। তার কারণ এই যে, ওটা খোঁড়া হচ্ছিল ঢাকা P. W. D. থেকে।

এই ঢিবি দুটোর বড়টাকে ওখানকার লোকে বলে "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" ও ছোটটাকে বলে "টোলবাটীর ভিটা"। কারুর মতে এই নাস্তিক পণ্ডিত হলেন, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রকার বল্লভাচার্য। তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, শাঙ্কর বেদান্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য দেশের লোকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হয়। কেউ কেউ বলেন, বল্লভাচার্য বিক্রমপুরের ত্রিসীমানায়ও জন্মান নি। তাঁদের ওটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা। যাক সে কথা। আমি কিন্তু জানতে পেরেছি ওখানে কে বাস করতেন। আমি যা জানতে পেরেছি, পূর্বে কেউ তা আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু জোর করে' কিছু বলতে পারেন নি। আমি জোর করে বলতে পারি, কিন্তু বলি নি। কেন বলি নি, আর কেমন করে আমি তা জানলাম, সেই-টেই বলবো।

কিছুকাল ধরে' ঢিবির ওপরকার বন কাটানো হোল। তারপর প্রকৃতপক্ষে খননকার্য শুরু হোল। আমার সঙ্গে বন্ধু ঢাকা মিউজিয়মে'র ক—বাবু ছিলেন। তিনি শুধু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়ে বেশী—প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে আমরা এ কাজে হাত দিই। দিনের পর দিন ঢিবি দুটোর সামনে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া-নিম গাছের ছায়ায় ক্যাম্প-চেয়ার পেতে আমরা তীর্থের কাকের মত বসে' থাকতাম। আমার বন্ধুর চোখ মুখের ভাব ও উৎসাহ দেখে আমার মনে হোত, তিনি আশা করেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরানো আমলের রাজবাড়ি-টাড়ি বা একটা তাল-পাতায় লেখা আস্ত বাংলা ইতিহাসের পুঁথি, অভাবপক্ষে সেই অজ্ঞাত নাস্তিক পণ্ডিতের fossil শরীরটাই বা মাটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে।

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথমে বেরুলো একটা মাটির ঘট। ও-রকম গড়নের ঘট এখন আর বাংলার কোনো জায়গায় তৈরী হয় কি না জানি না। ঘটের গলার নিচে থেকে তলা পর্যন্ত curve-টি যে দিয়েছিল, সে গ্রাম্য কুমোরটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঘটটার মধ্যে প্রায় আধঘট কড়ি। হিন্দুরাজত্বে কেনা-বেচার জন্যে কড়ি ব্যবহার হোত তা জান তো? কোন্ অতীত দিনে গৃহস্বামী ভবিষ্যৎ দুর্দিনের ভয়ে কড়িগুলো সযত্নে ঘটে ভরে' মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন, সে ভবিষ্যৎ কত দিন হোল সুদূর অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে, সঞ্চিত অর্থের আর প্রয়োজন হয় নি। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক জিনিস বেরুতে লাগলো। আরও মাটির অনেক ভাঙা ঘট, কলসী, একখানা মরিচাধরা লাল রঙের তলোয়ার, একটা প্রদীপ, ভাঙা ইটের কুচো এবং সকলের শেষে বেরুলো একটা কালো পাথরের দেবীমূর্তি। এই মূর্তিটিকে নিয়েই আমার গল্প, অতএব এইটাই ভাল করে বলি।

দেবীমূর্তিটা পাওয়া যায় টোলবাড়ির ভিটায়। মূর্তিটি রাজমহলের কালো পাথরের তৈরী, চক্‌চকে পালিশ করা। বহু দিন মাটির তলায় থেকে সে পালিশ যদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোটের ওপর তখনও যা ছিল, তা খুব কম মূর্তিতেই আমি দেখেছি।

মূর্তিটি সরস্বতী দেবী হলেও, তাতে বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়েছিল। হাতে বীণা না থাকলেও দেবী না হয়ে দেবমূর্তি হলে, তাকে মঞ্জুশ্রী মূর্তি বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারতো।

মূর্তিটা যখন পরিষ্কার করে আমার সামনে আনা হোল, তখন তার দিকে চেয়েই আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। অনেক মূর্তি গত পনরো বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছি—কিন্তু এ কি? বাঙালির মুখে পাথর থেকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে কি করে! খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম। আমি খুব কল্পনাপ্রবণ নই, কিন্তু সেদিন সেই নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় পত্রবিরল ঘোড়া-নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অল্পক্ষণ.....অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যে মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাব.....সৌন্দর্যে ঝলমল চক্‌চকে কালো পাথরের পালিশ করা নিটোল সে দেবীমূর্তির, তার মুখের দুচেরেখাগুলির, দেহের গঠনের শিল্পভঙ্গির হাতের আঙ্গুলগুলি বিন্যাসের সুন্দর ধরনের.....সকলের ওপর মূর্তির মুখের সে হাসি-মাখা জীবন্ত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শিল্পের যে প্রভাব কালকে তুচ্ছ করে, যুগে যুগে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করছে, তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় সেই আমার প্রথম হোল। জয় হোক সে অতীত যুগের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর .....জয় হোক তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার!

মূর্তিটাকে বাড়ি নিয়ে এসে, আমার লাইব্রেরীতে কাগজ-চাপা ধ্যানিবুদ্ধের দলের মধ্যে তাকে রেখে দিলাম। রোজ সকালে উঠে দেখতাম—দীর্ঘ ভ্রূ-রেখার নীচে বাঁশ-পাতার মত টানা চোখ দুটোর কোণ হাসিতে যেন দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েক-দিন ধরে নানা কথা মনে হতে লাগলো। খুঁড়তে খুঁড়তে এমন কোনো জিনিস পাই নি, যাতে মূর্তিটির বা ভিটার সময় নিরূপণ করতে পারি। তবে মূর্তিটি গুপ্তযুগের পর-বর্তী সময়ের এবং পূর্ববঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরী, এটা আমি তার মাথার ওপর ছাতার মত চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতাম। পাথরের মূর্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মত চিহ্ন, পূর্ববঙ্গের ভাস্কর্যের একটা রীতি—এ আমি অন্য অন্য মূর্তিতেও দেখেছি।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলাটা আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে এক বাজী দাবা খেলে সকাল সকাল শুতে গেলাম।

এইবার যে কথা বলবো, সে কেবল তুমি বলেই তোমার কাছে বলছি—অপরের কাছে এ কথা বলতে আমার বাধে; কারণ, তাঁরা আমায় বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাতে কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কিসের অত্যন্ত সুগন্ধ পেলাম। পূজার মন্দিরে যেমন ধূপধুনো গুগ্‌গুল, ফুল, ঘি-চন্দন সবসুদ্ধ মিলে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ পাওয়া যায়, এটা ঠিক সেই ভাবের। সুগন্ধটা আমার নিন্দ্রালস মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে আমায় কেমন একটা নেশায় অভিভূত করে ফেললো। রাত ক'টা হবে ঠিক জানি না.....মাথার কাছে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছিল.....হঠাৎ দেখলাম, খাট থেকে কিছু-দূরে ঘরের মেঝেয় কে একজন দাঁড়িয়ে.....তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরণে বৌদ্ধ পুরো-হিতের মত হলদে পরিচ্ছদ.....মুখের হাতের অনাবৃত অংশের রং যেন সাদা আগুনের মত জ্বলছে.....বিস্মিত হয়ে জোর করে চোখ চাইতেই সে মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল!.....বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো.....ভাল করে চোখ মুছলাম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম আরে গেল যা, রাত দুপুরের সময় এ যে দেখছি ছেলেবেলাকার সেই Abu Ben Adhem (may his tribe increase)! খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকবার পর ঠিক করে নিলাম, ওটা ঘুমের ঘোরে কি রকম চোখের ধাঁধা দেখে থাকবো। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম, একটু পরে বেশ ঘুম এল।

কতক্ষণ পরে জানি না, আবার কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল.....ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সুগন্ধটা পেলাম.....আবার সেই নেশা! এবার নেশাটা যেন আমায় পূর্বের চেয়েও বেশী অভিভূত করে' ফেললে.....তার পরই দেখি, সেই মুণ্ডিত-মস্তক পীতবসন জ্যোতির্ময় বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার খাটের অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!.....

তারপর আরও কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটলো।

হঠাৎ আমার ঘরের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল.....দেখলাম, এক বিস্তীর্ণ স্থান, কত বাড়ি শ্বেত-পাথরের বাঁধানো কত চত্বর, কত গম্বুজ, দেউল .....অনেক মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর মত পরিচ্ছদ-পরা লোকেরা এ-দিক ও-দিক যাতায়াত করছেন, অসংখ্য ছাত্র ঘরে ঘরে পাঠনিরত.....একস্থানে অশোক-বৃক্ষের ছায়ায় শ্বেত-পাথরের বেদীতে একদল তরুণ যুবক পরিবৃত হয়ে বসে আমার পরিচিত সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু! দেখে মনে হোল, তিনি অধ্যাপনায় নিরত এবং যুবক-মণ্ডলী তাঁর ছাত্র। অশোক-কুঞ্জের ঘন পল্লবের প্রান্তস্থিত রক্ত-পুষ্পগুচ্ছের পাপড়ি গুরু ও শিষ্যবর্গের মাথার ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল.....আমার তন্দ্রালস কানের মধ্যে নানা বাজনার একটা সম্মিলিত সুর বেজে উঠলো.....এক বিরাট উৎসবসভা! উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে.....সব যেন অজন্তার গুহার চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোন্ প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ.....সভার চারিধারে বর্শাহাতে দীর্ঘদেহ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সাজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে.....সভার মাঝখানে রক্তাম্বর-পরণে চম্পক-গৌরী কে এক মেয়ে.....মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ম আঁটা এক যুবক, তার কোমরে ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের খাপে বাঁকা তলোয়ার দুলছে.....গলায় ফুলের মালা .....মুখে বালকের মত সরল সুকুমার হাসির রেখা। মেয়েটির নিটোল সুন্দর হাতটি ধরে যুবকের দৃঢ় পেশীবহুল হস্তে যিনি স্থাপন করলেন—ভাল করে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার রাতের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ-সভা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমার হাত-পা যেন খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। শীতে দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো.....পায়ের আঙুল যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। চোখের সামনে এক বিস্তীর্ণ সাদা বরফের রাজ্য,.....ওপর থেকে বরফ পড়ছে—তুষার-বাষ্পে চারিধার অস্পষ্ট.....সামনে পেছনে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া..... সামনে এক সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উচ্চ হতে উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশে উঠে গিয়েছে। এক দীর্ঘদেহ ভিক্ষু সেই ভীষণ দুর্গমপথ বেয়ে ভীষণতর হিম-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে পথ চলছেন.....তাঁর মাথা যেন ক্রমে নুয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে.....কিন্তু তবু তিনি না থেমে ক্রমাগত পথ চলছেন.....বহুদূরের এক উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া কিসের আলোয় রক্তাভ হয়ে দৈত্যের হাতের মশালের মত সে বিশাল তুহিন-রাজ্যের দূর প্রান্ত আলোকিত করে ধ্বক্ ধ্বক্ করে' জ্বলছে।.....

তুষার-বাষ্প ঘন হতে ঘনতর হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা ঢেকে ফেললো। তারপরই চোখের সামনে—এ যে আমারই চিরপরিচিত বাংলা দেশের পাড়াগাঁ.....খড়ের ঘরের পেছনে ছায়াগহন বাঁশবনে বিকাল নেমে আসছে। বৈঁচি-ঝোপে শালিক পাখীর দল কিচ কিচ করচে! কাঁটালতলায় কোন গৃহস্থের গরু বাঁধা! মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে এক তরুণ যুবক! তার সামনে আমার খুড়ে-বার-কবা সেই দেবীমূর্তি!.....দেখে মনে হোল যুবকের অনেক দিনের স্বপ্ন ঐ পাথরের মূর্তিতে সফল হয়েছে.....বর্ষাসন্ধ্যার মেঘমেদুর

আকাশের নিচে ঘনশ্যাম কেতকী-পল্লবের মত কালো ভাবগভীর চোখদুটি মেলে সে পাথরের মূর্তির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।.....

হঠাৎ সে দৃশ্যও মিলিয়ে গেল। দেখি, আমি আমার ঘরে খাটেই শুয়ে আছি, পাশে সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু। এবার তিনি কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বললেন—তুমি যে মূর্তিটি মাটি খুঁড়ে বার করেছ, তারই টানে অনেক দিন পরে আজ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। নয় শ' বৎসর আগে আমি তোমার মতই পৃথিবীর মানুষ ছিলাম। যে স্থান তোমরা খুঁড়েছ, ওই আমার বাস্তুভিটা ছিল। তুমি জ্ঞানচর্চায় সমস্ত জীবন যাপন করেছ, এই জন্যেই তোমার কাছে আসা আমার সম্ভব হয়েছে; এবং এই জন্যেই আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা তোমাকে দেখালাম। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,—নয়পালদেবের সময়ে আমি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলাম। ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী বাণীতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল ; সে জন্য দেশের হিন্দু-সমাজে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। দেশের টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে আমি নালন্দা যাই। বুদ্ধের নির্মল ধর্ম যখন তিব্বতে অনাচারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তখন ভগবান শাক্যশ্রীর পরে আমি তিব্বত যাই সে ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্যে। আমার সময়কার এক গৌরবময় দিনের কথা আজও আমার স্মরণ হয়। আজ অনেকদিন পরে পৃথিবীতে—বাংলায় ফিরে এসে সে-কথা বেশী করে মনে পড়েছে।.....চেদীরাজ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে দেশ জয় করতে করতে গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে-দিন সন্ধি করলেন, আমি তখন নালন্দায় অধ্যাপক। মনে আছে, উৎসাহে সে-দিন সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয়নি। এই সন্ধির কিছুদিন পরেই কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে নয়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের যে বিবাহ হয়, আমিই সেই বিবাহের পুরোহিত ছিলাম।.....অল্প বয়সে আমি একজন গ্রাম্য শিল্পীর কাছে পাথরের মূর্তি গড়তে শিখি এবং অবসর মত আমি তার চর্চা রাখতাম। তারপর আমি যখন পিতামহের টোলে সারস্বত ব্যাকরণের ছাত্র, তখন সমস্ত শক্তি ও কল্পনা ব্যয় করে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক মূর্তি গড়ি। মূর্তিটি আমার বড় প্রিয় ছিল। ওই মূর্তিটির টানেই অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। দেশের লোকে আমায় নাস্তিক বলতো ; কারণ, আমি একেই বৌদ্ধ ছিলাম, তার ওপর সাধারণভাবের ধর্মবিশ্বাস আমার ছিল না। যে অরুণচ্ছটারক্ত হিমবান্ শৃঙ্গ জনহীন তুষার-রাজ্যে আলোকিত করেছে—বা তোমায় দেখিয়েছি, তা সত্যের রূপ! সাধারণ লোকের পক্ষে সে-সত্য দুরধিগম্য। আমার কথা ধরি না, কারণ আমি নগণ্য। কিন্তু যে বিশাল সঙ্ঘারাম আমাদের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার সমস্ত অধ্যাপকই সে উচ্চ দার্শনিক সত্যতে চিরদিন লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন। আমিও অনেক বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সাধ্যমত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। যেখানে এখন আছি, সেখানে সে-সব যুগপূজ্য জ্ঞান-তাপস্বী আমার নিত্য সঙ্গী। তোমরাও অমৃতের পুত্র—সে লোক তোমাদের জন্যেও নির্দিষ্ট আছে।.....অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক।.....

বৌদ্ধ-ভিক্ষু কোথায় মিলিয়ে গেলেন।.....কিসের শব্দে চমক্ ভেঙে গিয়ে দেখি, ভোর হয়েছে বাইরের বারান্দায় চাকরের ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ সেন গল্প শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মূর্তিটা কোথায়?

ডাঃ সেন বললেন—ঢাকা মিউজিয়মে।